অখণ্ড সংহিতা

বা

পঞ্চম খণ্ড

শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

Title - Akhanda-Samhita,Khanda.5
Author - Sri Sri Swarupananda Paramhansa Deva
Language - bengali
Pages - 356
Publication Year - 1943
Created by SRI Tapan Kr Mukherjee, Dhanbad

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের উপদেশ-বাণী

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম বাংলা সংস্করণ

সন ১৩৫০ সাল

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

ও

ব্রহ্মচারী প্রেমশঙ্কর

সম্পাদিত

প্রাপ্তিস্থান :—

স্বরূপানন্দ গ্রন্থ-সদন লিমিটেড

Published, on behalf of
Messrs Swarupananda Grantha-Sadan Ltd.,
Narayanganj,
by Digambar Debanath Akhanda,
Publication Manager
of the above-named Company
from 4, Fordyce Lane, Calcutta.

Printed by
Suryya Kumar Manna
at Bholanath Printing Works
68, Simla Street, Calcutta.

নিবেদন

অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত উপদেশ-বাণী "অখণ্ড-সংহিতা"র পঞ্চম খণ্ড প্রকাশ-কালে সেই অনির্ব্বচনীয় কৃপার আধার পরমপ্রভুর চরণতলে আমাদের ভূলুণ্ঠিত-শিরসা কৃতজ্ঞতা এই বলিয়া জানাইতেছি যে, তাঁহার অচিন্ত্য অনুগ্রহ ব্যতীত কাগজের এই অবিশ্বসনীয় দুর্ভিক্ষের দিনে খণ্ডের পর খণ্ডে এই মহাগ্রন্থ প্রকাশ কিছুতেই সম্ভব হইত না।

এই মহাগ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে, জ্ঞানলিপ্সু ও গুণজ্ঞ ব্যক্তিগণের আগ্রহের ফলে আমাদিগকে প্রত্যেক খণ্ডেরই দ্বিতীয় সংস্করণ অতি দ্রুত প্রকাশের ব্যবস্থা হয়ত করিতে হইবে। কিন্তু যুদ্ধ না থামিলে কাগজই বা কোথায় পাইব, নূতন সংস্করণই বাহিরই বা হইবে কি করিয়া? গ্রন্থ মাত্র এগার শত করিয়া মুদ্রিত হইতেছে এবং গ্রন্থ-প্রকাশের পূর্ব্ব হইতেই "স্বরূপানন্দ গ্রন্থ-সদন লিমিটেডে"র চারি শত ছিয়ানব্বই জন অংশীদার ইহার অগ্রিম গ্রাহক হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং যে কোন খণ্ড সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়া যাইতে অধিক সময় লাগিতে পারে না।

নানা বিঘ্নপূর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতেছে বলিয়া আমাদিগকে অতীব দ্রুততার সহিত সকল কার্য্য সম্পাদনে চেষ্টা করিতে হইতেছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলে প্রুফ সংশোধনের ত্রুটী, মুদ্রাকর-প্রমাদ, ছাপার অসতর্কতা, কাগজের নীরসতা, বহিঃসৌন্দর্য্যের ত্রুটী প্রভৃতির অন্ত নাই। যে কোনও প্রকারে অল্প কাগজে বেশী বিষয়বস্তু আটাইয়া দিবার জন্য বিশ এম্-এর স্থলে চব্বিশ এম্-এ এবং বাইশ পংক্তির স্থলে ছাব্বিশ পংক্তিতে কম্পোজ করিয়া কাগজের খরচ কমাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আশা করি, এই সকল ত্রুটী যুদ্ধজনিত জরুরী অবস্থার তাড়নে কৃত বলিয়া প্রত্যেক পাঠক ও পাঠিকা আমাদের প্রতি মার্জ্জনার দৃষ্টিতে তাকাইবেন।

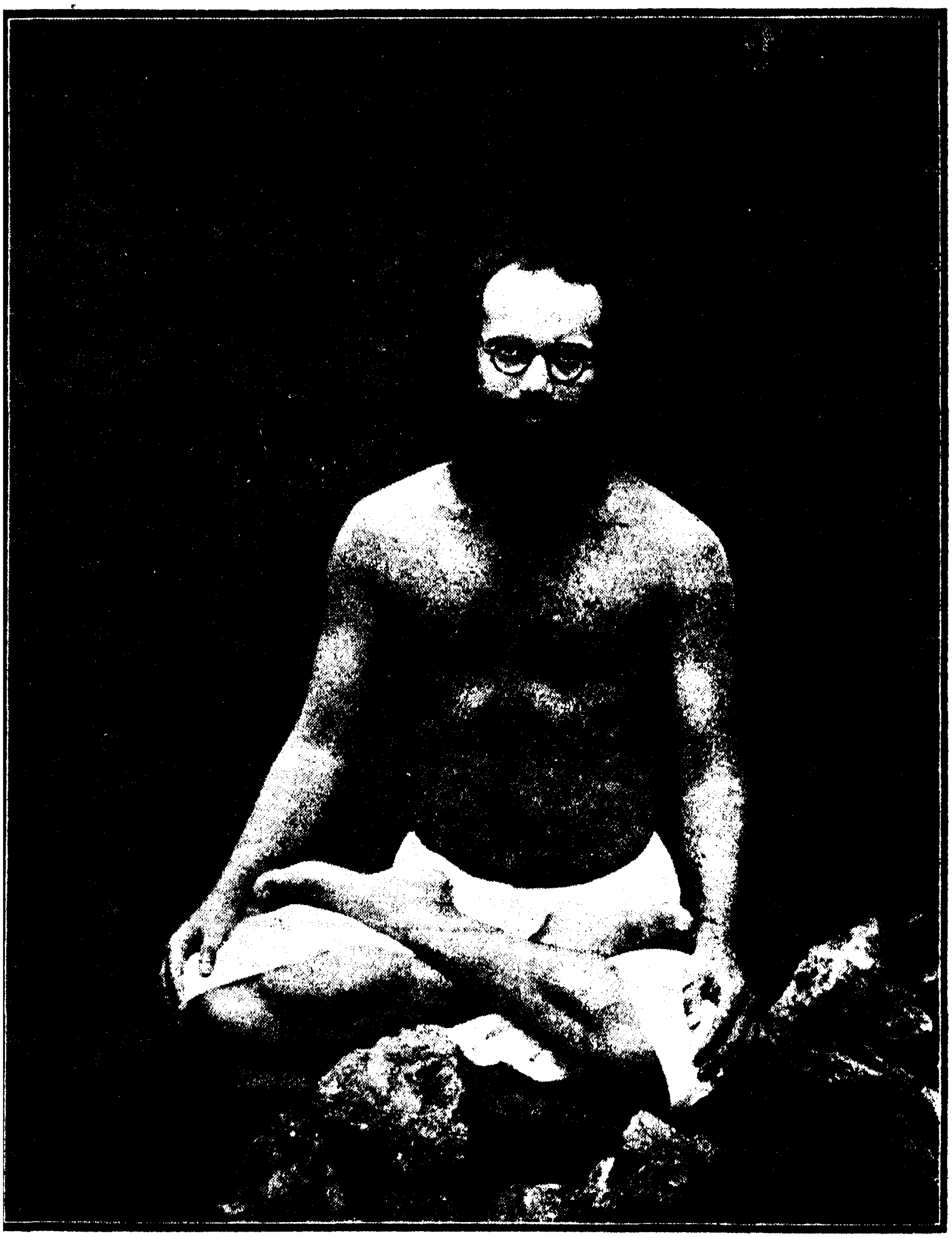
শ্রীশ্রীবাবা বিগত অষ্টাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপদেশপ্রার্থীকে যে সকল মূল্যবান উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে শত সহস্র নরনারী উপকৃত হইয়াছেন। সেই সকল উপদেশ এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের গোচরীভূত হইবার সুযোগ হওয়াতে আমরা আশা করি, সমাজের ব্যাপক হিত-সাধনের ইহা সহায়ক হইবে। এই শুভ উদ্দেশ্য লইয়াই আমরা এই দুঃসময়ে মহাগ্রন্থ "অখণ্ড সংহিতা" প্রকাশে ব্রতী হইয়াছি। বর্ত্তমান অস্বাভাবিক অবস্থার দরুণ কল্পনার অতীত অর্থ ব্যয় করিয়া প্রত্যেকটী কার্য্য সমাধা করিতে হইতেছে। সুতরাং আশা করি, গ্রন্থের মূল্য দেখিয়া কেহ মনে বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিবেন না। মহাযুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক অবস্থা না হইলে হয়ত গ্রন্থ বর্ত্তমান মূল্যের অর্দ্ধ মূল্যে দেওয়াও কঠিন হইত না। তবে, ইহা অতীব যথার্থ যে, "অখণ্ড-সংহিতা"র অসাম্প্রদায়িক উদার উপদেশাবলীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গৌরবের দিকে তাকাইতে গেলে প্রত্যেককেই স্বীকার করিতে হইবে যে, এইরূপ মূল্যবান বস্তুর মূল্য কোনও প্রকার আর্থিক বিনিময়ের দ্বারা দেওয়া সম্ভব নহে। দেশ এবং জাতির সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সম্পাদনে এই মহাগ্রন্থ-বিবৃত উপদেশসমূহ সর্ব্বতোভাবে অনুসৃত হইলেই গ্রন্থ-প্রচারকেরা ইহার উপযুক্ত মূল্য পাইবেন। কিমধিকমিতি।

বিনীত—

পুপুন্‌কী অযাচক আশ্রম
পোঃ চাশ, মানভূম

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী প্রেমশঙ্কর

অখণ্ড-সংহিতা—



অখণ্ড-মণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।

ওঁ

অখণ্ড-সংহিতা

বা

শ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের

উপদেশ-বাণী

(পঞ্চম খণ্ড)

রহিমপুর আশ্রম

১লা বৈশাখ, ১৩৩৮

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সম্বৎসরব্যাপী মৌন ব্রত আজ পূর্ণ হইল। এই একটী বৎসর মধ্যে কতজন তাঁর ব্রতনিষ্ঠার দৃঢ়তা পরীক্ষার জন্য যে কত রকমের অবস্থার সৃজন করিয়াছে এবং মৌন-ভঙ্গে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। কেহ কেহ রাত্রে আসিয়া ঘুম হইতে জাগাইয়া তুলিয়া অসতর্ক বাক্য বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সেই চেষ্টাও বিফলে গিয়াছে।

আপ্ সে হো জায়েগা

অনেকেই মনে করিয়াছিলেন, অদ্য যখন সম্বৎসর পূর্ণ হইতেছে, তখন আজই বুঝি মৌনভঙ্গ হইবে। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবা তারিখ দিলেন, ৬ই বৈশাখ। ঐ তারিখে আশ্রমে হরিনাম কীর্ত্তন ও উৎসব হউক, ইহা শ্রীশ্রীবাবার ইচ্ছা। তদনুসারে নানাস্থানে নিমন্ত্রণ-পত্রও প্রেরণ করা হইয়াছে। গ্রামের অন্যতম নেতৃস্থানীয় শ্রীযুক্ত সূর্য্যমোহন রায় ও রহিমপুর আশ্রমভূমির দাতা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী উৎসবের নিমন্ত্রণ ব্যাপারে অক্লান্ত শ্রমসহকারে পল্লীর পর পল্লী পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছেন। গ্রামবাসী কতিপয় মাতব্বর ব্যক্তি আসিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত বড় উৎসবের নিমন্ত্রণ আপনি দিয়াছেন, অথচ জোগাড়যন্ত্র কিছুই দেখিতেছি না,—

কি ভাবে এত বড় একটা উৎসব হইবে, তাহা আমাদের বুদ্ধিতে কুলাইয়া উঠিতেছে না। এই বিষয়ে আমাদের সংশয় ভঞ্জন করুন।"

শ্রীশ্রীবাবা প্রসন্ন দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকাইলেন এবং মৃদুহাস্যে শ্লেটে লিখিলেন,—"সব্-কুছ্ আপ্‌সে হো জায়েগা।"

রহিমপুর আশ্রমের আদি ইতিহাস

এই প্রসঙ্গে এখানকার আশ্রম-প্রতিষ্ঠার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান প্রয়োজন মনে করি।—বিগত পৌষ মাসে পুপুন্‌কী আশ্রমের জনৈক কর্ম্মী প্রচারকর্ম্মে পুপুন্‌কী হইতে ত্রিপুরায় আসিয়া আকুবপুর গ্রামে জ্বরবিকার রোগে মরণাপন্ন অবস্থায় পতিত হন। গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী প্রাণ দিয়া রুগ্নের সেবা, শুশ্রূষা, পথ্য-বিধান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, আন্দিকুট নিবাসী ধন্বন্তরীকল্প চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সাহা বিনা দর্শনীতে এবং ঔষধের মূল্য না লইয়া যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রোগ বাড়িয়াই চলিল। তখন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার অনন্যোপায় হইয়া শ্রীশ্রীবাবার নিকটে সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা কলিকাতাতে ছিলেন, এই সংবাদ পাইয়া আকুবপুর পদধূলি দিলেন। শ্রীশ্রীবাবার পদরজস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই রোগের অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখা যাইতে আরম্ভ করিল। শ্রীশ্রীবাবার আশীষের বলে ও ক্ষেত্রবাবুর সুচিকিৎসার গুণে কর্ম্মী আরোগ্যলাভ করিলেন।

অসুখের পূর্ব্বে কর্ম্মীর সহিত রহিমপুর গ্রামেই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সাক্ষাৎকার হয়। "অখণ্ড-সংহিতা" গ্রন্থের প্রথম দুই খণ্ডের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া কর্ম্মী গ্রামের পর গ্রামে শ্রবণ করাইতেন এবং এই উপলক্ষেই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত অন্তরের এক ঘনিষ্ঠ প্রীতিও সৃষ্ট হইল। কোনও কোনও গ্রামে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র কর্ম্মীর সহিত নিজেও যাইতেন এবং কর্ম্মীকে বিশ্রামদানের জন্য নিজেও "অখণ্ড-সংহিতা" পাঠ করিয়া শুনাইতেন। কিন্তু পক্ষাঘাত-রোগগ্রস্তা বৃদ্ধা মাতার শুশ্রূষায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয় বলিয়া তিনি কর্ম্মীর সহিত অধিক দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে পারিতেন না। অথচ,

"অখণ্ড-সংহিতার" মধ্য দিয়া শ্রীশ্রীবাবার অমৃতময়ী বাণী শুনিতে শুনিতে তাঁহার পাদপদ্মস্পর্শ লাভের জন্য গিরিশচন্দ্র ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন,—তাঁর একমাত্র সম্পত্তি, মন্দির ও পুকুরসহ একটী উচ্চভূমি, আশ্রমার্থে শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ-শ্রীচরণ-সরোজে সমর্পণ করিবেন। শ্রীশ্রীবাবা কলিকাতা হইতে পত্রযোগে এইসব সংবাদ অবগত হইলেন কিন্তু প্রথমে এখানে আশ্রম করিতে রাজি হইলেন না। পরিশেষে অনুরোধে উপরোধে সম্মত হইয়া চব্বিশ পরগণান্তর্গত রঘুনাথপুর নিবাসী জনৈক শিষ্যকে কার্য্যারম্ভ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই শ্রীশ্রীবাবাকে আকুবপুর আসিতে হয়।

আকুবপুরে পুপুন্‌কী আশ্রমের কর্ম্মীর রোগারোগ্য হইলে শ্রীশ্রীবাবাকে রহিমপুর আসিতে হইল।' প্রথম দর্শনমাত্র শ্রীযুক্ত গিরিশ গললগ্নীকৃতবাসে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে শিবমহিম্নস্তব পাঠ করিয়া প্রথম গুরুবন্দনা করিলেন। সদ্‌গুরুর অন্বেষণে তীর্থের পর তীর্থ ঘুরিয়া শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র প্রৌঢ় হইয়া গিয়াছেন, আজ ঘরে বসিয়া বিনা আয়াসে সেই দুর্ল্লভ পুরুষ-রতনের সাক্ষাৎকার ঘটিল। প্রথম সাক্ষাতেই শ্রীযুক্ত গিরিশ বুঝিলেন,—ইঁহারই জন্য যুগযুগান্তর ধরিয়া তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন।

৬ই মাঘ বৈকালবেলা মুরাদনগর, রহিমপুর, হোসেনতলা, শিবানীপুর, নবীপুর, মালিসাইর প্রভৃতি গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রস্তাবিত আশ্রমভূমির অন্তর্ভুক্ত মন্দিরের প্রাঙ্গনে সমবেত হইলেন। শ্রীশ্রীবাবা সকলকে লিখিয়া লিখিয়া নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ মুখে উত্তর দিতে থাকিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—"গিরিশবাবুর একান্ত আকাঙ্ক্ষা, এখানে একটা আশ্রম হোক্। অবশ্য, এ জন্য তিনি তাঁর জাগতিক সম্বল ৪।৫ বিঘা ভূমি সবই দিতে চাচ্ছেন। কিন্তু আশ্রম হ'লে একটা লোকের জন্য হবে না এবং একটা লোকের দ্বারাও টিক্‌বে না। সবাই যদি আশ্রম চান, তবে আশ্রম হতে পারে। এই বিষয়ে আপনাদের সকলের মতামত আমি জান্‌তে চাই।"

সকলেই সম্মতি জানাইলেন।

শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—"মৌখিক সম্মতিতে চল্‌বে না, কাজের মধ্য দিয়েই সম্মতিটা আসা চাই। আমি ত অযাচক, কোনো অবস্থাতেই প্রয়োজনের তালিকা কারো সাম্‌নে এনে ধর্‌ব না।"

যাহা হউক, সুদীর্ঘ আলোচনার পরে স্থিরীকৃত হইল, আশ্রম এখানে প্রতিষ্ঠিত হইবে। পরদিন প্রাতঃকালে সাতই মাঘ ১৩৩৭ শ্রীশ্রীবাবা স্বহস্তে কোদাল ধরিলেন।* প্রথমে লোকে বিস্মিত হইল, পরে ঠাট্টা আরম্ভ করিল, কিছুদিন পরে বিরোধীরাও আসিয়া কোদাল ধরিল। আস্তে আস্তে জঙ্গল অপসারিত হইল, গর্ত্ত ভরাট হইল, টিলা সমতল হইল, পুকুরের কচূরী-পানা পরিষ্কৃত হইল। পুপুন্‌কী-আশ্রমজাত নানা প্রকার শাকসব্জীর বীজ আনিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে কত স্থান হইতে কতজন যে শ্রীশ্রীবাবার নিকটে ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ নিতে আসিতেন, তাহার সঠিক সংখ্যা নির্দ্ধারণ কঠিন। শ্রীশ্রীবাবা লিখিয়া লিখিয়া উপদেশ দিতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় সম্বৎসরব্যাপী মৌনের উপদেশ সমূহ সংগ্রহ করা হইয়া উঠে নাই।

অখণ্ডের সাধন ও সমন্বয়-যোগ

অন্য জনৈক শিষ্য স্থানান্তর হইতে আসিয়া সাধন বিষয়ে শ্রীশ্রীবাবাকে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা তদুত্তরে লিখিলেন,—শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম-সাধন অনধ্যবসায়ীর নিকটে শুষ্ক বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু একনিষ্ঠ প্রযত্নে নামে লাগিয়া থাকিলে ইক্ষু-রসের ন্যায় চর্ব্বণের পরে প্রেমমধু নির্গলিত হইবেই। যেহেতু নারিকেলের শস্যটা শক্ত আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত, সেই হেতুই নারিকেলকে নীরস বলা, কোনও কাজের কথা নহে। শুধু বিচার-বিতর্ক লইয়া যাহারা দিনক্ষয় করে, তাহাদের নাম শুষ্ক-জ্ঞান-পন্থী রাখিতে পার। পরিশ্রমের চরম লক্ষ্য শ্রীভগবানে দৃষ্টি না দিয়া যা'রা শুধু কর্ম্ম লইয়াই বিব্রত থাকে, তাহাদিগকে

---

* ৭ই মাঘ, ১৩৩৭, ২১শে জানুয়ারী রহিমপুর আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস।

পশুকর্ম্মী বলিতে পার। তোমার সাধনায় বৃথা বিচার-বিতর্কেরই বা অবসর কই, লক্ষ্যহীন পরিশ্রমেরই বা উপদেশ কই? নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া সাধন করিতেছ,—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস তোমার কর্ম্ম। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত নাম-লক্ষ্যযুক্ত হইলেই ইহা হইল কর্ম্মযোগ। এই নিঃশ্বাস আর এই প্রশ্বাস যে অখণ্ড চৈতন্যেরই সহিত অভেদ, ক্ষুদ্র প্রাণবায়ু যে মহাপ্রাণেরই প্রতিনিধি, এই চেতনাটুকুকে জাগাইবার চেষ্টাই জ্ঞানযোগ। কিন্তু অখণ্ডের সাধন ভক্তি-বর্জ্জিত নহে। বরং ভক্তিতেই ইহার অমৃতময়ী স্বাদুতা। ভক্তি-সাধনের বহিরঙ্গ কোলাহলগুলিতে ডুবিয়া না যাইয়া মনে প্রাণে উপাস্যের সহিত উপাসকের প্রেম-বন্ধন সৃষ্টিই ইহার গূঢ় রহস্য। শ্বাস যখন গ্রহণ করিতেছ, তখন তোমার প্রাণারাম উপাস্য তোমাতে আসিয়া মিলিত হইতেছেন,—যেন সমুদ্রের প্লাবনের জল আসিয়া ভাগীরথীতে পড়িল। আবার যখন প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছ, তখন তুমি তাঁর সহিত মিলিত হইবার জন্য অভিসারে বাহির হইলে। ইহাই শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের নিত্যমিলন ও নিত্যবিরহ বিজড়িত অপূর্ব্ব-বৈচিত্র্যময় রসের সাধনা। ইহা অন্তরঙ্গ বস্তু, বাহিরের আড়ম্বর ইহাতে নাই। একাধারে ইহা জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেমের সাধনা। আমি ইহার নাম দেই,—সমন্বয়-যোগ।"

আশ্রম-শৃঙ্খলা

আশ্রমের কর্ম্মীদের জন্য অদ্য শ্রীশ্রীবাবা কতিপয় শৃঙ্খলা লিপিবদ্ধ করিলেন এবং একটী পাটশোলার কলম লইয়া অনিন্দ্য-অক্ষরে চিত্রিত করিয়া শৃঙ্খলাবলী আশ্রম-কুটীরে টাঙাইয়া দিলেন। যথা,—

১। সহস্র কর্ম্মের মধ্যেও অন্তরঙ্গ যোগ সাধন করিবে। তুমি যোগী, শুধুই কর্ম্মী নহ। যোগের জন্যই তোমার কর্ম্ম। কর্ম্মের জন্য যোগ তুমি পরিত্যাগ করিতে পার না।

২। আশ্রম তপস্যার স্থান। উচ্চ চীৎকার, বাচালতা ও নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত সঙ্গীতাদি দ্বারা কোনও সহকর্ম্মীর নিভৃত যোগে বিঘ্ন উৎপাদন করিও না।

৩। যথাসাধ্য বিশুদ্ধ ভাষায় বাক্যালাপ করিবে।

৪। কাহারও সহিত ধর্ম্ম বা সাধন সম্পর্কে কু-তর্ক করিবে না। যাহার কথা বিনা তর্কে শ্রবণ করা যায়, তাহার কথাই শুনিবে। যে ব্যক্তি বিনা তর্কে তোমার কথা শোনে, তাহাকেই কথা শুনাইবে।

৫। নির্লোভতা, সত্যনিষ্ঠা, অনালস্য ও স্বাবলম্বন—এই চারিটি তোমার জীবন-সৌধের ভিত্তি।

৬। আশ্রমে গুরুতর অসুবিধা না ঘটিলে প্রত্যেক আশ্রমী মাসে দুই দিন মৌনব্রতী থাকিয়া কর্ম্মবর্জ্জন না করিয়াই অন্তরঙ্গ নাম-সাধন করিবে।

৭। দৈনিক চারিবার উপাসনা করিবে। প্রাতে, মধ্যাহ্নে স্নানের পর, সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে শয়নকালে।

৮। প্রত্যহ সাধ্যমত আসন, ব্যায়াম এবং মুদ্রাভ্যাস করিবে।

৯। প্রত্যহ দিনলিপি লিখিবে।

১০। প্রত্যহ গীতা ও উপনিষৎ পাঠ করিবে।

১১। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কোনও আশ্রমী কোথাও বক্তৃতা প্রদান করিবে না, যেহেতু বক্তৃতায় মন বহির্ম্মুখ, যশোলিপ্সু ও কর্ত্তৃত্ব-প্রবণ হয়।

১২। আশ্রমের কোনও অভাবের কথা জানাইয়া লোকের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টাকে পাপ বলিয়া মনে করিবে।

১৩। ভিক্ষা করিবে না; অযাচিত দানও শ্রদ্ধাপূত না হইলে গ্রহণ করিবে না।

১৪। তুমি যে অযাচক, অভিক্ষু, অপ্রার্থী,—তুমি যে স্বাবলম্বী ও আত্মবশ, —এজন্য কখনও গর্ব্বিত হইও না বা ভিক্ষা-পরিচালিত কোনও প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিদ্বিষ্ট হইও না। যেহেতু এইরূপ বিদ্বেষ বা এজন্য নিন্দাপ্রবণতা, তোমার অভিক্ষার গৌরবকে ম্লান করে, অভিক্ষার উদ্দেশ্যকে পণ্ড করে।

১৫। যাহার কাছ হইতে ধার লইলে টাকা ফেরৎ লওয়ান যাইবে না, তাহার নিকট হইতে ধার চাওয়া আর ভিক্ষা করা সমান কথা জানিবে।

১৬। আশ্রম-সমাগত কুলী-মজুর শ্রেণীর লোকের প্রতিও সসম্মান সদ্ব্যবহার করিবে।

১৭। স্ত্রীলোক মাত্রেরই প্রতি মাতৃবৎ ও পুরুষমাত্রেরই প্রতি ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করিবে।

১৮। সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোককেই তোমার গুরুভ্রাতা বলিয়া জ্ঞান করিবে।

১৯। সর্ব্ববিধ পরোপকারের জন্য সতত প্রস্তুত থাকিবে।

২০। অভিক্ষার অমোঘ শক্তিতে কণামাত্র অবিশ্বাস আসিলে তৎক্ষণাৎ আশ্রম ত্যাগ করিবে।

রহিমপুর আশ্রম
২রা বৈশাখ, ১৩৩৮

কুলী-বেশী পরমহংস

আসন্ন উৎসব উপলক্ষে সমাগত জনসাধারণকে কৃষি-বিদ্যার উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য আশ্রমের সমস্ত ভূমিটাতেই নানাপ্রকার সময়োপযোগী শাক-সব্জী লাগান হইয়াছে। যত্নের গুণে কুমড়া লতাগুলির এক-একটা ডগা দুই অঙ্গুলী মোটা এবং এক-একটা পাতা পদ্মপাতার ন্যায় সুবৃহৎ হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী বহু গ্রামের লোক উৎসবের পূর্ব্ব হইতেই এই সকল গাছলতা দর্শনের জন্য প্রত্যহ আসিতেছেন।

অদ্য পার্শ্ববর্ত্তী কোনও গ্রাম হইতে একদল মহিলা সমাগতা হইলেন। অবশ্য, গাছ-লতা-পাতা দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে ইঁহারা আসেন নাই, আসিয়াছেন শ্রীশ্রীবাবাকে দেখিবার জন্য। কিন্তু মোটা মোটা কুমড়ার ডগা আর কচি কচি পাতা দর্শনের পর ইঁহারা ঐ বিষয়েই একরূপ নিমগ্ন হইলেন। সমস্ত আশ্রম পরিদর্শন করিয়া ইঁহারা আশ্রমের বাহিরে লোকাল বোর্ডের রাস্তায় নামিলেন। স্রষ্টাকে দেখিতে আসিয়া তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্যে এমনি করিয়াই অনেক জীব তলাইয়া যায়।

কিন্তু একটী অল্পবয়স্কা মেয়ের রাস্তায় নামিয়া স্মরণ হইল যে, যাঁহাকে দেখিতে আসা হইয়াছিল, তাঁহাকে দেখা হয় নাই। সে এই কথা সঙ্গিনীদিগকে

স্মরণ করাইয়া দিলে বর্ষীয়সী একজন সঙ্গিনী বলিলেন,—কৈ সাধু ত' নাই, থাকিলে দেখিতে পাইতাম। আর একজন বলিলেন,—এখন বেলা যায়, আর একদিন আসিব। কিন্তু ছোট্ট মেয়েটী জিদ্ ধরিল, সাধু না দেখিয়া সে ছাড়িবে না। অগত্যা সকলকে ফিরিতে হইল।

এতক্ষণ শ্রীশ্রীবাবা আশ্রম-কুটীরে বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। কুটীরের পশ্চাতে রহিমপুর ও নবীপুর গ্রামের যুবকেরা মাটি ফেলিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবাবা লেখাপড়া সারিয়া কাগজপত্র গুছাইয়া রাখিয়া মাথায় গামছা বাঁধিয়া ঝুড়ি-বোঝাই মাটি কুটীরের পশ্চাতে ফেলিতে লাগিলেন।

মহিলারা আসিলেন, একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বামীজী কোথায়? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি লক্ষ্য করেন নাই যে শ্রীশ্রীবাবা এতক্ষণে মাঠিয়াল সাজিয়া মাটির ঝুড়ি বহন করিতেছেন। তিনি বলিলেন,—কুটীরে আছেন। মহিলারা দেখিলেন, কুটীর শূন্য, একবার মাটি ফেলিবার জায়গাটা ঘুরিয়াও গেলেন, কিন্তু শ্রীশ্রীবাবাকে দেখিয়াও চিনিতে পারিলেন না। কারণ, সাধুরা কুলীর মত শ্রম করিবেন, ইহা এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ শ্রীশ্রীবাবার পরণে নাই গেরুয়া, গলায় নাই তুলসী বা রুদ্রাক্ষের মালা, ললাটে নাই ত্রিপুণ্ড্র বা তিলক। মহিলারা ফিরিলেন, মেয়েটী কিন্তু দাঁড়াইয়া রহিল। ঠিক্ এই সময়ে, যার মাথা হইতে শ্রীশ্রীবাবা মাটির ঝুড়ি নিজের মাথায় লইতেছিলেন, তার মাথা হইতে ঝুড়িটা পথিমধ্যে ভূমিতে পতিত হইল। সুতরাং একটা মাত্র ঝুড়ি বহিবার মত স্বল্প সময় শ্রীশ্রীবাবা অবসর পাইলেন। সম্মুখেই একটী ছোট্ট মেয়ে নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া, তদুপরি শ্রীশ্রীবাবা ছোট ছেলেমেয়েদের অত্যন্ত ভালবাসেন। শূন্য ঝুড়ি মাটীতে রাখিয়া ছোট্ট মেয়েটিকে দু' হাত বাড়াইয়া শ্রীশ্রীবাবা কোলে তুলিয়া লইলেন। চ'খে দেখিয়া যাঁহাকে চেনা যায় নাই, বুকের স্পর্শ পাইয়া ছোট্ট-মেয়েটী কিন্তু তাঁহাকে ঠিক্ চিনিল। শ্রীশ্রীবাবার কোল হইতেই সে চীৎকার করিয়া তাঁর সঙ্গিনীদের ডাকিয়া বলিতে আরম্ভ করিল,—"ও মা, ও মাসীমা, ও দিদিমা, তোরা দেখে যা, এই যে আমাদের স্বামীজী।"

সকলে ছুটাছুটি করিয়া আসিলেন এবং সাধারণ কুলীর মত দেখিতে লোকটাই যে এত বড় খ্যাতিমান্ স্বামীজী, তাহা ভাবিয়া অবাক্ হইলেন। প্রণামের একটা ভিড় পড়িয়া গেল।

ভগবানকে কাহারা পায় ?

অন্ত রাত্রে কৌতুককর এই ঘটনাটুকু লইয়া কোনও কোনও আশ্রম-কর্ম্মীর মধ্যে কথা হইতেছে। তখন শ্রীশ্রীবাবা শ্লেটখানা টানিয়া লইয়া লিখিলেন,—যে ব্যাপার আমাকে নিয়ে হ'য়ে গেল, সেই ব্যাপার ভগবানকে নিয়ে অহর্নিশ হচ্ছে। কত কোটি কোটি জীবন উদ্দেশ্যহীন ভাবে জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার মধ্যে দু' চার জনেরই ভগবদ্দর্শনের আকাঙ্ক্ষা হয়। আকাঙ্ক্ষা যাদের জন্মে, তাদের মধ্যেই সবাই যে ভগবানকে দেখবার জন্য কাজে লেগে যায়, তা' নয়, কেউ কেউ সাধন আরম্ভ করে। সাধন ত' অভ্রান্ত বস্তু, অতএব দু'দিন পরেই ভিতরে বাইরে নানা লোভনীয় বস্তু ও অবস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎকার হ'তে আরম্ভ করে। তখন ভগবানকে ভুলে গিয়ে বিভূতির জালে জড়িয়ে পড়্তে হয় এবং ক্রমে যেখান থেকে যাত্রা সুরু হয়েছিল ফিরে সেই অধঃ-পতনের দিকে গতি আরম্ভ হয়। একান্তই ঈশ্বরমুখী চিত্ত যার, সে নাম, যশ, প্রতিপত্তি, দিব্যদর্শন, দিব্যশ্রবণ, অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভ প্রভৃতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ ক'রে ভগবানের দিকে ফিরে আসে। ভগবানকে দেখ্তে না পেয়ে কেউ যখন তাঁর অস্তিত্বে অবিশ্বাস কচ্ছে, আবার তাঁর দেওয়া বিভূতি দেখে ও অলৌকিক শক্তি পেয়ে কেউ কেউ যখন এজন্মটা তাতেই কাটিয়ে দিতে চেষ্টা পাচ্ছে, তখন একান্ত ঈশ্বরাভিমুখী সাধক এই ছোট্ট মেয়েটীর মত তাঁকে কেবল খুঁজেই বেড়াচ্ছে এবং পরমেশ্বর এভাবেই তাঁকে পরিশেষে কোলে তুলে নিচ্ছেন।

ভগবৎ-প্রাপ্তির পথ

তারপরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—যাঁরা সদ্গুরুর কৃপা পেয়েছে, ভগবানকে খুঁজে পাওয়ার পথ ত' তাঁদের মিলেই গেছে। সদ্গুরু লাভই ভগবান্ লাভের অর্দ্ধেক। কারণ, সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সমগ্র সংশয়-সন্দেহ বিসর্জ্জন দিয়ে নির্ব্বিবাদে একটা পথ ধ'রে অবিশ্রাম চল্তে না চাইলে ত' আর ভগবল্লাভ হবে না।

সদ্গুরু-লাভে দ্বিধা-সংশয় যায়, এখন, এই সদ্গুরুর প্রকাশ তোমার নিজের মধ্যেই হউক, কি অন্য দেহের মধ্যবর্ত্তিতায়ই হোক্। ভগবান্‌কে খুঁজতে হবে, একটা পথে খুঁজতে হবে, একটা ছন্দে খুঁজ্‌তে হবে একটা জায়গায় খুঁজ্‌তে হবে। যখন তাঁকে পাওয়া যায়, তখন দেখা যাবে, তিনি সব পথে আছেন, সব ছন্দে আছেন, সব স্থানে আছেন,—তখন আর সাধন থাকে না, সাধনের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ সাধনের প্রয়োজন আছে, ততক্ষণ নিষ্ঠার এক-লক্ষ্যতা, পন্থার একমুখতা, ছন্দের একতানতা চাই-ই চাই। যে কোনও একটা স্পন্দনের ভিতরে আগে তাঁকে অনুভব করা চাই। ধর, শ্বাস-প্রশ্বাস। শ্বাস-বায়ুর অন্তর্মুখিনী গতিতে তাঁরই গতিকে অনুভব করা চাই, প্রশ্বাস-বায়ুর বহির্গামিনী গতিতে তাঁরই গতিকে অনুভব করা চাই। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অনির্ব্বচনীয় বস্তু তিনি, তোমার ক্ষুদ্র দেহভাণ্ডের প্রয়োজনে বচনীয় হয়েছেন, অনুভবযোগ্য হয়েছেন,—এখন তুমি তাঁকে শ্বাস-প্রশ্বাসের স্পন্দনরূপী লীলার মধ্যে আস্বাদন কত্তে চেষ্টা কর। খোঁজ তাঁকে, তোমার শ্বাসের মধ্যে, খোঁজ তাঁকে তোমার প্রশ্বাসের মধ্যে। শ্বাস-প্রশ্বাস যখন স্বাভাবিক ভাবে বিরত হ'য়ে যাচ্ছে, তখন বায়ুর সেই স্তম্ভিত স্থির অবস্থাটার মধ্যেও ভগবানকে খোঁজ কর। খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে এর ভিতরেই তাঁকে দেখ্‌তে পাবে, তাঁর বিচিত্র মাধুর্য্যে, তাঁর বিচিত্র ঐশ্বর্য্যে, তাঁর বিচিত্র ঔদাসীন্যে—তিনি কখনো প্রেমিকরূপে, কখনো তোমার প্রভুরূপে, কখনো তোমার সহিত অভেদভাবে আত্মপ্রকাশ কর্ব্বেন, তোমাকে ধরা দেবেন।

শ্বাস-প্রশ্বাসে নামজপ

শ্রীশ্রীবাবা আরও লিখিলেন,—এজন্যই শ্বাস-প্রশ্বাসে নামজপের এত আদর। এমন সরল সোজা পথটা জগতে আর দ্বিতীয় নেই। কারণ, কোনো আয়াস নেই, কোনো প্রযত্ন নেই, চেষ্টা ক'রে শ্বাসযন্ত্রের উপর কোনো কসরৎ নেই, শ্বাস-প্রশ্বাসকে বন্ধ ক'রে জোর ক'রে কুম্ভক আনবার প্রয়াস নেই, অথচ যখন যা যেমন দরকার, তখন তা' তেমন হ'য়ে যাচ্ছে। তোমার শুধু দরকার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিটিকে লক্ষ্য করা, আর, প্রত্যেকটা শ্বাসের মধ্যে একটাবার

নাম এবং প্রত্যেকটী প্রশ্বাসে একটীবার নাম স্মরণ করা। আর কোনো যোগ, যাগ, তপস্যার প্রয়োজন নেই।

রহিমপুর আশ্রম
৩রা বৈশাখ, ১৩৩৮

যুগ-শ্রী ও যুগ-ভারতী

আসন্ন উৎসবের জন্য শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় দুইখানা সুবিশাল চিত্র অঙ্কিত করিতেছেন। একখানা লক্ষ্মীমূর্ত্তি, অপরখানা সরস্বতীমূর্ত্তি। মূর্ত্তিদ্বয় লাঙ্গলোপরি উপবিষ্টা। উভয়েই ওঙ্কার-পরিবেষ্টিতা। কমল-রচিত প্রণব লক্ষ্মীকে এবং সর্পরূপী প্রণব সরস্বতীকে বেড়িয়া রহিয়াছে। সরস্বতী চতুর্ভূজা, এক হস্তে বেদ, অপর হস্তে লেখনী, অবশিষ্ট দুই হস্তে বীণা, ললাটে তৃতীয় নয়ন ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছে, রুদ্রাণীর ন্যায় জটাবন্ধনোন্নত শিরোপরি যুগভারতী ত্রিশূলচিহ্ন ধারণ করিয়া আছেন।

শ্রীশ্রীবাবা কখনো চিত্রবিদ্যার চর্চ্চা করেন নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত গিরিশ-দাদাকে এই চিত্রাঙ্কনকালে মাঝে মাঝে আসিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীবাবার এই শিল্প-জ্ঞান দেখিয়া গিরিশ দাদা চমৎকৃত হইতেছেন। অদ্যও শ্রীশ্রীবাবা প্রাতে গিরিশ দাদার বাড়ীতে আসিলেন।

এই সময়ে নবীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিমোহন পোদ্দার ও শ্রীযুক্ত গুরুচরণ পণ্ডিত মহাশয়দ্বয় আগামী উৎসব সম্পর্কিত কি কাজে রহিমপুর গ্রামে আসিয়াছিলেন, চিত্র দেখিতে তাঁহারাও গিরিশ দাদার বাড়ী আসিলেন।

তাঁহারা শ্রীশ্রীবাবাকে এই চিত্রদ্বয়ের পরিকল্পনার অন্তর্গূঢ় ভাবটী কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা লিখিয়া জানাইলেন,—"লাঙ্গল শান্তিপ্রিয় জীবিকার, সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনোপায়ের প্রতীক। ইহার উপরেই আদর্শ যুগের শ্রী ও ধী স্বকীয় আসন রচনা করিবেন। ওঙ্কার এখানে ব্রহ্ম-চেতনার প্রতীক স্বরূপ, মাতা ওঙ্কার পরিবেষ্টিতা,—তার মানে, আদর্শ যুগের মানব কি বিদ্যার্জ্জন, কি অর্থার্জ্জন উভয় কার্য্যেই ভাগবতী স্মৃতিকে অহর্নিশ অন্তরে জাগাইয়া

রাখিতে প্রয়াসী হইবে, জ্ঞানান্বেষণে সে ইহমুখ থাকিবে না, ধনান্বেষণে সে ঈশ্বর-সাধনবর্জ্জিত রহিবে না। সরস্বতী, মহাকালীর বাসন্তী মূর্ত্তি, চতুর্ভুজ তাঁর বিশ্বতোমুখিনী শক্তির ইঙ্গিত। জটা-বন্ধন তপস্যার চিহ্ন,—তপস্যার মধ্য দিয়াই প্রথমে হয় অমঙ্গলের ধ্বংস, তারপরে মঙ্গলের সৃজনী-লীলা বিকশিত হয়, তাই মাতা রুদ্রাণী। একাধারে তিনি ত্রিগুণময়ী, তাই জটা-বন্ধনের প্রান্তদেশে ত্রিশূল বিরাজমান। কমল চিত্তের উৎফুল্লতার এবং সর্প কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণের দ্যোতনা দিতেছে,—অর্থাৎ আদর্শ যুগের মানব ধনচর্চ্চা করিয়া কুণ্ঠিত-চেতা ও দুশ্চিন্তাপরায়ণ হইবেন না, আদর্শ যুগের জ্ঞানী গ্রন্থকীটরূপেই জীবন কাটাইয়া দিবেন না, তাঁর জ্ঞান-চর্চ্চা ঘুমন্ত কুলকুণ্ডলিনীকে জাগাইবে, জীবে-শিবে অভেদবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করিবে, জীবন্মুক্তি প্রদান করিবে।"

মৃতবৎসা-দোষ নিবারণের উপায়

দ্বিপ্রহরের পরে রহিমপুর ও নবীপুর গ্রামের অনেকগুলি মহিলা শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্ম দর্শনে সমাগতা হইলেন। এতদঞ্চলের হিন্দুরা সাধারণতঃ ভক্তিপ্রবণ, মহিলারা ততোধিক। মায়েরা একজনও খালি হাতে আসেন নাই। প্রত্যেকেই হয় একটা ফল, নতুবা একটা ফুল হাতে করিয়া আসিয়াছেন। প্রণাম করিয়া যার যাহা অর্ঘ্য শ্রীশ্রীবাবাকে প্রদান করিলেন।

একটী মহিলার কি বক্তব্য ছিল, কিন্তু সঙ্কোচবশতঃ বলিতে পারিতেছেন না। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে তাঁহার বক্তব্য বলিতে ইঙ্গিত করিলেন।

মহিলাটী নিজে না বলিয়া তাঁর এক সঙ্গিনী দ্বারা জানাইলেন যে,—প্রতি বৎসরই তাঁর সন্তান হইয়াই মারা যায়, কোনো কোনো বার এমন কি মৃতাবস্থায় প্রসূত হয়। ইহার একটা উপায় করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীশ্রীবাবা একখানা কাগজে লিখিয়া দিলেন,—"পূর্ণ এক বৎসর কাল স্বামি-সহবাস করিও না, পবিত্র ভাবে থাকিও, তিন বেলা নামজপ করিও, এবং শয়নকালে জঠর মধ্যে শিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি ধ্যান করিও। ইহাতেই মৃতবৎসা আরোগ্য হইবে।"

তারপরে কাগজখানার উপরে লিখিয়া দিলেন,—স্বামী ব্যতীত অপর কাহাকেও দেখাইও না।

প্রসাদ কাহাকে বলে ?

শ্রীশ্রীবাবা অতঃপর প্রদত্ত ফলমূলগুলি সকলের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। আশ্রমের এক ব্রহ্মচারী সবগুলি ফলমূল ধুইয়া ছুরি দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া থালায় সাজাইয়া শ্রীশ্রীবাবার সম্মুখে ধরিল। শ্রীশ্রীবাবা মনে মনে গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু মহিলারা ছাড়িবেন না। তাঁহারা কেহ কেহ জোর করিয়া আনিয়া শ্রীশ্রীবাবার মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। মায়েদের এই ব্যবহার শ্রীশ্রীবাবা ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেন না। কিন্তু শ্লেটে লিখিয়া জানাইলেন,—চিত্তের প্রসন্নতাই প্রসাদ, মুখের লালা মিশাইয়া দিলেই প্রসাদ হয় না। সেবা, পূজা, ভক্তি ও নিষ্ঠা দ্বারা আরাধ্যকে তৃপ্ত করিবার ঐকান্তিকী চেষ্টায় অন্তরে যে অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি জন্মে, উহারই নাম প্রসাদ।

আশ্রম স্থায়ী হইবে কি না

মায়েরা চলিয়া গেলেন, কিছুক্ষণ পরে রহিমপুর ও নবীপুরের বালক ও যুবকেরা আশ্রমের মাটি কাটিবার জন্য সমাগত হইলেন। শ্রীযুক্ত সূর্য্যমোহন রায়, শ্রীযুক্ত সুকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত হলধর চক্রবর্ত্তী প্রমুখ গ্রামের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনও কোদাল ধরিলেন। গ্রাম-জ্যেষ্ঠগণের অন্যতম শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায় শ্রীশ্রীবাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ছেলেদের উৎসাহ চিরস্থায়ী হইবে কিনা।

শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—জোয়ার ও ভাঁটা এক নদীতেই হয়।

মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—আশ্রম চিরস্থায়ী হইবে কিনা।

শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—একমাত্র পরমাত্মা ব্যতীত চিরস্থায়ী বস্তু ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নাই।

মহেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রলয় পর্য্যন্ত আশ্রম থাকিবে কিনা, সেই প্রশ্ন আমি করি না, আমার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য, আশ্রম দীর্ঘস্থায়ী হইবে কিনা।

শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—স্থায়ী হোক, আর অস্থায়ী হোক্, তাতে কিছু যায় আসে না। সেবাবুদ্ধি নিয়া কাজ করাতেই কর্ম্মীর গৌরব। আশ্রমের স্থায়িত্ব বা অস্থায়িত্বের উপর সে গৌরব নির্ভর করে না।

ভাঙ্গিবার জন্যই বেড়া

শ্রীযুক্ত সূর্য্যমোহন রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সুকুমার ঘোষ এবং অপরাপর কতিপয় গ্রামবাসী আশ্রমের চতুর্দ্দিকে মূলি বাঁশের বেড়া লাগাইতেছেন। এই সকল বেড়াতে উৎসবের জন্য লিখিত উপদেশ-বাক্যসমূহ লাগাইয়া দেওয়া হইবে।

একজন বলিলেন,—স্বামীজীর মৌনভঙ্গের সংবাদে চতুর্দ্দিকে যে রকম একটা ডাক পড়িয়া গিয়াছে, তাতে লোকের ভিড়ে এ সব বেড়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীবাবা শুনিয়া পকেট হইতে কাগজ-পেন্সিল বাহির করিয়া লিখিলেন,—ভাঙ্গিবার জন্যই বেড়া, কাটিবার জন্যই শিকল।

পরার্থই প্রকৃত অর্থ

রাত্রে শ্রীযুক্ত অশ্বিনী পোদ্দার, রাসমোহন পোদ্দার, হলধর চক্রবর্ত্তী, বিপিনবিহারী সাহা প্রভৃতি কতিপয় গ্রামবাসী আশ্রমে আসিলেন। শ্রীশ্রীবাবার তখন নৈশ আহুতি হইয়া গিয়াছে। সকলেই ভক্তিভরে প্রসাদ লইলেন।

তৎপরে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—উৎসবের ত' আর একটী দিন বাকী। শুনিতেছি, সহস্র সহস্র লোক হইবে। তাহাদের স্থানই বা হইবে কোথায়, প্রসাদ-বিতরণেরই বা কি সংস্থান হইবে, ভাবিয়া পাইতেছি না। অথচ, আপনি নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন।

শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"কেন ভাবনা আসে মনে,
তাঁরি কাজ কর্‌বে রে সে
আপনি দেখে শুনে।"*

---

* এই গানটীর রচয়িতা—পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

অশ্বিনীবাবু বলিলেন,—জিজ্ঞাসা করিলে রোজই আপনি ঐ এক উত্তর দেন। কিন্তু আমাদের যে মন মানে না। উৎসব করিবেন আপনি, অথচ দুশ্চিন্তায় আমাদের নিদ্রাত্যাগ হইয়াছে। দেশব্যাপী দুর্দ্দিন, আমাদের কারো হাতে কিছু নাই, জন-মহাজন আন্দোলনের ঠেলায় আমরা জীবন্মৃত হইয়া আছি। কোথায় চাউল, কোথায় ডাইল, কোথায় নূন, কোথায় ঘৃত,—কিছুর সঙ্গে দেখা নাই। অথচ আপনি নির্ব্বিকার। এই সব দেখিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে, নিশ্চয় আপনার হাতে অর্থ আছে।

শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—অর্থ আছে বই কি? তবে সেটা শুধুই অর্থ নয়,—সেটা পরার্থ। আমার অর্থ পরের ঘরে। কাজের সময় এসে জুটবে।

এ কথায় কেহই মনে বড় একটা আশ্বস্তি পাইলেন না। সকলেই প্রণাম করিয়া চিন্তিত মনে স্বগৃহে প্রয়াণ করিলেন।

রহিমপুর আশ্রম
৪ঠা বৈশাখ, ১৩৩৮

কাহার ভার ভগবান্ নেন্

নবীপুরের শ্রীযুক্ত গুরুচরণ পণ্ডিত মহাশয় মহাপ্রাণ বলিয়া আশ্রমবাসীরা সর্ব্বদাই অনুভব করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। আজ পণ্ডিত মহাশয় নবীপুরের শ্রীযুক্ত হরিমোহন পোদ্দার সমভিব্যাহারে অতি প্রত্যূষে রহিমপুর আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা রাত্রি থাকিতেই উঠিয়া কৃষি-উদ্যান মধ্যে পায়চারি করিতেছেন দেখিয়া দুই বর্ষীয়ান ভক্ত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় যুক্তকরে প্রার্থনা জানাইলেন,—আশীর্ব্বাদ করিবেন, যে কাজে যাইতেছি, সেই কাজটী যেন জয়যুক্ত হয়।

কাজটী যে আশ্রমের উৎসবের জন্য তণ্ডুলাদি সংগ্রহ তাহা এই দুই জন ব্যতীত অপর কাহারও জানা ছিল না।

সন্ধ্যার পরে রহিমপুরের শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায় এবং যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয় আশ্রমে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে নিবেদন করিলেন যে,—এক হাজার

লোকের উপযুক্ত উপকরণ রহিমপুর-গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—কাহাকেও উৎপীড়ন করেন নাই ত? জবরদস্তির দানে ভগবান্ প্রসন্ন হন না।

বিপিনবাবু বলিলেন,—আপনার কৃপায় জবরদস্তির কোনও কথাই ওঠে নাই। সকলেই স্বেচ্ছায় যে যা' পারে দিয়াছে। এক্ষণে আপনি অনুমতি করিলেই সব এখানে আনিয়া দিতে পারি।

শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—একখানা মাত্র কুটীর, তাও ক্ষুদ্র। যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাড়ীতেই রাখুন, তাঁর বাড়ী হইতে প্রসাদ-বিতরণের স্থান নিকটে।

যজ্ঞেশ্বর বাবু বলিলেন,—কিন্তু যে পরিমাণ তণ্ডুলাদি সংগ্রহ হইয়াছে, তা'তে হাজার লোকের উপরে কিছুতেই সামলান যাইবে না। অথচ আমাদের দৃঢ় ধারণা, দশ-বারো হাজার লোক হইবেই। ইহার কি ব্যবস্থা হইবে?

শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—পনের হাজার লোকের উপযুক্ত চুলা কাটিয়া রাখুন। যোগক্ষেমং বহাম্যহং,—ভগবানের প্রতিশ্রুতিই দেওয়া আছে। যে সব ভার দেয়, তার সব ভার তিনি নেন।

রহিমপুর আশ্রম
৫ই বৈশাখ, ১৩৩৮

বিশ্বাসই বল

সূর্য্যোদয় হইতেই আজ রহিমপুর আশ্রম কর্ম্ম-কোলাহলে পূর্ণ। দুই তিনখানা গ্রামের যুবকেরা পরিশ্রম করিতেছেন। শ্রীহট্ট আগিহুন নিবাসী শিল্পী শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ রায় আশ্রমের তোরণ সজ্জিত করিতেছেন। এমন সময়ে নবীপুরের শ্রীযুক্ত গুরুচরণ পোদ্দার ও শ্রীযুক্ত হরিমোহন পোদ্দার তিনটী দুই মণী বস্তা ভরা চাউল ও ডাইল আনিয়া আশ্রমে পৌছাইলেন। শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—যজ্ঞেশ্বরের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন।

বৈকাল বেলা হরিনাম ও জয়ধ্বনি করিতে করিতে নানাস্থান হইতে দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকেরা আগমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনটী বিভিন্ন স্থানে আশ্রমের উৎসবের তিনটী অনুষ্ঠান পৃথকীকৃত

হইয়াছে। ঠিক্ আশ্রমের উপরে কৃষি-প্রদর্শনী, আশ্রমের দক্ষিণে গোমতী-তীরে প্রসাদ-বিতরণের স্থান এবং আশ্রম হইতে প্রায় চারি শত গজ পশ্চিমে একটা সুবিস্তীর্ণ স্থানে সভামঞ্চ। হোসেনতলা গ্রামের যুবকেরা আশ্রমের উপরেই একটী জলছত্র নির্ম্মাণে ব্যস্ত, আশ্রম ও প্রসাদ-স্থানের মধ্যদেশে লোকাল বোর্ডের রাস্তার উপরে মধ্যনগরের শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু দত্ত একটী জলছত্র করিতেছেন এবং সভাস্থলের উত্তর প্রান্তে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে মোচাগড়ার গ্রামবাসীদের দ্বারা একটী বিরাট জলছত্র ও দক্ষিণপ্রান্তে রহিম-পুরের শ্রীমান্ দেবেন্দ্রচন্দ্র পোদ্দারের নেতৃত্বে মহিলাদের জন্য একটী জলছত্র হইতেছে। মুরাদনগরের শ্রীযুক্ত কালীমোহন চক্রবর্ত্তী এবং মালিসারের শ্রীযুক্ত রাইমোহন সাহা ডাক্তারদ্বয় সভাস্থলের সন্নিকটে অশ্বিনী কুমার পোদ্দারের বাড়ীতে আকস্মিক বিপৎপাতে সাহায্যের জন্য একটী হাসপাতাল খুলিতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবা প্রতিদিনই মোটা মোটা হরফে নানা উপদেশপূর্ণ মন্ত্র-বাণী নানাবর্ণে চিত্রিত করিয়া কাগজে লিখিতেন। এক একখানা ফুলস্কেপ কাগজ লিখিতে তাঁর তিন কি চারি মিনিট সময় লাগে। প্রথম প্রথম এগুলি নির্ব্বিচারে বিতরণ করিতেন কিন্তু উৎসবের কল্পনা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এগুলি একত্র রক্ষিত হইতে লাগিল; শ্রীযুক্ত সূর্য্যমোহন রায় ময়দার আঠা দিয়া প্রত্যেকটী উপদেশ-বাক্য পীজ-বোর্ড কাগজে লাগাইয়াছেন। অদ্য এই সকল মন্ত্র-বাণী সমগ্র আশ্রম জুড়িয়া লাগান হইতেছে। কৃষি, শিল্প, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি ঐহিক ও পারলৌকিক যাবতীয় আবশ্যকীয় বিষয়ে শ্রীশ্রীবাবার লেখনী-নিঃসৃত উপদেশ-বাণী বিষয়-বিভাগ ক্রমে সজ্জিত করিয়া পিনের সাহায্যে চতুর্দ্দিকে টানান হইতেছে। আশ্রম হইতে সভাস্থল-পর্য্যন্ত ব্যাপী ৪০০।৪৫০ গজ দীর্ঘ লোকাল বোর্ডের রাস্তার দুই পারে ঘন ঘন গাছ,—প্রত্যেক গাছে একটি একটি করিয়া মন্ত্র-বাণী পেরেকের দ্বারা লাগাইয়া দেওয়া হইতেছে।

প্রসাদের জায়গায় একটি চালা তোলা হইতেছে, চালার নিম্নে ৫২টি চুলা খনন করা হইয়াছে।

রাত্রি যখন প্রায় এগারটা, তখন সকলের খেয়াল হইল যে, সভাস্থলের মাটির চাকা এখনো ভাঙ্গা হয় নাই। এই স্থানটায় যে সভা হইবে, তাহা আগে ঠিক্ ছিল না। তাই ভূমির বর্গাদার মাটিটা চষিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে সমস্ত জমিটায় বড় বড় চাকা উঠিয়াছে। এগুলি না ভাঙ্গিলে শ্রোতাদের বসিবার স্থান করা অসম্ভব। একজন গ্রামবাসী এই বিষয়ে শ্রীশ্রীবাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—স্বেচ্ছাসেবকদের জানাও।

স্বেচ্ছাসেবকেরা কেহ চাঁদপুর, কেহ হাজিগঞ্জ, কেহ কসবা, কেহ ব্রাহ্মণ-বাড়িয়া, কেহ নবীনগর প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে পদব্রজে আসিয়াছেন, এবং আসিয়াই কোনও না কোনও কাজে লাগিয়া পড়িয়াছেন, তখন পর্য্যন্ত কেহ কিছু উদরস্থ করিবার অবসর পান নাই। এমতাবস্থায় এত রাত্রিতে চারি পাঁচ বিঘা জমির ঢিল ভাঙ্গা সহজ কথা নহে। কষ্টকর হইলেও স্বেচ্ছাসেবকেরা প্রস্তুত হইলেন।

এমন সময়ে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—থাক্, কাজ নাই, রান্নার যত লাকড়ি বাহিরে পড়িয়া আছে, সেগুলি ঘরে ও রান্নার চালার নীচে জড় কর।

শতাধিক হস্ত পনের বিশ মিনিটের মধ্যে এই কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ফেলিল।

দেখিতে না দেখিতে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত গিরিশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁর অঙ্কিত যুগশ্রী ও যুগভারতী চিত্রদ্বয় আশ্রম-কুটিরের সমক্ষে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়া মাত্র বাঁধিয়াছেন,—বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইতেই তাড়াহুড়া করিয়া সব খুলিয়া ঘরে আনা হইল। সমগ্র আশ্রমব্যাপী মন্ত্রবাণীসমূহ খুলিবার জন্য কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক ছুটিয়া গেলেন, কিন্তু ততক্ষণে বারিবর্ষণে অধিকাংশ মন্ত্র-বাণী অস্পষ্ট বা কুদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। গ্রামবাসী বৃদ্ধ এক অনুরাগী ব্যক্তি বলিলেন,—"বাবা, এখন উপায় ?"

শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—বৃষ্টিই এখন একমাত্র উপায়, মটোর জন্য ভেব না, এর তিনগুণ মটো আমি লিখে রেখেছি।

শ্রীশ্রীবাবা একটি পুটলী খুলিয়া দেখাইলেন। পুটলির মধ্যে অসংখ্য মন্ত্রবাণী এখনো সযত্নে রহিয়াছে।

কিছুকাল প্রবল বর্ষণের পরে আকাশ একেবারে পরিষ্কার হইয়া গেল। এই সময়ে মোচাগড়ার জলছত্র হইতে একজন আশ্রম-কুটিরে আসিয়া জানাইল,—প্রবল বর্ষণে সভাস্থলের চাকা গলিয়া সমগ্র ভূমি সমতল হইয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—এই দেখ পরমাত্মার লীলা। তুমি তোমার সাধ্যমত শ্রম ক'রে যাও, বাকীটুকু তিনি কর্ব্বেন। Have faith, for, faith is strength. (বিশ্বাস কর, কারণ, বিশ্বাসই বল।)

রহিমপুর আশ্রম
৬ই বৈশাখ, ১৩৩৮

হরি ওঁ

সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বেই আজ আশ্রম জনাকীর্ণ। রাত্রি দেড় ঘণ্টা থাকিতেই শ্রীশ্রীবাবা গোমতী-নীরে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করিলেন।

রত্রির বৃষ্টিতে উনানগুলি জলে পূর্ণ হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সুকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত হেমন্ত আচার্য্য প্রভৃতি জল সিঞ্চন করিয়া দিলে তুমুল হরিধ্বনির মধ্যে শ্রীশ্রীবাবা নিজ হস্তে উনানে অগ্নিসংযোগ করিয়া আশ্রমস্থ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। একঘণ্টাকাল মন্দির-মধ্যে অবস্থানের পরে শ্রীশ্রীবাবা যখন বাহির হইলেন, মন্দির-প্রাঙ্গণ তখন শত শত কুল-মহিলায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা বাহির হইবামাত্র গগনবিদারী উলুধ্বনির মধ্যে শত শত পুষ্পমাল্য ও কুসুমাঞ্জলি শ্রীশ্রীবাবার গলদেশে ও পাদপদ্মে বর্ষিত হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহধর্ম্মিনী, কন্যা, পুত্রবধূ এবং গ্রামস্থ বহু মহিলা ধূপ-দীপ দিয়া শ্রীশ্রীবাবার আরতি করিলেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা আশ্রম-কুটিরের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কত অজানা অচেনা নারীপুরুষ শ্রীশ্রীবাবাকে দর্শনমাত্র আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ তাঁহার পাদস্পর্শ মাত্র ভাবস্থ হইতে লাগিলেন। নাম-

কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। দলে দলে কীর্ত্তন-সম্প্রদায় আসিয়া আশ্রম-অঙ্গন পূর্ণ করিতে লাগিলেন। আকাশস্পর্শী মুহূর্মুহু হরিধ্বনিতে পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হইতে লাগিল। মহিলাদের পক্ষে এই ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করা অসম্ভব জানিয়া দলে দলে মায়েরা আশ্রম-কুটিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া ঘন ঘন উলুধ্বনি এবং লাজ-পুষ্পাদি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপুরের নিত্যধামগত শ্রীমৎ বৈকুণ্ঠ সাধুর সম্প্রদায় ও ত্রিশের দিব্যলোকবাসী শ্রীমৎ বসন্ত সাধুর সম্প্রদায় এতদঞ্চলে ভগবদ্ ভক্তগণের অগ্রগণ্য বলিয়া পরিপূজিত, তাঁহারাও আসিয়া দলে দলে আশ্রম-অঙ্গনে সমবেত হইলেন এবং কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন হইলেন। ভাবোচ্ছ্বাস প্রবল হইল, জীব ছোট-বড় ভেদাভেদ ভুলিল, ঈশ্বরীয় প্রেম সকলের হৃদয়কে দ্রবীভূত করিল, শ্রীশ্রীবাবাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তালে তালে চরণ ফেলিয়া মহোল্লাসে অঙ্গ দোলাইয়া ভক্তপ্রবরেরা সুমধুর নাম গান করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে যাঁহারা দুই দশ বৎসর একত্রে রহিয়াছেন, তাঁহারাও কখনো প্রবল ভাবের দ্বারাও তাঁহাকে আবেগাকুল দেখেন নাই,—চিরকাল ভিতরের ভাব তিনি ভিতরে লুকাইয়া বাহিরে কর্ম্মযোগীর কঠোর রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, আজ ভক্তগণ সেই রুদ্রোজ্জল ধীরমূর্ত্তিতে নয়নাশ্রুধারায় সুরধুনী দর্শন করিল। কোনও প্রকার অঙ্গ-বিকার নাই, মুখমণ্ডলের অস্বাভাবিকত্ব নাই, শরীরের চালনা নাই,—স্থির নিস্পন্দ বিগ্রহের অর্দ্ধমুদ্রিত দুই চ'খের কোণে শুধু অধীর বারিধারা।

সহসা শ্রীশ্রীবাবা হস্তোত্তলন করিয়া কীর্ত্তন থামাইতে ইঙ্গিত করিলেন। মন্ত্রমুগ্ধবৎ শত কণ্ঠের তুমুল সঙ্গীত স্তব্ধ হইল। বীণাধ্বনির ন্যায় অতি কোমল কণ্ঠে, অতি মৃদুধ্বনিতে, সম্বৎসরব্যাপী মৌন উদ্‌যাপন করিয়া শ্রীশ্রীবাবা কীর্ত্তনের মধুর সুরে উচ্চারণ করিলেন,—হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওম্।

সূচী-পতনের শব্দটিও শুনা যায়, এমন নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যে শ্রীশ্রীবাবার সেই অতি মৃদু অথচ সুস্পষ্ট হরি-ওঙ্কার যেন ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিল। সমস্ত মৃদঙ্গ থামিয়া রহিল, সুনিপুণ হস্তের মাত্র একটি মৃদঙ্গ হরিনামোচ্চারণের সাথে সাথে লয়-সংযোগ করিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীবাবা গাহিলেন,—হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওম্।

শত কণ্ঠে প্রতি-সঙ্গীত উঠিল,—হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওম্।

কত সুরে, কত ঢংয়ে, কত নব নব বৈচিত্র্যে শ্রীশ্রীবাবা গাহিতে লাগিলেন,—হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওম্।

সেই অননুকরণীয় সুরের যথাসাধ্য অনুকরণ করিয়া ভক্তমণ্ডলী গাহিলেন,—হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওম্।

কীর্ত্তন-রসিক এই অদ্ভুত মৌন-তাপসের সুর-বৈচিত্র্যের লীলায়িত স্বচ্ছন্দ গতি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন, তাল-রসিক যতি-পতনের আশ্চর্য্য বৈচিত্র্য দর্শনে বিস্ময় মানিলেন।

সকলের শ্রবণ-মন প্রেমরসে সিক্ত করিয়া নামপ্রবাহ চলিতে লাগিল,—হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওম্।

সকলের পাপ-তাপ হরণ করিয়া হরি-ওঙ্কারের পুণ্য-বাণী ধ্বনিত হইতে লাগিল,—হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওম্।

ত্রিতাপজ্বালা প্রশমিত করিয়া নামের মলয় বহিতে লাগিল,—হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওম্।

আজ ভাবের আবেগে সর্ব্বজনসমক্ষে নির্দ্ধারিত হইয়া গেল, সর্ব্বসম্প্রদায়ের মহামহোৎসবে কোন্ মন্ত্র সার্ব্বজনীন পাপহরণ করিবে, উপনিষদের কোন্ মহামন্ত্র ভারতের সাম্প্রদায়িকতা-বুদ্ধি-ক্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন সাধক-সঙ্ঘসমূহকে একত্রীভূত করিবে। আজ অখণ্ড-সাধকেরা তাহাদের নাম-কীর্ত্তনের মহাঋক্ লাভ করিল।

তুফানি আলি খাঁ

বেলা সাতটার সময়ে রামচন্দ্রপুরের বিখ্যাত ব্যাণ্ড-পার্টির নেতা তুফানি আলি খাঁ সদলবলে আশ্রম-সমাগত হইলেন। শ্রীশ্রীবাবার পাদস্পর্শ করিয়া তুফানি আলি কাঁদিতে লাগিলেন। তুফানি আলি প্রসিদ্ধ আলাউদ্দিন খাঁর কৃতী ছাত্র।

দারোরা ও গাঙ্গাটিয়া হইতেও আরও দুইটি প্রসিদ্ধ ব্যাণ্ড পার্টি আসিয়া আশ্রমের উৎসবে যোগদান করিলেন। বিনা আহ্বানে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে

তিনটী প্রসিদ্ধ ব্যাণ্ড-পার্টি উৎসবোপলক্ষে নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন। কুমিল্লা হইতে আগত নেতৃস্থানীয় বিখ্যাত ব্যক্তিরা এই সমারোহ দর্শনে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—সাধনার দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হয়।

প্রসাদ-বিতরণ

বেলা দশটার সময়ে প্রসাদ-বিতরণ আরম্ভ হইল। পুকুর হইতে ডুবান নৌকা তুলিয়া মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া তাহাতে খিচুড়ী-প্রসাদ রক্ষিত হইয়াছে। অন্য দিকে উনানে রান্না চলিতেছে। নানা স্থান হইতে বস্তায় বস্তায় এত চাউল ডাইল আসিয়াছে যে, প্রথমে যে উনানগুলি কাটা হইয়াছিল, তাহাতে রন্ধন শেষ করা অসম্ভব বিধায় শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর উঠানে আরও পঁচিশটী চুলা কাটিয়া খিচুড়ী চাপান হইয়াছে। দলে দলে লোক প্রসাদ পাইতে লাগিলেন, দলে দলে লোক পরিবেশন করিতে লাগিলেন ;—একটী দিন আগেও স্থির ছিল না, কে কোন্ কাজ করিবেন, কর্ম্মী কোথায় মিলিবে, অথচ কার্য্যকালে এমন সুশৃঙ্খলার সহিত সব সম্পাদিত হইতে লাগিল যে, সকলেই বিস্ময় মানিলেন। বিকাল তিনটার পরে চুলাতে নূতন হাঁড়ী চাপান বন্ধ করা হইল, যেহেতু প্রসাদ বিতরণ শেষ না হইলে গেলে সভার কার্য্য আরম্ভ করা যায় না। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অনুমান করিলেন,—আনুমানিক বারো চৌদ্দ হাজার ভক্ত আশ্রমে প্রসাদ পাইয়াছেন।

পাহাড়ের সাধু

দ্বিপ্রহরে একটী অভিনব ঘটনা ঘটিল। কোন্ স্থান হইতে কয়েকজন সাধু আসিয়াছেন,—ইঁহাদের বেশভূষা ও কথাবার্ত্তা সবই অভূতপূর্ব্ব। একজন বাংলা ভাষায় কথা বলেন, কিন্তু তাহাও পার্ব্বত্য বাংলা। একজন ইংরাজিতে কথা বলেন। অপরের ভাষা অবোধ্য। ইঁহারা আশ্রমে আসিয়াই শ্রীশ্রীবাবাকে খুঁজিতেছেন। কিন্তু আজিকার দিনে শ্রীশ্রীবাবাকে খুঁজিয়া পাওয়া সহজ কথা নহে, যেহেতু যেদিকেই তিনি যাইতেছেন, সেদিকেই সহস্র সহস্র নরনারী পদধূলিলোলুপ হইয়া তাঁহাকে এমন ভাবে বেড়িয়া ধরিতেছে

যে, স্বেচ্ছাসেবকেরা সাহায্য না করিলে চতুর্দ্দিকের চাপে বিষম দুর্ঘটনাও ঘটিতে পারিত। এজন্য লোকদৃষ্টি অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে, শ্রীশ্রীবাবা গলদেশস্থ মাল্যাদি যখন তখন অন্যের গলায় পরাইয়া দিতেছেন। সকলের মুখে উচ্চারিত হইতেছে, "স্বামীজী" "স্বামীজী", কিন্তু কোন্‌টী যে "স্বামীজী" তাহা সাধারণের পক্ষে চিনিয়া ওঠা দুষ্কর। লম্বা চুল আর দাড়ী দেখিয়া "স্বামীজী" চেনা কঠিন, যেহেতু এই ত্রিপুরা জেলাটাতে সাধুভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি-মাত্রেই প্রায়শঃ এই দুইটী জিনিষ সযত্নে রক্ষা করেন। তবে দুই এক জনের সন্ধানী চক্ষু মাঝে মাঝে "স্বামীজীকে" চিনিয়া ফেলিতেছে। কথায় আছে,—
"যোগীকা ভোগীকা রোগীকা জান্, আঁখ্‌সে নিশান্ ঔর আঁখ্‌সে পছান্।"

প্রসাদ বিতরণের স্থানে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীবাবা প্রসাদ বিতরণ পরিদর্শন করিতেছেন, হঠাৎ তিনি মন্দির-প্রাঙ্গনে কদম্ব বৃক্ষমূলের দিকে রওনা হইলেন; দেখিলেন একটা ভিড়। সমগ্র দিন তিনি ভিড় বর্জ্জন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, এখন কিন্তু স্বেচ্ছায় ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, বৃক্ষমূলে তিনটী সাধু এবং তাঁহাদের কতিপয় চেলা উপবিষ্ট। ভিড়ের লোকেরা একজনও শ্রীশ্রীবাবাকে চিনিতে পারেন নাই, সাধুরা কিন্তু শ্রীশ্রীবাবাকে দেখিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন, অভিবাদন জানাইলেন এবং শ্রীশ্রীবাবা না উপবেশন করা পর্য্যন্ত কিছুতেই উপবেশন করিলেন না।

কোনও কথা নাই, বার্ত্তা নাই, প্রায় পনের বিশ মিনিট কাল ইঁহারা শ্রীশ্রীবাবাকে এবং শ্রীশ্রীবাবা ইঁহাদিগকে নিনিমেষ-নয়নে দর্শন করিতে লাগি-লেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীবাবা হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিতেই তাঁহারা প্রসাদ লইবার স্থানে আসিয়া সাধারণ ভক্তদের সহিত বসিয়া গেলেন। ইঁহাদের পদোচিত সমাদর করিতে চেষ্টা করিলেও ইঁহারা তাহাতে সম্মত হইলেন না। প্রসাদ লইবার পরে ইঁহারা আর অপেক্ষা করিলেন না, অব্যক্ত ভাষা-ভাষী—সাধু ব্যতীত আর সকলেই শ্রীশ্রীবাবাকে পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন, অব্যক্ত ভাষাভাষী সাধু শ্রীশ্রীবাবার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া বিনীত ভাবে কি যেন নিবেদন করিলেন, অঙ্গভঙ্গী দর্শনে তাহা বুঝা গেল।

উৎসবের সভা

ঠিক্ চারিটার সময়ে সভারম্ভ হইবার কথা। কিন্তু সভাস্থলে দ্বিপ্রহর হইতেই এত ভিড় যে, অনেক লোক চতুর্দ্দিকের গাছের উপরে উঠিয়া বসিয়া আছেন। ঠেলাঠেলিতে দুই একজন পড়িয়া হাত-পায়ে চোট্ পাইয়াছেন। হাসপাতাল হইতে ডাক্তারবাবুরা খবর পাঠাইলেন যে, নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই সভা আরম্ভ না করিলে বহুলোকের শারীরিক ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। ভিড়ের চাপে দুই একজন ইতিমধ্যে সংজ্ঞাশূন্য হওয়ায় তাহাদিগকে হাসপাতালে নিতে হইয়াছে।

বেলা দুইটার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা সভাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। কিন্তু প্রণামেচ্ছুদের ভিড়ে তিন চারিপদ অগ্রসর হইতেই পাঁচ সাত মিনিট করিয়া সময় যাইতে লাগিল। অতি কষ্টে আশ্রম-সীমার বাহিরে পৌঁছিয়া যখন দেখা গেল, এ ভাবে অগ্রসর হইতে হইলে সভাস্থলে আর পৌঁছা যাইবে না, তখন জনা পঞ্চাশ স্বেচ্ছাসেবক মিলিয়া একটী সূচীব্যূহে সংগঠিত হইলেন। ব্যূহবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবকেরা তীরবেগে ভীড়ের মধ্য দিয়া পথ করিয়া যাইতে লাগিলেন, আর একদল স্বেচ্ছাসেবক শ্রীশ্রীবাবাকে স্কন্ধোপরি তুলিয়া লইয়া পিছনে পিছনে চলিলেন, তৃতীয় দল পার্শ্বরক্ষা করিতে লাগিলেন।

হাসপাতাল সভাস্থলের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে। হাসপাতালের দুয়ারে পৌঁছার পর ভীড় এত বেশী হইল যে, অগত্যা শ্রীশ্রীবাবাকে হাসপাতালের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইল। হাসপাতাল-গৃহের দক্ষিণ অংশটা স্বেচ্ছাসেবকদের বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। শ্রীশ্রীবাবা হাসপাতালে প্রবেশ করা মাত্র জানালাগুলি খোলা রাখিয়া সব দুয়ার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকেরা সংখ্যায় অল্প নহেন, তাঁহারা সুযোগ পাইয়া প্রণামের অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে বাহিরের জনতা দুয়ার খুলিয়া দিবার জন্য দাবী করিতে লাগিলেন।

বাধ্য হইয়া হাসপাতাল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে শ্রীযুক্ত অশ্বিনী বাবুর দালানের দ্বিতলে উঠিতে হইল। পোদ্দার বাড়ীর ভিতরের

আঙ্গিনায় সহস্রাধিক মহিলা পুষ্পমাল্যাদি হস্তে অপেক্ষমানা। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীশ্রীবাবাকে নামিতে হইল। স্বেচ্ছাসেবকেরা দৃঢ়তার সহিত শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে লাগিলেন। এক সঙ্গে দুই তিন জন করিয়া মহিলা প্রণাম করিয়া যাইতেছেন, আবার দুই তিনজন আসিতেছেন। এই ভাবে প্রায় তিন পোয়া ঘণ্টা পার হইলে শ্রীশ্রীবাবাকে সভামঞ্চের দিকে স্কন্ধোপরি বহন করিয়া নিতে হইল, যেহেতু ভিড় এখন দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

সভামঞ্চে পৌছিতেই দেখা গেল, চারিটা বাজিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত করুণাময় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতির কার্য্য করিবার জন্য শুভাগমন করিবার কথা ছিল। কিন্তু টেলিগ্রাম আসিল, গুরুতর কারণে তিনি উৎসবে যোগদান করিতে সমর্থ হইলেন না। অতএব সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্য হইতে কুমিল্লার বিখ্যাত জননায়ক শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত মহাশয়কে সভাপতিরূপে বরণ করা হইল। উচ্চমঞ্চোপরি শ্রীশ্রীবাবার আসনখানার পার্শ্বেই সভাপতির আসন নির্দ্দিষ্ট হইল।

উদ্বোধন-সঙ্গীত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মোক্তার, সুকবি ও সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীবাবার অভিক্ষাব্রতের প্রশস্তি-স্বরূপে স্বরচিত একটি সঙ্গীত গাহিলেন,—

"ঋষির ভারতে এসেছে আবার
ঋষি-জীবনের শিক্ষা,
হে নব ভারত, লহ নত শিরে
এ নবীন মহাদীক্ষা।

"নিজের চরণে করি নির্ভর
দাঁড়াও আবার বহুকাল পর,
নিজ বাহুবলে জিনিয়া বিশ্ব
না চাহি কাহারো ভিক্ষা।

"অতীতের যশো-গৌরব-গান
নব মূরতিতে লভুক পরাণ,
কত যুগ ধরি, যে মহাচিত্র
করিছে কাল-প্রতীক্ষা।

"আবার জাগাও জাতির চেতনা,
আবার ঘুচাও দেশের বেদনা,
স্বাবলম্বনে আত্মবলের
দাও কঠোর পরীক্ষা।"

মুরাদনগরের দুইটি সুকণ্ঠ বালক শ্রীমান্ নরেন্দ্রচন্দ্র দাস ও হরেন্দ্রচন্দ্র দাস ভ্রাতৃদ্বয় প্রাণমনোহারী কণ্ঠে গাহিলেন,—

এ ভারত জাগ্‌বে আবার
জাগ্‌বে রে ভাই তপোবলে,
এ দেশের অতুল গরব
ডুববে না আর অতল জলে।

কামনাহীন মহান্ প্রাণ
সঙ্গোপনে সবার লাগি
কর্‌বে আত্মদান,
চকিতে-অলক্ষিতে
দিগবিদিকে জন্মাবে ভাই
কঠোর কর্ম্মী দলে দলে।

তাপস প্রাণের মোহন পরশ
পাষাণ হৃদয় মাঝেও দেবে
ত্যাগের সুধারস;

অবশ তখন স্ববশ হবে
কর্‌বে দিগ্বিজয় এ ভবে
কেশরীর দন্ত ভেঙ্গে *
কর্‌বে খেলা অবহেলে ।

দশ সহস্রাধিক লোক শ্রীশ্রীবাবার মুখের একটী কথা শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছেন। সভাপতির অনুরোধে শ্রীশ্রীবাবা দণ্ডায়মান হইলেন। গগন-বিদারী তুমুল হরিধ্বনি উত্থিত হইল,—সমবেত জন-নারায়ণকে যুক্তকরে অভিবাদন করিয়া জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে শ্রীশ্রীবাবা অভিভাষণ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। সম্বৎসর-ব্যাপী-মৌনব্রতে কণ্ঠ স্তিমিত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সম্ভবতঃ প্রাতঃকালীন কীর্ত্তনের ফলে অথবা অপর কোনও যৌগিক শক্তিতে বক্তৃতাকালে কণ্ঠ হইতে যেমন বজ্রধ্বনি বহির্গত হইতে আরম্ভ করিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সমবেত নর-নারায়ণ মণ্ডলি, আপনাদের কর্ণ শুশ্রূষু। কিন্তু বাক্যের বলে আমি একেবারেই বিশ্বাসী নই, আমি বিশ্বাসী দৃঢ়বীর্য্য চিন্তার অমোঘ শক্তিতে। অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে যে চিন্তা যুগের পর যুগ সঙ্গোপনে পরিপোষিত হয়ে আস্‌ছে, যুক্তি-তর্কের অতীত ভূমিতে লোক-লোচনের অগোচরে যে ধ্যান নিভৃত পূজাঞ্জলি পেয়ে শুদ্ধ ও মহৎ হয়েছে, আমি বিশ্বাসী তার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী আশ্চর্য্য শক্তিতে। একটী অন্তরে সত্য যখন জমাট হয়ে বাসা বাঁধে, তখন চিন্তার যে অনির্ব্বচনীয় শক্তি বাহ্য সহায়তার প্রতীক্ষা না ক'রে শব্দভেদী বাণের মত যথাস্থানে গিয়ে উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত কার্য্যের জন্য বিদ্ধ করে, আমি বিশ্বাসী সেই শক্তিতে। এই শক্তি তপস্যায় লভ্য, প্রবচনে নহে, বাগ্‌বিলাসে নহে, বাগ্‌বিভূতিতে নয়। একটী প্রাণ যখন মহাপ্রাণের স্পর্শ পায়, তখন সে ইচ্ছার অব্যর্থ প্রভাবে সহস্র সহস্র প্রাণহীনের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চারণা প্রসারিত করে। আমি তারই উপাসক, তারই পূজারী। আপনাদের সেবা আমি এই পথেই কত্তে চাই।—আপনারা আমার নমোনারায়ণায় গ্রহণ করুণ।

* মহাভারতে আছে, তপস্বিনী শকুন্তলার সন্তান দুষ্মন্তাত্মজ ভরত সিংহের দাঁত ধরিয়া টানিতেন।

অতঃপর মুরাদনগর হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র গাঙ্গুলী প্রমুখ দুই একজন স্থানীয় বক্তার বক্তৃতার পরে বিদেশাগত বক্তাগণ ওজস্বিনী ভাষায় অভিক্ষার নৈতিক শক্তি, ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা অসামান্য প্রতিভার অধিকারী হইয়াও সহরে বিন্দুমাত্র শ্রমের অপব্যয় না করিয়া আকৈশোর পল্লীতে পল্লীতে মানবাত্মার জাগরণ সম্পাদন করিয়া বেড়াইতেছেন বলিয়া কোনো কোনো শ্রদ্ধেয় নেতা ভূয়সী প্রশংসাবাদ বর্ষণ করিলেন। রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য চলিল।

পরিশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ তেজঃপূর্ণ ভাষায় জীবন্ত ভঙ্গীতে বলিতে লাগিলেন,—সাধু, সন্ত, স্বামী, সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক কি পরমহংস প্রভৃতির প্রতি স্বভাবতই আমি খুব শ্রদ্ধাবান্ নই। কিন্তু এই ত্রিপুরারই কোনও এক পল্লী-প্রতিষ্ঠানে যেদিন আমি শ্রীমৎ স্বরূপানন্দের প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ করি, সেদিনই আমি বুঝেছিলাম যে, সাধু-সন্তদের প্রতি আমার চিরপোষিত ধারণার পরিবর্ত্তন সাধন প্রয়োজন। অন্ততঃপক্ষে চুয়ান্ন লক্ষ সন্ন্যাসীর সবাইকেও যদি এক রকম দেখি, তবু এই একটী ব্যক্তিকে পৃথক্ ভাবে দেখ্‌তে হবে। তপস্যার সাথে কর্ম্মযোগের এ সমন্বয়, জীবসেবার সাথে অভিক্ষার এ সমন্বয়, বাস্তবিকই অদ্ভুত ও অভূতপূর্ব্ব। জীবনের প্রৌঢ়ে এসে এমন একজন মহীয়ান্ পুরুষের পাদপদ্ম স্পর্শ করার সৌভাগ্য আমি পেয়েছি ব'লে নিজেকে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ মনে কচ্ছি। এই সিদ্ধযোগীর মুখ থেকে আজই আপনারা শুনেছেন যে, তপস্যার শক্তিই শক্তি, এবং সে শক্তির প্রমাণও আপনারা স্বচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছেন। এমন একটা মহাসমারোহের ব্যাপার ভিক্ষা ক'রে, চাঁদা তুলে, নানা জোগাড়-যন্ত্র ক'রে লোকে ক'রে উঠ্‌তে পারে না। আর একজন অযাচক ঋষির ইচ্ছামাত্র কটাক্ষের ইঙ্গিতে সব হ'য়ে গেল। আজ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার কর্ব্ব, সত্যিই আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদের তপস্যার ধারার ভিতরে, সাধনার ধারার ভিতরে জগৎ জয় করার মত কোনো মহাবস্তু লুক্কায়িত আছে।

গ্রামবাসীদের আতিথেয়তা

রাত্রে আশ্রমে প্রসাদ বিতরণের কোনও ব্যবস্থা ছিল না, চাউল-ডাইল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছাসেবকেরা সভাভঙ্গের পরে কতকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সকলকে একত্র করিয়া পুনরায় রাত্রির রন্ধনের আয়োজন করা হইতেছে, এমন সময়ে জানা গেল, রহিমপুর ও নবীপুর গ্রামবাসী প্রত্যেক গৃহস্থ নিজেরা আহ্বান করিয়া নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ করিয়া এবং অশ্বিনী পোদ্দার ও হরিমোহন পোদ্দার প্রভৃতি ব্যক্তিরা দুই তিন শত করিয়া অতিথি লইয়া গিয়াছেন। সুতরাং রাত্রিতে আশ্রমে দেড় শত স্বেচ্ছাসেবক এবং দুই শত অতিথির জন্য প্রসাদ-ব্যবস্থা করিতে হইল। এই উপলক্ষে রহিমপুর ও নবীপুর গ্রামবাসীদের আতিথেয়তার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইল।

দীক্ষাপ্রার্থীর ভিড়

সভাভঙ্গের পরে শ্রীশ্রীবাবার নিকটে দীক্ষা পাইবার জন্য বহু ব্যক্তি প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবা একটী প্রাণীকেও দীক্ষা প্রদান করিলেন না। কাহাকেও বলিলেন,—পরে হবে। কাহাকেও বলিলেন,—কুলগুরুর কাছে যাও। কাহাকেও বলিলেন,—তোমার গুরুশক্তির বিকাশ অন্যত্র।

রহিমপুর আশ্রম
৭ই বৈশাখ, ১৩৩৮

জাঁহাপুরের জমিদার অদ্য প্রত্যূষে আশ্রমে কয়েক ঝুড়ি ফল প্রেরণ করিয়াছেন। স্বেচ্ছাসেবক এবং সমাগত ভক্তদের মধ্যে তাহা বিতরণের পরে শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত আহম্মদ আলিখাঁ সুমধুর কণ্ঠে ভগবৎ-সঙ্গীত গাহিয়া শুনাইতে লাগিলেন। মুসলমানের মুখে হরিনাম কীর্ত্তন ও কালীনাম গান এতদঞ্চলে বড় দুর্লভ নহে। কিন্তু আহম্মদালীর ভাবুকতা সকলের প্রাণ স্পর্শ করিল।

বেলা হইলে সঙ্গীত থামিল, মাধ্যাহ্নিক প্রসাদ বিতরিত হইল। প্রসাদ পাইবার পরেই বহু তত্ত্বজিজ্ঞাসু শ্রীশ্রীবাবাকে ঘিরিয়া ধরিলেন। কারণ

অনেকেই বিকালে স্বালয়ে প্রয়াণ করিবেন। বিশেষতঃ মোচাগড়াবাসীদের একান্ত আগ্রহে অদ্যই শ্রীশ্রীবাবা সেই গ্রামে গমনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

নাম করিতে করিতেই প্রাণায়াম হইবে।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—বাবা, আপনি আমাকে এখনো প্রাণায়ামের কোনও উপদেশ প্রদান করেন নি। অথচ, নানা পুস্তক প'ড়ে প্রাণায়াম কত্তে আমার বড় ইচ্ছে যায়।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিষ্ঠা নিয়ে, নির্ভর নিয়ে নাম ক'রে যা, তারই ফলে আপনা আপনি প্রাণায়াম হ'তে থাকবে।

প্রাণায়াম কাহাকে বলে?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রাণায়াম কাকে বলে জানিস্? অবিশ্রান্ত যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আস্‌ছে আর যাচ্ছে, তাতে অহর্নিশ যথেষ্ট শক্তির ক্ষয় হচ্ছে। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতিকে নিয়মিত ক'রে, নির্দ্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ ক'রে শক্তির ঐ অফুরন্ত ক্ষয়কে পূরণেরই নাম প্রাণায়াম। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসকে কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বাঁধনে না বেঁধে তার পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে বায়ুর চঞ্চলতা জনিত ক্ষতিকে পূরণ ক'রে নেওয়ার চেষ্টাই হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রাণায়াম। জোর ক'রে বায়ুকে রুদ্ধ কত্তে গেলে অনেক সময়ে সে রুদ্ধ না হয়ে বরং আরো চঞ্চল হয়ে উঠ্‌তে পারে,—ওঠেও। তারই জন্য তোদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম ক'রে যাওয়া। নাম কত্তে কত্তে ক্রমশঃ অনুভব কত্তে পারবি যে, শ্বাস-বায়ু ও প্রশ্বাস বায়ু আগের চেয়ে ধীরগামী হচ্ছে, বিনা চেষ্টায় অল্পদূরগামী হ'য়ে আস্‌ছে। আরো কিছুদিন গেলে টের-পাবি, বায়ু মাঝে মাঝে একেবারে স্থির নিশ্চল হ'য়ে যাচ্ছে। এই স্থির অবস্থাটারই নাম কুম্ভক।

প্রাণায়ামের লক্ষ্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—প্রাণায়ামের লক্ষ্য হচ্ছে এই কুম্ভক। কারণ, কুম্ভকের অবস্থাতে মনের চঞ্চলতা নাশ প্রাপ্ত হয়। বায়ু যখন স্থির হয়ে

যায়, তখন মন স্থির না হয়েই পারে না। এই কুম্ভকটী যাতে আসে, তারই জন্য যোগীরা প্রাণায়াম করেন।

কুম্ভক ও প্রাণায়ামের পার্থক্য

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—কুম্ভক ও প্রাণায়ামের পার্থক্যটা বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে process (প্রক্রিয়া)টার অনুশীলন কর্‌লে বায়ুর স্থিরতা আসে, তার নাম প্রাণায়াম। আর, প্রাণায়াম করার ফলে বায়ুর যে স্থিরতা আসে, তার নাম কুম্ভক। বায়ুর স্থিরতা লাভই তোমার প্রয়োজন, কারণ বায়ুর স্থিরতা এলেই মনের স্থিরতা আসে। তখন সেই মন ভগবৎ-প্রেমের সুমধুর আস্বাদনকে লাভ কত্তে সমর্থ হয়। প্রাণ-বায়ুকে নিয়ে কসরৎ কর আর না কর, তাতে কিছু আসে যায় না। কসরৎ না ক'রে যদি সহজ উপায়ে বায়ুর স্থিরতা আসে, তবে কসরৎ কত্তে যাওয়া সময়ের অপব্যয় আর শক্তির বাজে খরচ ছাড়া কিছুই নয়। এই জন্যই আমি প্রাণায়াম সম্বন্ধে পৃথক্ উপদেশ তোদের দেই নাই।

হঠ-কুম্ভক ও সহজ-কুম্ভক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কুম্ভক জিনিষটা আবার এক রকমের নয়। বলপূর্ব্বক বায়ুকে রুদ্ধ ক'রে রাখার ফলে যে কুম্ভক হয়, এ'কে বলে হঠ-কুম্ভক। শারীরিক শক্তির যাদের প্রয়োজন, তাদের মধ্যে এই হঠ-কুম্ভকের প্রচলন আছে। কিন্তু স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসে নাম-সাধন কত্তে কত্তে যে কুম্ভক এসে যায়, তাকে বলে সহজ কুম্ভক। জগতের শ্রেষ্ঠ যোগীরা এই সহজ কুম্ভকের অবস্থায় শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব সমূহের সাক্ষাৎকার পেয়েছিলেন।

বাহ্যবৃত্ত কুম্ভক ও আভ্যন্তরবৃত্ত কুম্ভক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সহজ কুম্ভকের আবার দুইটী প্রকারভেদ আছে। তুমি শ্বাসটী গ্রহণ করেছ, কিন্তু তারপরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বায়ু আপনিই নিশ্চল হয়ে রইল, প্রশ্বাস আর বেরুল না, এই অবস্থাটাকে বলে আভ্যন্তর-বৃত্তি বা আন্তরিক কুম্ভক। সমুদ্র থেকে জোয়ার এলে নদীর জলের মধ্যে যেমন

সমুদ্রের জলের আস্বাদ পাওয়া যায়, আভ্যন্তর কুম্ভকের অবস্থায় সাধকের রসানুভূতির ভাবটা সেই রকম হয়। নিজের ভিতরে ভগবানের স্পর্শ তিনি পাচ্ছেন, নদীর দুই পার ভাঙ্গেনি, নদীর নদীত্ব বিলুপ্ত হয়নি, কিন্তু সমুদ্র-প্লাবনে দুই পার অনন্তযোজন বিস্তারিত হ'য়েছে। এই অবস্থাতে সাধকের জীবভাব দূর হয় না, কিন্তু জীবভাবের শুদ্ধতম স্তরে তিনি উপনীত হন। ভগবানকে তিনি তখন আস্বাদন করেন, নিজে ভগবান থেকে পৃথক্ থেকে। দ্বৈতবাদের জড় তখনো থাকে এবং কুম্ভকের এই অবস্থাতে বৈষ্ণবীয় পঞ্চরস ও তন্ত্রোক্ত মাতৃভাবের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সব অনুভূতি স্ফুরিত হ'তে থাকে। সহজ কুম্ভকের আর একটী প্রকার হচ্ছে বাহ্যবৃত্ত কুম্ভক। প্রশ্বাসটী তুমি ত্যাগ করেছ, কিন্তু তারপরে কতক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশ্বাস তুমি আর গ্রহণ কল্লে না, আপনিই বায়ু স্থির হয়ে রইল, একে বলে বাহ্যবৃত্তি। ভাটার সময়ে নদীর জল গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে পড়্লে তার নিজস্ব আস্বাদ ও বর্ণ হারিয়ে সে যেমন সমুদ্রের জলের আস্বাদ ও বর্ণকে প্রাপ্ত হয়, বাহ্যবৃত্ত কুম্ভকের অবস্থায় সাধকের তত্ত্বাস্বাদনের অবস্থাটা অনেকটা সেই রকম হয়। নিজের ক্ষুদ্রত্ব, খণ্ডত্ব, সসীমত্ব তিনি ভুলে যাচ্ছেন, কিন্তু অতি সূক্ষ্মভাবে তাঁর জীববুদ্ধি খানিকটা থেকে যাচ্ছে, জীব ও ব্রহ্মের মিলন জনিত আনন্দটাকে পর্য্যবেক্ষণ করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'নূনের পুতুল সমুদ্র মাপ্তে নেমেছে' কিন্তু চোখের একটুখানি দৃষ্টি সমুদ্রের বাইরে রেখে। অদ্বৈততত্ত্বের গভীরতম উপলব্ধিসমূহ কুম্ভকের এই অবস্থাতে জীবাত্মায় প্রতিফলিত হতে থাকে এবং ব্রহ্ম থেকে নিজের পার্থক্যানুভূতি এই অবস্থার দৈর্ঘ্যের সাথে সাথে হ্রাস পেতে থাকে।

বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয়বিধ কুম্ভকই জীবমাত্রে হইতেছে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বাহ্য কুম্ভক ও আভ্যন্তর কুম্ভক একই সময়ে বা বিভিন্ন সময়ে একই সাধকের প্রত্যক্ষীভূত হ'তে থাকে। একদল লোকের শুধু বাহ্য কুম্ভকই হবে, আর একদল লোকের শুধু আভ্যন্তর কুম্ভকই হবে, এমন কোনও কথা নেই। তবে, শরীরের গঠন, মনের একাগ্রতা, চিত্তের আবেগ

ও নিষ্ঠার পার্থক্যের ফলে কারো বাহ্যকুম্ভক আগে প্রত্যক্ষ হতে আরম্ভ করে, কারো বা আভ্যন্তর কুম্ভক আগে হয়। দু একজন খুব অসামান্য ভাগ্যবানের দুইটী কুম্ভক যুগপৎ প্রত্যক্ষ হ'তে থাকে। আর, বাস্তবিক প্রতিনিয়ত আমাদের প্রত্যেকের প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসেই এই দুইটী কুম্ভক হচ্ছে,—তবে সে কুম্ভক এত অল্পকাল স্থায়ী যে, আমাদের দৃষ্টিতে তা পড়্ছে না। একটু লক্ষ্য কর্‌লেই দেখ্‌তে পাবে, শ্বাস টেনে ছাড়্‌বার আগে অতি অল্পক্ষণের জন্য বায়ু স্থির হয়ে থাকে, আবার প্রশ্বাস ছেড়ে টান্‌বার আগে অতি সামান্যকাল বায়ু নিঃস্পন্দ থাকে। এই স্থির অবস্থাটাই কুম্ভকের অবস্থা। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম কত্তে কত্তে এই স্থির অবস্থাটার দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়, তখন কুম্ভকটা বিনা ক্লেশে চোখে পড়ে। সাধন কত্তে কত্তে যাদের বাইরের কুম্ভকটা দীর্ঘকালব্যাপী হচ্ছে, তাদের ঐ সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের কুম্ভকও হচ্ছে, তবে হয়ত অল্পকালস্থায়ী। আবার যাদের ভিতরের কুম্ভকটা বেশী সময় নিয়ে হচ্ছে, তাদেরও ঐ সঙ্গে সঙ্গে বাইরের কুম্ভকটা হচ্ছে, তবে দীর্ঘস্থায়ী নয় বা লক্ষ্য করার মত নয়, এই যা।

কুম্ভকে দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীর কলহ-নিবৃত্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—তবু যে লোকে দ্বৈতবাদ আর অদ্বৈতবাদ নিয়ে কেন কলহ করে, বুঝা ভার। নিজের মধ্যে ভগবান্‌কে এনে তাঁর আস্বাদন করার নাম দ্বৈতসাধনা, আর ভগবানের মধ্যে নিজে ডুবে গিয়ে, তাঁকে আস্বাদন করার নাম অদ্বৈতসাধনা। প্রতি নিঃশ্বাসে ও প্রতি প্রশ্বাসে এই দুটাই আমাদের হচ্ছে। যাঁরা সজাগ সাধক, প্রত্যেকটী নিঃশ্বাস তাঁদের পক্ষে প্রেমময় শ্যামসুন্দরকে শ্রীরাধার কুঞ্জে ডেকে এনে মাল্য-চন্দনে পূজা করা, আর প্রত্যেকটী প্রশ্বাস তাঁদের পক্ষে অভিসারিকা মূর্ত্তিতে মৃত্যুময় পথে ছুটে গিয়ে শ্যামসুন্দরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া। আমার কুঞ্জে তাঁকে ডেকে এনে যখন তাঁর সঙ্গে মিলি, তখন তিনি কতকটা আমার মত হন, আমার গৃহের আইন মানেন, আমার যাতে তৃপ্তি তা নিয়ে তৃপ্ত হন, আমার পছন্দমত সাকার হন বা মানুষমূর্ত্তি ধারণ করেন। এই হ'ল আভ্যন্তর কুম্ভকের উপলব্ধি। আর, আমি যখন তাঁর বাঁশী শুনে পাগল হ'য়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি, তখন আমি

কতকটা তাঁর মত হই; তাঁর কোলে যখন ঝাঁপিয়ে পড়ি, তখন রাধার আর অস্তিত্ব থাকে না, সব শ্রীকৃষ্ণময় হ'য়ে যায়। এই হ'ল বাহ্যবৃত্ত কুম্ভকের উপলব্ধি। সুতরাং নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে আমরা প্রতিনিয়ত দ্বৈতবাদী আর অদ্বৈতবাদী। একটা দিনের মধ্যে একুশ হাজার ছয় শ' বার আমরা দ্বৈতবাদী আবার একুশ হাজার ছয় শ' বার আমরা অদ্বৈতবাদী।

কেবলী কুম্ভক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এর উপরেও একটা অবস্থা আছে। তাকে বাহ্যকুম্ভক ও বল্‌ব না, আভ্যন্তর কুম্ভকও বল্‌ব না। তার নাম কেবলী কুম্ভক।

"রেচকং পূরকং ত্যক্ত্বা সুখং যদ্বায়ুধারণম্।"

রেচক নেই, পূরক নেই, শ্বাস গ্রহণও নেই, শ্বাস পরিত্যাগও নেই, অথচ বায়ু আপনি বিনা ক্লেশে স্থির হ'য়ে আছে। এই কুম্ভকে দ্বৈত ও অদ্বৈত বিচারের অতীত এক অনির্ব্বচনীয় রসোপলব্ধি হ'তে থাকে। সে রস এমন মধুর, যার তুলনায় বৈষ্ণবের পঞ্চরস আর বৈদান্তিকের অদ্বৈতবিচার তুচ্ছাতিতুচ্ছ, হেয়, নগণ্য। এ রসকে ব্যাখ্যা ক'রে কেউ কখনো বুঝাতে পারে নাই। ব্যাখ্যা ক'রে যত কিছু রস আর যত কিছু তত্ত্ব আজ পর্য্যন্ত বুঝাবার চেষ্টা হ'য়েছে, সব এই অনির্ব্বচনীয় রস ও তত্ত্বের নীচের থাকে।

কি ভাবে কেবলী কুম্ভক হয়।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কি ভাবে যে কেবলী কুম্ভক হয়, তাও একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। শ্বাস গ্রহণের পরে যদি কুম্ভক হয়, তবে তাকে কেবলী কুম্ভক বলা চল্‌বে না,—তা যত দীর্ঘ-স্থায়ীই হোক্। তার নাম আভ্যন্তর কুম্ভক। প্রশ্বাস ত্যাগের পরে যদি কুম্ভক হয়, তাকেও কেবলী কুম্ভক বলা চল্‌বে না,—তার নাম বাহ্যবৃত্ত কুম্ভক। শ্বাস নেই, প্রশ্বাস নেই, আপনি কুম্ভক হচ্ছে, অথচ এর জন্য কোনও শারীরিক বা মানসিক উদ্বেগেরও লেশ-মাত্র নেই, তার নাম কেবলী কুম্ভক। কেবলী কুম্ভক হঠাৎ হয় না, একদিনে হয় না, অনেক দিনের সাধনের ফলে হয়। প্রথম যখন আভ্যন্তর বা বাহ্য কুম্ভক হ'তে আরম্ভ করে, তখন বিনা চেষ্টায় আপনা আপনি শ্বাস বা প্রশ্বাস

কিম্বা শ্বাস ও প্রশ্বাস উভয়ই, দীর্ঘ হ'তে আরম্ভ করে। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম কত্তে কত্তে শ্বাস ও প্রশ্বাস তাদের দৈর্ঘ্যের চরম সীমায় আপনি গিয়ে উপনীত হয়। তার পরে নূতন একটা ভঙ্গী প্রকাশ পায়। অজ্ঞাতসারে শ্বাস বা প্রশ্বাস কিম্বা উভয়ই ক্রমশঃ ছোট হতে আরম্ভ করে, স্থিতি কালটা অর্থাৎ কুম্ভকটার পরিমাণ আপনিই বাড়্‌তে থাকে। শ্বাসের দৈর্ঘ্য (length in time) ও শ্বাসের গভীরতা (depth) আগে যেমনই বাড়্‌ছিল, এখন ক্রমে তেমনি কম্‌তে থাকে, অথচ স্থিতি-কালটা কমে না, তা বেড়েই চলে। এই ভঙ্গীটার চরম অবস্থার নাম কেবলী কুম্ভক।

সাধন ব্যতীত উপলব্ধি হয় না

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মুখে ত' অনেক কথাই শুন্‌লে ধন, কিন্তু সাধন না কর্‌লে এর একটা অক্ষরও বুঝ্‌তে পার্‌বে না। যোগশাস্ত্রে অনেক কথা লেখা আছে, কত পণ্ডিতেই ত পড়্‌ছে, কতজন তার আবার ব্যাখ্যা লিখে ছাপিয়ে বিক্রী পর্যন্ত কচ্ছে, কিন্তু বাবা বিনা সাধনসে সিদ্ধি নেহী হোগা। যোগশাস্ত্র যা প্রকাশ করেন নাই, এমন অনেক কথা আমি ত ঝড়ের মত এক নিঃশ্বাসে বলে দিলুম, কিন্তু বিনা তপস্যায় শুধু তোতাপাখীর বুলিই থাক্‌বে কিছু বুঝ্‌তে চাও, জান্‌তে চাও, রসানুভূতি কত্তে চাও, তত্ত্বকে দেখ্‌তে চাও, প্রবল বিক্রমে সাধন কর, অতুল অধ্যবসায়ে নাম ক'রে যাও।

পিতৃমাতৃ-চরণ পূজার আবশ্যকতা

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা অপর একটী যুবককে উপদেশ দিতে দিতে বলিলেন,—প্রত্যহ ঘুম থেকে উঠে পিতামাতার চরণ বন্দনা কর্ব্বে। সাধক যদি হ'তে চাও, আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি যদি কত্তে চাও, তবে জান্‌বে, এ উপদেশ পালনের তোমার নিশ্চিতই প্রয়োজন আছে। পিতৃমাতৃভক্তিহীন অকৃতজ্ঞ সন্তানে আর জঙ্গলের একটা জানোয়ারে কোনো তফাৎ নেই। পিতামাতার আশীর্ব্বাদ সাধককে বর্ম্মের মত সহস্র প্রলোভন থেকে রক্ষা কত্তে পারে। কিন্তু সেই আশীর্ব্বাদ অর্জ্জনের আগ্রহ তোমাদের কৈ, আকাঙ্ক্ষা তোমাদের কোথায়? সংসার ত্যাগ ক'রে যেতে হয়, ত', ভক্তির বলে অর্চ্চনার বলে

আগে তাঁদের হৃদয় জয় কর, তাঁদের অকুণ্ঠিত মনের আশীষ-বাণী আদায় কর, তাঁদের অভিসম্পাতকে নয়, তাঁদের সদিচ্ছাকে সাথী ক'রে নিয়ে তবে ঘর ছাড়। এ কাজ অসম্ভব ব'লে মনে ক'র না। তোমাদের যুগেই এমন অনেক মহাপুরুষ জন্মেছেন, যাঁরা সেবা দ্বারা পিতৃমাতৃ-হৃদয় জয় ক'রেছেন, ভক্তিশ্রদ্ধার দ্বারা তাঁদের মন বশীভূত ক'রেছেন, তার পরে জগন্মঙ্গলের সঙ্কল্প নিয়ে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। যা একজনে পেরেছেন, তা আর একজনে কেন পারবে না ?

জিজ্ঞাসু কহিলেন,—প্রণাম কত্তে যে লজ্জা করে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এতে যার লজ্জা করে, ভাত খেতে তার লজ্জা হওয়া উচিত, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগে তার লজ্জা হওয়া উচিত, কাপড় পরতে তার লজ্জা হওয়া উচিত, কাউকে মুখ দেখাতে তার লজ্জা হওয়া উচিত। কর্ত্তব্য কার্য্যে আবার লজ্জা কিরে ?

ভক্তিহীনের প্রণাম

অপর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—পিতামাতার প্রতি যার ভক্তি নেই, তার পক্ষে প্রণাম করাটা কি কপটাচার হবে না ?

শ্রীশ্রীবাবা বল্লেন,—ভক্তি নেই, অথচ বাপমাকে বুঝান দরকার যে আমার খুব ভক্তিশ্রদ্ধার জোর,—এ অবস্থায় যে প্রণাম, তাকে কপটাচার বলা যায়। সম্পত্তি পাবার লোভে কিম্বা অন্য কোনও স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভক্তিহীন চিত্ত নিয়ে নীচাত্মা সন্তান তাঁদের অনেক সময় প্রণাম ও সেবা-শুশ্রূষা করে। তাতে কোনো পুণ্য নেই। কিন্তু "ভক্তি আমার হোক্, শ্রদ্ধা আমার জন্মাক্"—এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভক্তিহীন পুত্রকন্যাও মা-বাপ্‌কে প্রণাম করবে। তাতে ক্রমশঃ ভক্তি আসবে।

মোচাগড়া আশ্রম

বিকালবেলা শ্রীশ্রীবাবা দেড় মাইল উত্তরে অবস্থিত মোচাগড়া গ্রামে রওনা হইলেন। প্রায় চল্লিশ পাঁচচল্লিশ জন ভক্ত সঙ্গ লইলেন। মোচাগড়া গ্রামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যথা, শ্রীযুক্ত হরমোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত গদাধর

দেব, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দে, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখের আমন্ত্রণে শ্রীশ্রীবাবা মৌনাবস্থাতেই রহিমপুর হইতে মোচাগড়া গ্রামে পদধূলি প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে গ্রামবাসীরা গ্রাম-মধ্যে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীশ্রীবাবাকে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিতে থাকেন।

শ্রীশ্রীবাবা লিখিয়া জানাইয়াছিলেন,—অযাচকের আশ্রম যেখানে সেখানে হওয়া অতীব কঠিন। কারণ ভিক্ষাবৃদ্ধিতে-অনাস্থাকারী অভিক্ষাতে-একান্ত-বিশ্বাসী কর্ম্মী সুলভ নহে। দেশসেবার কল্পনা কাহারও মাথায় আসামাত্র চাঁদার রসিদ মুদ্রণের ব্যবস্থা হয়। ইহাই বর্ত্তমানের আবহাওয়া। সুতরাং কর্ম্মীর অভাবেই আমি এখানে আশ্রম করিতে অনিচ্ছুক। দ্বিতীয়তঃ, স্বাবলম্বী আশ্রম দুই চারি কাণি ভূমিতে স্থাপিত হইতে পারে না। এতটুকু ভূমির উপরে যত শ্রমই নিয়োজিত হউক না, একটা লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ প্রয়োজনই তার দ্বারা মিটান অসম্ভব।

কেহ কেহ বলিলেন,—আচ্ছা, সেই ভাবে আশ্রম এখানে না হয় ত' বরং মাঝে মাঝে আপনি এখানে পায়ের ধূলা দিবেন, আমরা আপনার সঙ্গলাভে নৈতিক, মানসিক ও আত্মিক উন্নতিবিধান করিতে পার্ব্ব। এইটুকুও ত' হইতে পারে?

শ্রীশ্রীবাবা লিখিয়াছিলেন,—তাহাতে আপত্তি নাই।

শ্রীশ্রীবাবার এই কথাটুকুতেই উৎসাহিত হইয়া শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দে, কামিনীকুমার দে ও যামিনীকুমার দে একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত এই ভ্রাতৃত্রয় একশত টাকা আশ্রমের পুকুর খননের জন্য দিতে প্রস্তুত হইলেন।

পরদিন শ্রীশ্রীবাবাকে আশ্রমের ভূমি দর্শন করান হইল। বাজারের নিকটবর্ত্তী ভূমি তিনি পছন্দ করিলেন না, কারণ জনকোলাহল সাধনার বিঘ্নকর। এই গ্রামে দুই তিন শত বৎসরের পুরাতন এক শ্মশান আছে, বিলের মাঝখানে একটা পুকুর কাটিয়া চারি পাড় বাঁধান, তত্ত্বাবধানের অভাবে পুকুরটা মজিয়া যাইতেছে এবং শ্মশানভূমির চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী কৃষকদের লাঙ্গলের অনধিকার চর্চ্চায় পাড়গুলি আস্তে আস্তে কৃষিভূমির অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। পূর্ব্ব ও উত্তরে

কতকটা ফাঁকার পরে গ্রাম, দক্ষিণে ও পশ্চিমে এক মাইল দেড় মাইল পর্য্যন্ত কেবলই বিল,—বর্ষাকালে এই বিলে ধান ছাড়া অন্য কোনও ফসল হয় না, শীতে কোথাও কোথাও রবিশস্য হয়, কোথাও পতিত থাকে। শ্রীশ্রীবাবা এই শ্মশানটী পছন্দ করিলেন। কথা হইল, পুকুরটীর পুনঃসংস্কার করিয়া চারি পার বাঁধিয়া তদুপরি আশ্রম হইবে, এক কোণা দিয়া কতকটুকু স্থান শব-সংকারের জন্য পৃথক্ থাকিবে।

ইহার পরে মোচাগড়া ও ভবানীপুর গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্য হইতে প্রায় এক শত টাকা দেখিতে না দেখিতে তুলিয়া ফেলিলেন, নবীন বাবুরাও তাঁহাদের প্রতিশ্রুত এক শত টাকা যখন তখন দিয়া ফেলিলেন। মজুর নিযুক্ত হইল, তাহারা মাটি কাটিতে আরম্ভ করিল। পুপুন্‌কীতে শ্রীশ্রীবাবা কেমন করিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস মোচাগড়ার সমস্ত যুবকবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেবের নেতৃত্বে মোচাগড়া ও ভবানীপুরের দশ বছর বয়স হইতে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের প্রত্যেক বালক, কিশোর ও যুবক মজুরদের সহিত প্রতিযোগিতায় পুকুর কাটিতে আরম্ভ করিল। মুরাদনগর স্কুলের শিক্ষক রহিমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ রায় এবং রহিমপুরের ডাক্তার সুকুমার ঘোষ, সূর্য্যমোহন রায় প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা মাঝে মাঝে স্বগ্রাম হইতে সদলবলে আসিয়া মোচাগড়া-বাসীদের সহিত সম্মিলিত হইয়া পুকুরের মাটি কাটিতে লাগিলেন। এই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাস, পক্ককেশ শ্রীযুক্ত গদাধর দেব ও ভবানীপুরের বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত······ধর পর্য্যন্ত কোদাল ধরিলেন। একদিন ভবানীপুরনিবাসিনী কতিপয় সম্ভ্রান্ত মহিলা আসিয়া শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন যে, তাঁহারাও মাটির বোঝা বহিবার অনুমতি চাহেন। শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া শ্লেটে লিখিলেন,—"ছেলেরা যখন পারবে না, মায়েদের তখন ডাক্‌ব। এখন তোরা প্রাণখুলে ছেলেগুলিকে একবার আশীর্ব্বাদ কর্, এগুলি ঘৃণা, লজ্জা, ভয় ভুলে, হিংসা, দ্বেষ, পরচর্চ্চা ভুলে, মানুষ হোক্। তোদের আশীর্ব্বাদের জোরেই মা সব হবে।"

উভয় গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রাণভরা সহানুভূতির মধ্যে এই ভাবে পুকুর-খনন শেষ হইয়াছে। চতুর্দ্দিকের অগণিত কাঁচা শ্মশান-চুল্লী নূতন মাটির চাপে আত্মগোপন করিয়াছে, আশ্রমকুটীরটাই অন্ততঃ দশটী সদ্যঃ-শ্মশানের উপরে উঠিয়াছে।

সম্বৎসরব্যাপী মৌনব্রত ভঙ্গের পরে এই প্রথম শ্রীশ্রীবাবা মোচাগড়া শ্মশানাশ্রমে শুভাগমন করিলেন। প্রায় অর্দ্ধমাইল দূর হইতে এক শোভাযাত্রা করিয়া গ্রামবাসীরা শ্রীশ্রীবাবাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়াছেন। গ্রামবাসী কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচন্দ্র দেব তদুপলক্ষে একটী সম্বর্দ্ধনা সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন,—

(১)

চাহনি কীর্ত্তি, চাহ নাই যশ,
চাহনি অর্থ, চাহনি মান,
পতিত অধম দেশের লাগিয়া
নীরবে তোমার আত্মদান।
পুপুন্‌কী পাথর করিয়া চূর
উপনীত হ'লে রহিমপুর,
ধন্য আজিকে হ'ল মোচাগড়া
তব করুণায় করিয়া স্নান,
পরহিত তরে নিবেদিত-প্রাণ
স্বরূপানন্দ, হে সুমহান্!

(২)

আপন শক্তি ভুলিয়া রয়েছি
যুগ-যুগ ধ'রে মোহের বশে,
দূর কর সেই তন্দ্রা-আলস
তোমার সজাগ স্নেহ-পরশে,

সজীব তোমার রুদ্র মন্ত্র
করুক শুদ্ধ হৃদয়-যন্ত্র,
তন্ত্রে তন্ত্রে উঠুক বাজিয়া
স্বাবলম্বন-দীপ্ত গান,
আত্মবলের মহা-মহিমায়
নাচুক সবার ক্ষিন্ন প্রাণ।

(৩)

তপস্বি, তব তপ-প্রতিভায়
অন্ধ নয়নে ফুটুক দৃষ্টি,
সাহারা মরুর উষরের বুকে
ফুটুক নবীন সবুজ সৃষ্টি.
পঙ্কের মাঝে শত শতদল
অরুণ-কিরণে করি' ঝলমল
ব্যথিত বুকের ঘুচাক বেদনা
সান্ত্বনা সুধা করায়ে পান,
চির-পশ্চাৎ-গামী দুর্ব্বলে
করাক কর্ম্মে অগ্রবান্।
চাহনি কীর্ত্তি, চাহ নাই যশ,
চাহনি অর্থ, চাহনি মান,
পতিত অধম দেশের লাগিয়া
নীরবে তোমার আত্মদান ॥

ভগবানের জাত-বিচার

প্রাথমিক প্রণাম, আশীর্ব্বাদ ও কুশল প্রশ্নাদি হইয়া গেলে শ্রীশ্রীবাবা ভগবৎ-কথা কহিতে লাগিলেন। কুটীরের বাহিরে একখানা তক্তপোষের উপরে আসনে শ্রীশ্রীবাবা উপবেশন করিলেন, ভূমিতলে বিস্তারিত আসনে সঙ্গীয়

ভক্ত-মণ্ডলী এবং গ্রামবাসী অভ্যর্থনাকারী হিন্দুমুসলমানবৃন্দ উপবেশন করিলেন। দূরাগত একটী মুসলমান শ্রীশ্রীবাবাকে দর্শনমাত্র অনবার অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে এবং নানাভাবে প্রাণের আবেগ জানাইতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবানের জাত বিচার নেই। তিনি সকল জাতির নিকট, সকল জাতির আপন। ছোট বড় সবাই তাঁর স্নেহের কোলে ঠাঁই পায়। যে তাঁকে চায়, সেই তাঁকে পায়। এমন কি, যে তাঁকে চায় না, পরম দয়াল হরি তাঁ'কেও কোলে তু'লে নেন। আস্তিক, নাস্তিক, বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, তিনি সকলের জন্য,—ব্রহ্মাণ্ডের একটী ক্ষুদ্র তৃণকেও তিনি উপেক্ষা করেন না, অগ্রাহ্য করেন না।

"ব'সে তাঁর রাজ-আসনে
দৃষ্টি রাখে তিন-ভুবনে,
ক্ষুধায় অন্ন, দুঃখে শান্তি
বিলায় সর্ব্বজনে,
বুক জোড়া তাঁর স্নেহের খনি
শান্তি ঢালা প্রাণে;
দেখ্‌লে কারো বিরস বদন
বুকের 'পরে টেনে আনে।"*

ভগবান্‌কে ডাকিবার পন্থা

একজন প্রশ্ন করিলেন,—ভগবান্‌কে কিভাবে ডাক্‌তে হয়?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তাঁকে ডাক্‌তে হয়, অবিরাম, অবিশ্রান্ত, অহর্নিশ, খেতে, বস্‌তে, উঠ্‌তে, চল্‌তে, সর্ব্বদা, সর্ব্বাবস্থায় তাঁর মধুময় নাম স্মরণ কর্ত্তে হয়। প্রত্যেকবার নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস কর্ত্তে হবে, নামের প্রভাবে দেহের প্রত্যেকটী অণুপরমাণু শুদ্ধতা লাভ কচ্ছে, পবিত্র হচ্ছে। প্রত্যেকবার নাম-স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে অনুভব কর্ত্তে চেষ্টা কর্ব্বে, যেন মনের ময়লা কেটে যাচ্ছে, অন্তশ্চক্ষের পরদা স'রে যাচ্ছে, যুগযুগান্তরের সঞ্চিত কামনা বাসনা প্রলয়-

* গানটির রচয়িতা পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

পবনে উড়ে যাচ্ছে, দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত পাপ-লালসা নামের বন্যা-তাড়নে বিধ্বস্ত হচ্ছে।

অভ্যাসের ধারা

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—একদিনে অবশ্য এ রকম অনুভূতি হয় না। ক্রমশঃ অভ্যাসের দ্বারা হয়। প্রথম প্রথম নাম শুষ্কই ত মনে হবে। নামের শক্তিতে দেহের উপরে বা মনের উপরে যে কোনও পবিত্রতার বা মাধুর্য্যের প্রভাব বিস্তারিত হচ্ছে, তা' প্রথম প্রথম কিছুই টের পাওয়া যায় না। কিন্তু শক্ত ক'রে খুঁটি ধ'রে নামের সাধন কত্তে কত্তে ক্রমশঃ এ সব হয়। দেহ পবিত্র কি অপবিত্র থাকুক, কিছু যায় আসে না। নামের বলে যে পবিত্রতা আস্‌বেই, এরূপ চিন্তা খানিকটা ক'রে নিয়ে জোর্‌সে নাম চালাতে থাক্‌বে। মন স্থির কি অস্থির, তাও বিচারের প্রয়োজন নেই। নাম কত্তে কত্তে মন যে আপনি স্থির হ'য়ে যাবেই যাবে, কতকক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ একটু চিন্তা ক'রে নিয়ে নামে লেগে যাবে। নামে তোমার বিশ্বাস আছে কি নেই, সেই বিষয় নিয়েও বেশী মাথা ঘামাবে না। খানিকক্ষণ চিন্তা কর যে, নাম কত্তে কত্তেই নামের মধ্যে বিশ্বাস আস্‌বে, নামের সেবায় লেগে থাক্‌লে আপনি নামের মহিমা প্রকাশ পাবে,—তারপরে নামের সমুদ্রে ডুব দাও। ডুবের বিদ্যা যারা ভাল মত আয়ত্ত করেনি, প্রথম প্রথম তাদের কষ্ট বোধ হয়, অরুচি বোধ হয়, সমুদ্রের রত্নের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার আগেই খানিকটা লোণা জল পেটের ভিতর ঢুকে গিয়ে বমন-ভাব সৃষ্টি কত্তে চায়। কিন্তু তাই ব'লে অভ্যাস ছেড়ে দিও না। যতই অরুচিকর বোধ হবে, ততই বেশী ক'রে নাম কত্তে চেষ্টা কর্‌বে। এইটীই হচ্ছে অভ্যাসের ধারা।

নামের সেবাই তাঁর সেবা

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—ভগবানের নামের মহিমা উদার আকাশের ন্যায় বিরাট, বিশাল জলধির ন্যায় গভীর। ভগবানে আর তাঁর নামে কোনো তফাৎ নেই। নামই তিনি, তিনিই তাঁর নাম। তাঁর নামকে পূজা করা আর তাঁকে পূজা করা এক কথা। তাঁর নামকে স্মরণ করা আর তাঁকে স্মরণ করা

এক কথা। তাঁর নামকে ভালবাসা আর তাঁকে ভালবাসা এক কথা। তাঁর নামের সেবায় আত্মসমর্পণ করা আর তাঁর সেবায় আত্মসমর্পণ করা এক কথা। নামকে হেলা করা আর তাঁকে হেলা করা এক কথা। নামের নিন্দা করা আর তাঁর নিন্দা করা এক কথা। যেখানে তাঁর নামের অপযশ-কথন হয়, সেস্থান ত্যাগ কর্ব্বে। যেথানে নামের মহিমা কীর্ত্তন হয়, সেখানে সানন্দে বাস কর্ব্বে এবং প্রাণ ভ'রে নামের সেবা কর্ব্বে।

নামের মহিমা

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বাস্তবিকই নামের মহিমা অফুরন্ত। শত জন্ম ব'সে বর্ণন কর্লেও আমি নামের মহিমা ব'লে শেষ কত্তে পার্ব্ব না। নাম জ্ঞাননেত্র ফুটিয়ে দেয়, জ্ঞান-শ্রোত্র খুলে দেয়, অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব-রাজ্যের প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত করে, দিব্য রসানুভূতিকে জাগ্রত করে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মতা ও সার্থকতা সম্পাদন করে। সাধন ক'রে দেখ, প্রত্যেকটী কথার অভ্রান্ততা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে।

অসাধিকার আশ্রম-বাস

শ্রীযুক্ত গদাধর দেব মহাশয়ের বাড়ীতে শতাধিক লোকের রন্ধনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সকলে যখন প্রসাদ পাইতে ব্যস্ত, তখন ত্রিপুরা জেলার কোনও আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মী নিভৃতে শ্রীশ্রীবাবার নিকট কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন।

প্রশ্ন।—বর্ত্তমানে আমার আশ্রমে শুধু ছেলেরাই আছে। আশ্রমের আদর্শকে পূর্ণভাবে রক্ষা ক'রে আমি কিরূপে সস্ত্রীক আশ্রমের কাজে আত্ম-নিয়োগ কত্তে পারি, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিন।

শ্রীশ্রীবাবা।—যতকাল তোমার স্ত্রী সাধিকা না হচ্ছেন, তপঃপরায়ণা না হচ্ছেন, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কোচ ও সঙ্কীর্ণতা বিসর্জ্জন দিয়ে যতক্ষণ না ভগবানে আত্ম-সমর্পণের জন্য ব্যাকুল হচ্ছেন, ততকাল পর্য্যন্ত পুরুষদের সহিত অবাধ সংমিশ্রণে আশ্রম-মধ্যে বাস করার তাঁর অধিকার থাকা উচিত নয়। সাধন যার অবলম্বন, তাঁকে আমি সর্ব্বাবস্থায় স্বাধীনতা দিতে রাজি; কারণ সাধনের বল একদিকে

যেমন তাঁকে নীচতার ঊর্দ্ধে রাখ্‌তে চেষ্টা করবে, অন্য দিকে অপরের নীচতাও তাঁর সাধন-শক্তির দুয়ারে এসে আপনি ধ্বংস হবে।

মোচাগড়া আশ্রম
৮ই বৈশাখ, ১৩৩৮

শুভস্য শীঘ্রং

শেষ রাত্রে আশ্রমে কতকক্ষণ নামকীর্ত্তন হইল,—হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওঁ, হরি ওম্‌।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,—শুভস্য শীঘ্রং,—শুভ কাজে হেলা কর্ব্বে না, যত দ্রুত পার, সম্পাদন কর্ব্বে। মনের মধ্যে প্রতিনিয়তই কত পাপ আর পুণ্য চিন্তা জাগ্‌ছে, সবগুলি আকাঙ্ক্ষার পূরণ কখনো একটা জীবনে সম্ভব নয়। অতএব শুভ চিন্তা জাগ্রত হওয়া মাত্র তাকে কার্য্যে পরিণত কর্ত্তে চেষ্টা কর্ব্বে। কখন কে ম'রে যায়, তার কোনো ঠিক নেই। কখন যে কাকে তা'র শেষ নিশ্বাসটী ফেল্‌তে হবে, কেউ জানে না। সুতরাং পুণ্যজনক কার্য্যগুলিকে সম্পাদন করার জন্য খুব উৎসাহ চাই, খুব উদ্যম চাই। ভাল কাজগুলি শেষ ক'রে যদি অবসর পাই, তবে মন্দ কাজগুলি করবার চেষ্টা বরং দেখা যাবে। একটী ভাল কাজ আর একটি মন্দ কাজ এক সঙ্গে যদি এসে তোমার সেবা চায়, তবে আগে ভাল কাজটিতে হাত দেবে।

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—শুভকাজও যদি অনেকগুলি এক সঙ্গে এসে হাজির হয়, তবে তার মধ্যেও একটা বাছট দিতে হবে, একটিকে পৃথক্‌ ক'রে নিয়ে নিতে হবে। মনের অবস্থানুসারে যখন যেটিকে শ্রেষ্ঠ শুভকাজ ব'লে বোধ হবে, তখন একমাত্র সেইটিকে রেখে বাকীগুলিকে বিদায় দেবে।

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—এখন তোমাদের কার কি কাজ কর্ত্তে ইচ্ছে হচ্ছে?

উত্তর হইল,—ইচ্ছে ত' হচ্ছে অনেকই, যেমন, এখনি গিয়ে বিছানায় আর একবার পড়া।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এটি অশুভ ইচ্ছা। সুতরাং "কালহরণং" হবে এর

ব্যবস্থা। ভোর সময়েই এ ইচ্ছা পূরণ না ক'রে রাত্রি নয়টায় এ ইচ্ছাটা পূরণ কর্বে,—অবশিষ্ট নয়টা পর্য্যন্ত যদি বেঁচে থাক।

সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

অতঃপর আশ্রমের জলাশয় খননে সকলে মিলিয়া প্রবৃত্ত হইলেন।

সংসারে থাকিয়াও ভগবল্লাভ সম্ভব

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে শ্রীশ্রীবাবা আশ্রমে বসিয়া আছেন। ভবানীপুর গ্রাম নিবাসিনী কতিপয় মহিলা শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্ম দর্শনে সমাগতা হইলেন। উপদেশ-প্রার্থিনী হইলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সংসারে থেকেও ভগবানের চিন্তা করা যায়,—সনাতন কাল থেকে লক্ষ লক্ষ নরনারী তা' ক'রেছেন, ভবিষ্যতেও কর্বেন। এই কথাটি আগে বিশ্বাস কর মা। সংসার না ছাড়্লে ভগবানকে পাওয়া যায় না, তা' নয়। সংসারের মধ্যেও তিনি নিত্যকাল বিরাজ কচ্ছেন। এ সংসার কি তুমি রচনা করেছ? তুমি জন্মাবার অনেক আগে থেকেই তোমার জন্য সংসার রচিত হ'য়ে রয়েছে। ভগবান রচনা করেছেন। তিনি যা' করেছেন, তাতে কখনো ভুল-ভ্রান্তি থাক্‌তে পারে না। এই সংসারের মধ্যে থেকেই ভগবানকে লাভ কত্তে চেষ্টা কর, অসার সংসারকে সারবস্তু লাভের উপায়রূপে ব্যবহার কর। সংসারের প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে, প্রত্যেক কর্ত্তব্যের মধ্যে ভগবানের ইচ্ছাকে দর্শন কত্তে চেষ্টা কর। পুত্র, কন্যা, স্বামী, শ্বশুর, ভ্রাতা, ভগ্নী, দাস, দাসী প্রত্যেকের মুখমণ্ডলে শ্রীভগবানের রূপ চিন্তা ক'রে প্রত্যেককে ভগবানের বিভূতি ব'লে জ্ঞান ক'রে যার প্রতি যা কর্ত্তব্য অনাসক্ত চিত্তে ক'রে যাও। ভগবানকে পাবার জন্য ছুটে তোমাদের বাইরে যেতে হবে না; ভগবানের জন্য ব্যগ্র হও, প্রতি বস্তুতে ভগবানকে দর্শন কত্তে চেষ্টা কর, ভগবান্ নিজে ছুটে আস্‌বেন তোমাদিগকে দেখা দিতে। ত্যাগী সংসার ছেড়ে ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ ক'রে তাঁকে খুঁজে বার করে, আর সাধক-গৃহস্থকে দেখা দেবার জন্য ভগবান্ নিজে ছুটে তার ঘরে আসেন।

হঠাৎ গুরু করিতে নাই

কোনও কোনও মহিলা দীক্ষাপ্রার্থিনী হইলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেন মা, তোমাদের কুলগুরুই ত' আছেন।

একটী মহিলা বলিলেন,—কুলগুরুরা সাধন-ভজন কিছু করেন না, এজন্য এবং অন্যান্য কারণে তাঁদের উপরে শ্রদ্ধা হয় না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তাই ব'লে যাকে জান না, চেন না, এমন লোকের কাছে দীক্ষা নেবে ? আমার মতে তা' কখনো উচিত নয়। শাস্ত্রে আছে, এক বৎসর কাল পরীক্ষা ক'রে তবে কাউকে গুরু করা উচিত। আজ যাকে গুরু করেছ, কাল যদি দেখা যায়, তাঁর আদেশ পালন তোমার পক্ষে অসম্ভব বা অনুচিত, তখন উপায়টা হবে কি ? গুরু করার মানে তাঁর আদেশ পালনের জন্য প্রাণদানে প্রস্তুত হওয়া। ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংশ হ'য়ে গেলেও গুরুর বাক্য লঙ্ঘন করা চল্‌বে না। এইজন্যই হঠাৎ গুরু কত্তে নেই। দীক্ষা নিতে হয় মা, ভাবনা কি ? অনেক সুযোগ পাবে।

"গুরু-পরীক্ষা" কথাটার প্রকৃত অর্থ

একটী বর্ষীয়সী মহিলা মহাত্মা ভোলানন্দ গিরি মহারাজের শিষ্যা। তিনি বিনীত ভাবে বলিলেন,—না বাবা, সদ্‌গুরুলাভ সব সময়ে হয় না, সকলের হয় না। আর, শিষ্যের এমন ক্ষমতা কখনো হয় না যে, গুরু-পরীক্ষা ক'রে তাঁর মহত্ত্ব বিচার কত্তে পারে। অতএব, সুযোগ পাওয়ামাত্রই সদ্‌গুরু কৃপা গ্রহণ কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীবাবা অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—হাঁ বেটি, ঠিক্ কথাই বলেছিস্। সমতলের লোক পর্ব্বতশৃঙ্গের উচ্চতা বিচার কত্তে পারে না। কিন্তু তবু গুরু-পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। এঁকে আমি গুরু কর্ব্ব কি না, এঁর বাক্যকে বেদবাক্য ব'লে গ্রহণ কর্ব্ব কি না, এ বিষয় দিনের পর দিন চিন্তা কত্তে কত্তে গুরুর অবিরত ধ্যান চল্‌তে থাকে। যাদের গুরুভাগ্য প্রবল, এই ধ্যানের ফলে তাদের ভিতরে আত্মসমর্পণ-বুদ্ধি এসে যায়। গুরুকে কি আর পরীক্ষা করা হয় ? গুরু-পরীক্ষার নাম ক'রে প্রকৃত প্রস্তাবে শিষ্যের আত্মপরীক্ষাই চল্‌তে

থাকে। গুরু কত বড়, সে কথার মীমাংসা অসম্ভব। কিন্তু আমি নির্ব্বিচারে তাঁর আদেশ পালন কর্ব্ব কি না, কত্তে পার্‌ব কি না, তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ কত্তে বল্লে হাসিমুখে তা' কত্তে চাইব কি না, তাঁর আশীষ লাভ কর্লে বজ্রাঘাতকেও মাথা পেতে নিতে পার্‌ব কি না,—এই আত্মবিচারই গুরু-পরীক্ষার উপলক্ষে চল্‌তে থাকে। যখন শিষ্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে গুরুর প্রতি অনুরক্ত ব'লে অনুভব করে, তখন গুরু সিদ্ধপুরুষ কি সামান্য ব্যক্তি, সে প্রশ্নই তার মনে আর আসে না।

স্ত্রীলোকের দীক্ষা

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—এ ত' গেল এক দিকের কথা। আরো একদিকের কথা আছে। তোমরা ত' মা স্ত্রীলোক। স্বামীর সাহচর্য্য ছাড়া স্ত্রীলোকের দীক্ষা হ'তে পারে না। স্বামী ও স্ত্রী এক সঙ্গে মিলে ভগবানের পথে চল্‌বে, এটাই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয়।

দীক্ষাপ্রার্থিনীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া বর্ষীয়সী মহিলাটী বলিলেন,—কিন্তু বাবা, স্বামীর যদি ধর্ম্ম-কর্ম্মে রুচি না থাকে, তিনি যদি দীক্ষা নিতে ইচ্ছুক না হন, এ অবস্থায় স্ত্রী কি সাধন-ভজন কর্ব্বে না, দীক্ষা নেবে না ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দীক্ষা নেবে, কিন্তু স্বামীর অনুমতি নিয়ে।

বর্ষীয়সী মহিলা,—স্বামী যদি কিছুতেই অনুমতি না দেন, তিনি যদি দেব-দ্বিজ-বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর মত হন ? তা'হ'লে ?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—তাহ'লে হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী কয়াধূর মতন স্বামীকে না জানিয়েই ভগবান্‌কে ডাক্‌তে হবে, স্বামীর অনুমতির অপেক্ষা না ক'রেই সদ্‌গুরুর আশ্রয় নিতে হবে।

সদ্‌গুরুর অহেতুকী কৃপা

মহিলাবর্গ প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলে, গ্রামবাসী কতিপয় ব্যক্তি কুটীরে প্রবেশ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে দুই একজন ভিন্নগ্রামবাসীও আছেন। কেহ কেহ অনেকক্ষণ আগেই আশ্রমে আসিয়াছেন, মহিলাদের ভিড় দেখিয়া কুটীরে প্রবেশ করেন নাই, বাহিরে দাঁড়াইয়াই কথাবার্ত্তা শুনিয়াছেন। কামাল্লা-

নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা মহারাজ, কিছুক্ষণ আগে আপনি বল্‌ছিলেন, শাস্ত্রে আছে এক বৎসরকাল গুরু-পরীক্ষা দরকার।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শাস্ত্রে আরো আছে যে, এক বৎসরকাল শিষ্যকেও পরীক্ষা কত্তে হবে, তারপরে দীক্ষা দেবে।

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—অথচ প্রায়ই আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি, এক একজন মহাপুরুষ এক এক সময়ে এসে দলে দলে নরনারীকে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে দীক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন। এর কারণ কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এর কারণ তাঁদের অহেতুকী কৃপা। শিষ্য-পরীক্ষার জন্য তাঁদের এক বৎসর অপেক্ষা কত্তে হয় না, সূক্ষ্মদৃষ্টির বলে তাঁরা শিষ্যের ভিতরের সব সংস্কার, গঠন ও উপাদান কটাক্ষের মধ্যেই বুঝে ফেলেন। তবে কোনো কোনো শিষ্যের ভিতরে এই সম্পর্কে একটু দুর্ব্বলতাও থেকে যায়। সেটা হচ্ছে গুরুর বিষয়ে বিশেষ কিছু জানাশুনা না থাকাতে, দু'চার দিন সাধনের পরেই নানা রকম খট্‌কা এসে চিত্তকে পীড়িত ও সংশয়ক্লিষ্ট কত্তে থাকে। এর ফলে অনেক সময় সে জ্ঞানোপদেশ আহরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে মিশে ধর্ম্মমত ও সাধন-ভজনের একটা খিচুরী পাকিয়ে বসে।

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—সদ্‌গুরু কি এই বিপদ থেকে শিষ্যকে রক্ষা কত্তে পারেন না?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিশ্চয়ই পারেন এবং রক্ষা করেনও। কিন্তু ব্যাপারটা কি রকম হয় জানো? যেমন কোনো কোনো মুসলমান নারী স্বামীর কাছ থেকে তালাক্ পেয়ে কতকদিন আর একজন পুরুষের সঙ্গ করার পরে পূর্ব্ব স্বামীকে ফিরে গ্রহণ করে। সদ্‌গুরুর শিষ্যেরাও নানা ঘাটের জল খেয়ে শেষে ঐ আদি-গুরুর পায়ের তলায়ই ফিরে আসেন। তার চেয়ে আমি বলি, অত ঝঞ্ঝাটের কাজ কি; মহাপুরুষরা কৃপা বিলাচ্ছেন, ভাল কথা, তাঁর উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর তুমি কর্‌বে কি না, কিম্বা স্বামীর গূঢ় কথা উপপতির কাছে গিয়ে বল্‌বার দরকার পড়্‌বে, সেইটি বেশ ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে নিয়ে তারপরে তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে হয় ত' নাও।

উন্মার্গগামী শিষ্যের গুরু হওয়ার ক্লেশ

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—অনেকে ভাবে, গুরু দীক্ষা দিয়েই বুঝি খালাস। অনেকে মনে করে, দীক্ষাদানকালেই গুরু তাঁর যা কিছু দেবার সবই শিষ্যকে দিয়ে দিলেন, শিষ্যের জন্য আর কিছু তাঁর দেবারও নেই, ভাববারও নেই। সত্য বটে, দীক্ষাদানকালে গুরুর পুঞ্জীভূত আধ্যাত্মিক শক্তি ইষ্টনামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সুকৌশলে শিষ্যের ভিতরে প্রবেশ করে, কিন্তু শিষ্যের মঙ্গলামঙ্গল তিনি অহর্নিশ প্রত্যক্ষ কচ্ছেন। বিপথগামী শিষ্যের জন্য তাঁর উদ্বেগের অবধি নেই, মনোবেদনার অন্ত নেই। মনোধর্ম্মের অতীত হ'য়েও তিনি নিয়ত শিষ্যকে নিত্যকল্যাণের পথে ফিরিয়ে আন্‌বার জন্য ব্যাকুল। কত গুরু শিষ্যকে বিপথ থেকে ফিরিয়ে আন্‌বার জন্য কেঁদে বুক ভাসিয়েছেন, তা' তোমরা জানো? কত গুরু শিষ্যের জীবন থেকে উচ্ছৃঙ্খলতার কালিমা দূর করার আবেগে পথে পথে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন, তা' জানো? কত গুরু শিষ্যের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাগুলিকে ধ্বংসোন্মুখ দেখে শোকে হৃৎপিণ্ড চিরে শোণিতোদ্গীরণ করেছেন, তা' জান? উন্মার্গগামী শিষ্যের জন্য গুরুকে আহার ভুলতে হয়, নিদ্রা ত্যাগ কত্তে হয়। বাবা হে, শিষ্য হওয়াও সহজ নয়, গুরু হওয়াও বড় সামান্য কথা নয়।

বৈকাল হইয়া আসিলে শ্রীশ্রীবাবা স্বহস্তে কোদাল ধরিয়া পুকুরে নামিলেন। দেখিতে দেখিতে কাশীপুর, করিমপুর, মোচাগড়া, ভবানীপুর, সেলিমপুর ও যাত্রাপুর নিবাসী সকল যুবক ও ভদ্রবৃন্দ পুকুর খননের কাজে লাগিয়া গেলেন।

রহিমপুর আশ্রম

৯ই বৈশাখ, ১৩৩৮

বাল-বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষা

রাত্রি থাকিতেই ধ্যানজপাদি শেষ করিয়া শ্রীশ্রীবাবা রহিমপুর ফিরিয়া আসিয়াছেন। রহিমপুর আশ্রমে একটি বাল-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, গ্রামের বালক ও বালিকারা তাহাতে বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ

করিতেছে। ২৪ পরগণা জেলা-নিবাসী জনৈক কর্ম্মী শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দান করিতেছেন।

আজ শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ছেলেমেয়েদের প্রত্যেককে একটু একটু বাগানের কাজ কত্তে হবে।

কর্ম্মী সংশয় জানাইলেন যে, তাহা হইলে অভিভাবকগণ আপত্তি তুলিবেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তা কিছু আশ্চর্য্য নয়। শ্রমের মর্য্যাদা সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালের অভিভাবকদের কোনও শিক্ষা বা অনুশীলন নেই। এমতাবস্থায় তাঁদের ছেলেপিলেরা আশ্রমের বাগানে পরিশ্রম কত্তে গেলে নানা কথা উঠ্‌তেই পারে। কিন্তু বুঝিয়ে বল্লে ক্রমে সকলের মন নরম হ'য়ে আস্‌বে। আর, এ কয় মাস ধ'রে গ্রামের বয়স্ক ছেলেরা আস্তে আস্তে আশ্রমের জন্য যথেষ্ট শ্রম করেছে। তাতে আবহাওয়া অনেকটা বদ্‌লেছে। এখন বাল-বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা কাজ আরম্ভ কল্লে তেমন প্রবল প্রতিবাদ হয়ত উঠ্‌বে না।

কর্ম্মী বলিলেন,—ছেলেদের নিয়ে প্রতিবাদ না উঠ্‌লেও মেয়েদের নিয়ে উঠ্‌বে। আর, মেয়েরা বাগানের কাজ না কল্লেই বা ক্ষতি কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—খুব ক্ষতি। আমার পিতামহীকে দেখেছি, বাড়ীর যেখানে যে ভূমিটুকু খালি পেয়েছেন, তাতেই লাউ, কুমড়া, শশা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি নানা রকম তরিতরকারী সারা বছর জু'ড়েই কত্তেন। তাতে সংসারের যথেষ্ট আয় হ'ত। অবশ্য পিতামহের ওকালতির পসার তখন মস্ত বড়, হাজার টাকার নীচে তিনি কোনো মাসেই উপার্জ্জন কত্তেন না, তাই পিতামহীর গৃহ-কৃষির আয়ে কিছু যেত আস্‌ত না। কিন্তু তার চেয়েও বড় আয় হয়েছে অন্য ভাবে। পিতামহী একটি বীজ পুঁততেন, অঙ্কুরোদ্গমের পর থেকে তার পেছনে আমার বাবা, জ্যেঠা, খুড়ো সবাইকে খাটতে হ'ত। আমরা যখন জন্মালাম এবং বড় হলাম, তখন পিতামহীর বাগানে আমাদেরও প্রত্যেককে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় খাটতে হয়েছে। পিতামহীর বাগানের সখকে অবলম্বন ক'রে যে শ্রম-শীলতা আমার পিতাতে এবং তারপরে আমাতে সংক্রামিত হ'য়েছিল, পুপুন্‌কী আর রহিমপুর তারই ফল। আমার ত' দৃঢ় অভিমত এই যে,

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে কৃষি-বিভাগ রাখ্‌তেই হবে, তা'তে প্রত্যেককে খাটতেই হবে।

দৃষ্টান্তের শক্তি

বর্ত্তমান সময়ে গ্রীষ্মের আতিশয্য-হেতু মুরাদনগর হাই-স্কুল প্রাতে বসে, দশটায় ছুটি হয়। ছুটির পরে ঐ প্রখর রৌদ্রেই গ্রামের চারি পাঁচটি উৎসাহী যুবক রহিমপুর আশ্রমের পুকুর কাটিতে আসেন। মোচাগড়া আশ্রমের পুকুর কর্ত্তার দৃষ্টান্ত রহিমপুরের যুবকগণকে উৎসাহিত করিয়াছে। কোনও যুবক কাজ করিতে আসিলে শ্রীশ্রীবাবা এই প্রখর রৌদ্রের মধ্যেই মাথায় গামোছা বাঁধিয়া তাহাদের সহিত কর্ম্মে রত হন। আজ পুকুরের মধ্যে একটা মাটির বাঁধ দেওয়া হইতেছে। উদ্দেশ্য, এই বাঁধের দক্ষিণে পুকুরের জল সিচিয়া ফেলিয়া উত্তর দিকের অংশের মাটি গভীর করিয়া কাটা হইবে। শ্রীশ্রীবাবা নিজেও ছেলেদের সঙ্গে কাদা ঘাটিতে নামিয়াছেন।

আশ্রমের লাগ পূর্ব্বে একটী মস্‌জেদ্ আছে। মস্‌জেদের স্থাপয়িতা শ্রীযুক্ত জৈনুদ্দিন হাজী জিজ্ঞাসা করিলেন,—কর্ত্তা, আপনার শিষ্যেরা থাকিতে আপনি কেন কাদার মধ্যে নামিয়াছেন। আপনি ছায়ায় বসিয়া বসিয়া হুকুম দিন, ইহারাই তদনুসারে সব করিবে।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—আমি ছায়ায় বস্‌লে এদের একজনও রৌদ্রে আস্‌ত না, আমি উপরে থাক্‌লে এদের একজনও কাদায় নাব্‌ত না। দৃষ্টান্তের একটা শক্তি আছে।

হাজি সাহেব বলিলেন,—তাই বলিয়া শত সহস্র লোকের পূজিত একজন পীরের পক্ষে এসব কাজ শোভা পায় না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মুস্তাফা হজরৎ মহম্মদের জীবনী ত' জানেন? খাট-পালঙ্ক অগ্রাহ্য ক'রে তিনি সামান্য মাদুরে ঘুমাতেন। বিলাসিতার কামনা পায়ে ঠেলে ফেলে তিনি কুলী-মজুরের মত পরিশ্রম কত্তেন, জাঁতায় গম পিষ্‌তেন। সদুদ্দেশ্যে কর্‌লে, জগতের কোনো কাজই অসম্মানের নয়।

মায়ের জাতের কাছে শিশুর মত হও

এই সময়ে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কিরণবালা দেবী বাড়ী হইতে কতকগুলি ফলমূল নিয়া আসিয়া পুকুর পারে দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীবাবাকে ডাকিতে লাগিলেন। কিরণের বয়স চৌদ্দ পনের হইবে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কুটীরে রেখে যা।

কিরণ বলিলেন,—না, তা' হবে না, আপনাকে এখনি উঠে আস্‌তে হবে। বাড়ীশুদ্ধ সবাই প্রসাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে।

শ্রীশ্রীবাবা পুকুর হইতে উঠিলেন। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে কাদা। এত কাদা ধুইতে ধুইতে অনেক সময় চলিয়া যাইবে। অতএব শ্রীশ্রীবাবা শিশুর মত "হাঁ" করিলেন। কিরণ শ্রীশ্রীবাবার মুখে খাবার দিতে গিয়া অসতর্কতা বশতঃ বাবার গালে, গলায়, বুকে খাবার ফেলিলেন। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই রে, দেখ্ সর্ব্বনাশী বেটী কি কর্‌লে।

কিরণ বলিলেন,—নিজে যে দুষ্টুমি কচ্ছেন, তাতে কোনো দোষ নেই।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আচ্ছা বেশ, আর দুষ্টুমি কর্‌ব না। বলিয়াই তিনি ঘাসের উপরে চিৎ হইয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং খাদ্য গ্রহণের জন্য মুখব্যাদান করিলেন। কিরণবালা তাঁর তৃপ্তিমত খাদ্য শ্রীশ্রীবাবাকে খাওয়াইলে শ্রীশ্রীবাবা এক লম্ফ দিয়া উঠিয়াই—"জয় বিশ্বনাথ" বলিয়া এক হুঙ্কার ছাড়িলেন এবং পুকুরের মধ্যে ছেলেদের সঙ্গে কাদা ঘাটিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবার ছেলেমানুষী দেখিয়া সকল ছেলেরা হাসিয়া উঠিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আরে, মায়েদের কাছে ছোট্ট ছেলেটীর মতই হ'তে হয়। নইলে সর্ব্বনাশীর বেটী কার ঘাড়ে যে খড়্গ ফেলে, তার কোনো ঠিক্ নেই।

শুদ্ধ মনের প্রভাব

দুপুরের পরটাতে গ্রামের অনেক ছেলেই আশ্রমে আসেন। শ্রীশ্রীবাবার মৌনভঙ্গের পর হইতে তিনি ছেলেদের একটা পরমাকর্ষণের বস্তু হইয়াছেন। কথা শুনিবার দুর্নিবার লোভে দুই একজন তাস-রসিক তাসের আড্ডা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই বিষয়ে কোনও উপদেশ দেওয়া হয় নাই,

আপনা-আপনিই যুবক-সমাজের মধ্যে পরিবর্ত্তন আসিতেছে। এই স্থলে একথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, শ্রীশ্রীবাবা যখন যেখানে গিয়াছেন এবং দুই চারিদিন অবস্থান করিয়াছেন, সেখানে তখন আপনা-আপনি চতুর্দ্দিকের যুবকদের মনে ভাবের পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। এমন কি কোথাও কোথাও প্রৌঢ়দের ভিতরে পর্য্যন্ত ভাবান্তর পরিলক্ষিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা বাঘাউড়া গেলেন, চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মচর্য্য-পালন ও সংযম-সাধনের একটা প্রবল অনুশীলন আরম্ভ হইয়া গেল। শ্রীশ্রীবাবা রুদ্রাক্ষবাড়ী গেলেন, গ্রামের যুবকেরা দেখিতে না দেখিতে বিনা উপদেশে ধূমপান পরিত্যাগ করিল, কিছুদিন পরে সংবাদপত্রে রুদ্রাক্ষবাড়ীর যুবকদের সমবেতভাবে ধূমপান পরিত্যাগের বিষয় শ্রীশ্রীবাবা জানিতে পারিলেন। শ্রীশ্রীবাবা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন,—"চিন্তার শক্তিই শক্তি, চিন্তার দ্বারাই জগৎ পরিচালিত হইতেছে।" শ্রীশ্রীবাবার একথার সত্যতা রহিমপুরেও কিছু কিছু উপলব্ধ হইতেছে। শ্রীশ্রীবাবার শ্রীমুখে আমরা একথাও বহুবার শুনিয়াছি,—"যে আধার যত শুদ্ধ, শুদ্ধচেতার চিন্তার শুভশক্তি সেই আধারে তত দ্রুত কাজ করে, তত অধিক কাজ করে, তত স্থায়ী কাজ করে।"

যৌবনই সাধনের উপযুক্ত কাল

উপস্থিত যুবকদের মধ্যে একজনকে শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে উপাসনা করে কি না।

ছেলেটী বলিল,—এখন ধ্যান জপ ক'রে কি হবে, আগে বুড়ো হই, তৎপরে ভগবান্‌কে ডাকব।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দূর বোকা! সর্ব্বেন্দ্রিয় যখন হবে দুর্ব্বল, অক্ষম, অপটু, তখন তুই কর্‌বি সাধন? পুকুরে মাটি কাট্‌বার সময়ে প্রত্যেকেই নূতন কোদালখানাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করিস্ কেন রে? পুরোণো, জঙ্কার-পরা ভাঙ্গা কোদালে কাজ চলে না? বৃদ্ধ হ'লে এই দেহটাও সেই মরিচা-ধরা কোদালের মতই নিতান্ত অপদার্থ হ'য়ে পড়ে। তখন এটাকে দিয়ে কোনো ভাল কাজ, কোনো মহৎ কাজ আর ক'রে ওঠা যায় না। আজ পায়ে বাতের

ব্যথা, কাল কোমরের বেদনা, পরশু শিরঃপীড়া, তরশু জ্বর-জ্বর ভাব,—রোজই এই রকম একটা না একটা উৎপাত লেগেই থাকে। ভাঙ্গা নৌকাতে মেঘনা (ত্রিপুরা জেলার বৃহত্তম নদী) পার হ'তে যেমন ভয়, ভাঙ্গা দেহ নিয়ে ভব-সমুদ্র পাড়ি দিতেও বাবা তেমন ভয়। বিশ্বাস নেই কখন অতল তলে ডুবে যায়। তারই জন্য আট বছর বয়সে উপনয়নের ব্যবস্থা। অর্থাৎ যে সব বংশে ধর্ম্মানুশীলন ও শাস্ত্রচর্চ্চা পুরুষানুক্রমিক ভাবে চ'লে আস্‌ছে, তাদের ঘরের ছেলেকে আট বছর বয়সেই ব্রহ্মসাধনায় রত কত্তে হবে। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ধর্ম্মদর্শনাদির চর্চ্চা কিছু কম ছিল, তাই তাদের বংশের ছেলেদের আর একটু বেশী বয়সে উপনয়ন অর্থাৎ ব্রহ্মসাধনার অধিকার দেওয়া হত। বৈশ্যদের মধ্যে শাস্ত্র-চর্চ্চা আরো কম ব'লেই তাদের ছেলেরা আর একটু পরিপক্ক বয়সে সাবিত্রী-দীক্ষা পেত। কিন্তু সকলের ছেলেরাই কচি বয়সেই ভগবান্‌কে ডাকতে শিখ্‌ত। তোদেরও তা' শিখ্‌তে হবে।

কর্ম্মযোগের আদর্শ

পুকুরে কাদা আছে বলিয়া বিকালে আর পুকুরে মাটি কাটা হইল না, আশ্রম-কুটীরের পিছনের স্থানটুকু বর্ষায় ডুবিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আশ্রমের একেবারে উত্তরের সিমানায় একটা গভীর খালের মত কাটিয়া সেখান হইতে মাটী কাটিয়া আশ্রম-কুটীরের পশ্চাতে ফেলা হইতেছে। ছেলেদের সঙ্গে মিলিয়া শ্রীশ্রীবাবা কখনো কোদাল চালাইতেছেন, কখনো বা ঝুড়ি-বোঝাই মাটি ফেলিতেছেন। এমন সময়ে মুরাদনগর হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্যামগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত ফটিক্‌চন্দ্র গাঙ্গুলী, মহাশয় আশ্রমে শুভাগমন করিলেন। ফটিক্‌বাবু শ্রীশ্রীবাবাকে পূর্ব্বেই জানিতেন। এক সময়ে নানাবিধ আধ্যাত্মিক সমস্যার দ্বারা পীড়িত হইয়া ফটিকবাবু বহু সাধু-সন্তের নিকট ভ্রমণ করিতেছিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার সংশয়-ভঞ্জন হইল না দেখিয়া সাধুমাত্রেরই তত্ত্বজ্ঞতার উপরে তিনি ঘোরতর সংশয়ী হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে তিনি ত্রিপুরারই কোনও গ্রামে শ্রীশ্রীবাবা আসিয়াছেন শুনিয়া এক তা' ফুলস্কেপ কাগজে কতকগুলি প্রশ্ন লিপিবদ্ধ করিয়া

শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে দেখা করেন। প্রথম দর্শনে খড়্গহস্ত অভিবাদনান্তর তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা দু' এক কথায় তাঁর উত্তর প্রদান করিতে থাকিলেন। তিনটী প্রশ্নের জবাব দিবার পরেই ফটিকবাবু সোল্লাসে শ্রীশ্রীবাবার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন, অবশিষ্ট প্রশ্নগুলি কাগজেই লিপিবদ্ধ হইয়া রহিল, আর জিজ্ঞাসাও করিলেন না। তদবধি শ্রীশ্রীবাবার প্রতি ফটিকবাবুর অফুরন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা। আজ ফটিকবাবু আশ্রমে আসিয়াই শ্রীশ্রীবাবাকে ঝুড়িহস্তে দর্শন করিয়া নিজেও মাটি ফেলিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তার দরকার নেই, ছেলেরাই আছে। ফটিকবাবু ছাড়িলেন না, গিয়া কোদালও ধরিলেন। জীবনে যে ব্যক্তি কোদাল স্পর্শ করেন নাই, তাঁর পক্ষে মাটি কাটা সহজ কর্ম্ম নহে। দশ পনের মিনিট কাজ করিতেই হঠাৎ ফটিক বাবুর পায়ে কোদালের চোট্ লাগিল এবং একটা স্থান কাটিয়া গেল।

নবীপুরের শ্রীযুক্ত হরিমোহন পোদ্দার বলিলেন,—কি সর্ব্বনাশ, ব্রাহ্মণের রক্তপাত!

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—দধীচি ত' ব্রাহ্মণই ছিলেন। তিনি শুধু রক্তই দেন নাই, অস্থি পর্য্যন্ত দান করেছিলেন।

ক্ষতস্থানে একটা পরিষ্কার নেকড়া দিয়া ঔষধ বাঁধিয়া দেওয়া হইলে এক-স্থানে বসিয়া নানা আলাপ আলোচনা হইতে লাগিল। ফটিকবাবু কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কর্ম্মযোগই যে এ যুগে অবলম্বনীয়, তাতে সন্দেহ নেই। কর্ম্মহীনের জ্ঞান ও ভক্তি এ যুগে ক্ষীণ ও কৃশাঙ্গ হ'য়েই থাকবে। কিন্তু কর্ম্মযোগীকে ভুললে চলবে না যে, তার সকল কর্ম্মের পূর্ণ সার্থকতা ভগবানকে জানায়, ভগবান্‌কে ভালবাসায়। কর্ম্মযোগ প্রচার কত্তে গিয়ে আমরা যদি আবার ভক্তি-বিদ্বেষী জ্ঞানবিরোধী একটা cult সৃষ্টি ক'রে বসি, তাতে কিন্তু কোনো লভ্য নেই।

রহিমপুর আশ্রম
১০ই বৈশাখ, ১৩৩৮

প্রণামের লক্ষ্য

অদ্য প্রাতে আশ্রম হইতে জনৈক ভক্ত স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। বিদায়-কালে তিনি শ্রীশ্রীবাবাকে প্রণাম করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কাকে প্রণাম কল্লি রে?

ভক্ত বলিলেন,—আপনাকে!

শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমাকে, মানে? আমার হাত-পা-চ'খ-কাণ প্রভৃতিকে?

ভক্ত বলিলেন.—আমরা ত' হাত-পা চখ-কাণ ছাড়া আর কিছু বাবা দেখ্‌তে পাই নে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—খ্রীষ্টানরা আমাদের পৌত্তলিক ব'লে গাল দেয় ত? এই হ'ল আসল পৌত্তলিক। একটা জড়বস্তুকে প্রণাম কর্ব্বি? একটা ক্ষণস্থায়ী জিনিষের কাছে শির নোয়াবি? দেহটা যে পঞ্চভূতের তৈরী রে! এর যে উৎপত্তি আছে, বিলয় আছে! আজ আছে কাল নেই, এমন ভঙ্গুর জল-বুদ্‌বুদের মত অস্থায়ী জিনিষের প্রতি প্রেমই পৌত্তলিকতা।

ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন.—তা হ'লে কি প্রণাম কর্ব্ব না?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কর্ব্বি, কিন্তু এই জড়দেহকে নয়, জড়দেহের ভিতর দিয়ে যে চৈতন্যময় পরম-পুরুষের শক্তির বিকাশ চল্‌ছে, তাঁকে। প্রতিমার কাছেও প্রণাম কর্ল্লে পৌত্তলিকতা হয় না, যদি খড়, মাটি, রং, হাত, পা, চ'খ, কাণকে প্রণাম না ক'রে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী মহামাতার বিকাশটুকু লক্ষ্য ক'রে প্রণাম করা যায়। একটা মরা শেয়ালকে প্রণাম কর্ল্লেও তাতে বিন্দুমাত্র পৌত্তলিকতা থাকে না, যদি লক্ষ্য থাকে পরমাত্মা। মরণশীল মানুষ জেনে মা-বাপকে প্রণাম কর্ল্লেও সেটা পৌত্তলিকতা। আর এঁদের ভিতরে পরব্রহ্ম হরি বিরাজ কচ্ছেন, এই ভাব রে'খে প্রণাম কর্ল্লে, তা' হয় সত্যিকার প্রণাম। প্রণামের উপলক্ষ তোমার যা-ইচ্ছে তাই হোক্, কিন্তু লক্ষ্যটী যেন ভুল না হয়।

ভক্ত বিদায় হইলে শ্রীশ্রীবাবা সাঙ্গোপাঙ্গসহ কোদালের কাজে লাগিয়া গেলেন।

তোরা কিন্তু বৈঠা ছাড়িস্ না

আশ্রমের দক্ষিণ দিকে এক বিঘা ভূমি দূরেই পার্ব্বত্য-প্রবাহিনী গোমতী। দুপুরে শ্রীশ্রীবাবা স্নান করিতে চলিয়াছেন, জনৈক আশ্রমকর্ম্মী জিজ্ঞাসা করিলেন,—অনেক সময়ে আমরা মহাপুরুষদের দেখ্‌তে পাই, তাঁরা সাধন-ভজন করেন না। তাঁদের ধ্যান-ধারণায় বস্‌তে না দে'খে আমাদেরও নিষ্ঠা কমে যায়, উৎসাহ নাশ হয়।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তা' স্বাভাবিক। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, যাঁরা নদীর অপর পারে চ'লে যান, তাঁদের আবার মাঝ-নদীতে ফিরে এসে বৈঠা ঠেল্‌বার দরকার কি? যাঁরা ওপারে চলে গিয়েছেন, তাঁদের নিশ্চেষ্টতা দেখে তুমিও যদি নিশ্চেষ্ট হও, যদি বৈঠা চালানো বন্ধ কর, তবে নিশ্চিতই বিষম বিপদে ঠেক্‌বে। অতএব সাবধান, উচ্চাধিকারী মহাপুরুষদের নিষ্ক্রিয়তা দেখে তোরা কিন্তু বৈঠা ছাড়িস্ না।

দুঃখ-বিতাড়ন ও সুখ-লাভের উপায়

দ্বিপ্রহরের পরে গ্রামের কতিপয় মহিলা শ্রীশ্রীবাবার চরণ-দর্শনে আসিয়াছেন। শ্রীমতী বিনোদিনী সাহা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি করিলে দুঃখ যায়?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবানকে স্মরণ কর্‌লেই দুঃখ যায়, ভগবান্‌কে স্মরণ কর্‌লেই সুখের উদয় হয়। অন্য উপায়ে দুঃখ দূর কর্লে, সে দুঃখ ফিরে ফিরে আসে। ভগবৎ-স্মরণের দ্বারা দুঃখ দূর কর্লে সে আর ফিরে আসে না, চিরতরে চলে যায়। অন্য উপায়ে সুখলাভের চেষ্টা কর্লে সে সুখের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও আসে এবং সে সুখ চিরস্থায়ীও হয় না। কিন্তু ভগবান্‌কে নিরন্তর স্মরণ কত্তে কত্তে যে সুখ জন্মে, তাতে দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না এবং সে-সুখ সাধককে নিত্যকাল আনন্দিত রাখে, সে সুখের বিরাম নেই, বিচ্ছেদ নেই।

ভগবানকে পাইবার পথ

শ্রীমতী অবলা পোদ্দার জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবানকে কি করিয়া পাওয়া যায় ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তাঁর নামের ভিতরে ডুব দে, নাম-সমুদ্রের অতল তলে ভগবান্ অনন্তশয্যায় শুয়ে আছেন। নামের ভিতরে যে প্রবেশ করে, সে ভগবানের ভিতরেই প্রবেশ করে।

নামে বিশ্বাস ও গুরুবিশ্বাস

অপর একটী মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—নামে বিশ্বাস আসিবে কি করিয়া ?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—আরে বেটি, নাম যে দিয়েছে, আগে তাকে বিশ্বাস কর্, তাহ'লেই নামে বিশ্বাস আস্‌বে।

রহিমপুর আশ্রম
১১ই বৈশাখ, ১৩৩৮

সাধকদের সংবাদ-পত্র পাঠ

আশ্রম হইতে কোনও সংবাদ-পত্রের গ্রাহক হওয়া যায় নাই। আশ্রম-কর্ম্মীরা শ্রীযুক্ত অশ্বিনী পোদ্দারের বাড়ী হইতে পত্রিকা আনিয়া পাঠ করেন। একজন কর্ম্মী এইরূপ একখানা পত্রিকা পাঠ করিতেছেন, এমন সময়ে কথা উঠিল যে, পুরীধামের কোন্ মহাত্মা মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সাধকদের পক্ষে সংবাদ-পত্র পাঠ অনুচিত।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এক হিসাবে কথাটা খুব মূল্যবান্। সাধারণ সংবাদপত্রে কত রকমের খবর থাকে, তার মধ্যে কোনো কোনো সংবাদ তোমার চিত্তবিক্ষেপের কারণ হ'তে পারে।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—তাই ব'লে সংবাদপত্র পাঠ ছেড়ে দিতে হবে ? দুনিয়ার খবর রাখ্‌ব না ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আত্মগঠনই যাঁর প্রধান প্রয়োজন, দুনিয়ার অস্তিত্ব তাঁর জন্য কিছুকাল না থাক্‌লেই বা ক্ষতি কি ? তবে, যে সব সংবাদ-পত্রের moral tone (নৈতিক রুচি)টা একটু পরিমার্জ্জিত, তা' পড়্‌তে আমি দোষ দেখি না।

সংবাদ-পত্র সেবার আদর্শ

অতঃপর সংবাদপত্র-সেবক ও তাহাদের আদর্শ সম্বন্ধে কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সংবাদপত্রের সম্পাদকদের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতর। কারণ, ইচ্ছায় হোক্, আর অনিচ্ছায় হোক্, তাঁদের দ্বারা দেশের ও জাতির মনের জমিটা তৈরী হ'তে থাকে। সম্পাদকেরা যদি উচ্ছৃঙ্খলভাবে যা-তা বিষয়ের চর্চ্চা তাদের পত্রিকার মধ্য দিয়ে করেন বা অপর লেখকদের করতে দেন, তবে তার ফলে ধীরে ধীরে যে-কোনও বিষ সমগ্র জাতির মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌তে পারে। আবার, তাঁরা যদি খুব উচ্চ আদর্শকে লক্ষ্য রেখে লেখেন ও লেখান এবং উচ্চ আদর্শের পরিপোষক সংবাদগুলি প্রকাশ করেন, নীচ-বুদ্ধির উত্তেজক সংবাদগুলি চেপে যান, তাতে যথেষ্ট মঙ্গল হ'তে পারে। আজকাল শিক্ষিত যুবকেরা যত নারীহরণ কচ্ছে, যদি তার গোড়ার ইতিহাসগুলি খুঁজে বের করা যায়, তবে দেখা যাবে, নারীহরণের বা এই জাতীয় অপরাধের সংবাদ যে সব পত্রিকা বেশ রসালভাবে প্রকাশ করে, যুবকমনকে এইরূপ নীচ, জঘন্য কার্য্যে নিয়োজিত করার গৌণ দায়িত্ব তাদেরই।

ভক্তিলাভের উপায়

অতঃপর রাজা-চাপিতলা গ্রাম হইতে একটী মুসলমান ফকির আশ্রমে সমাগত হইলেন। আশ্রমে সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিই সমব্যবহারের নিয়ম। বিশেষতঃ সাধু, ফকীর প্রভৃতি যে-ধর্ম্মাবলম্বীই হউন, এখানে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়া থাকেন। ফকিরকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করা হইল।

ফকীর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা, ভক্তিলাভের উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভক্তিলাভের অনেক উপায়। ভক্তিরও যেমন নানা রূপ, ভক্তিলাভের পথও তেমন বহুবিধ। ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছি, উদ্ধারের আর পথ দেখি না, তখন অনন্যোপায় হ'য়ে বিপদভঞ্জন বিঘ্নবিনাশন শ্রীভগবানকে ডাকতে থাক্‌লাম। ডাক্‌তে ডাক্‌তে অন্তরে ভক্তি জেগে উঠ্‌ল। অথবা পরমেশ্বর কত রকম বিপদে যে আমাকে কত সময়ে রক্ষা করেছেন, কত দুঃখের মধ্য দিয়েও যে মঙ্গল দান করেছেন, কত অগ্নি-পরীক্ষায় ফেলে

দিয়েও যে নিষ্কাম নিষ্কলুষ ক'রে বের ক'রে নিয়ে এসেছেন, সকৃতজ্ঞ চিত্তে এরূপ চিন্তা কত্তে কত্তেও ক্রমশঃ মনোমধ্যে ভক্তির নির্ঝর খুলে যায়। আবার, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা কত মহৎ, আর আমরা কত সামান্য, তিনি কত বিরাট, আর আমরা কত নগণ্য, তিনি কত অঘটন-ঘটন-পটীয়ান্, আর আমরা কত ক্ষুদ্রশক্তি, এরূপ নিয়ত ধ্যান কত্তে কত্তেও অন্তরে ভক্তি জাগ্রত হয়। আবার অন্তরের সকল অভিমান, সকল অহঙ্কার, সকল সম্মান-বোধ, সকল সম্ভ্রমবুদ্ধি ভগবানের পায়ে বিসর্জ্জন দিয়ে নিজেকে তাঁর একান্ত শরণাগত জেনে, নিয়ত তাঁর সেবার, তাঁর পূজার, তাঁর প্রীতি-সম্পাদনের বিষয়ের ডুবিয়ে রাখ্‌লেও অন্তরে ভক্তি জাগ্রত হয়। কোথায় তিনি, কেমন ক'রে তাঁকে পাব, কবে পাব, নিয়ত এইরূপ ভাবে তাঁর মনন এবং তাঁর অন্বেষণ কত্তে কত্তেও ভক্তিলাভ হয়। ভগবদ্ভক্ত সাধু-মহাত্মাদের জীবনী পাঠ, তাঁদের ভক্তিময় জীবনের বারংবার চিন্তন ও আলোচনা, তাঁদের সঙ্গ এবং তাঁদের কৃপাতেও ভক্তিলাভ হয়।

ফকীর সাহেব কথাগুলি শুনিবার সময়ে মুহুর্মুহুঃ ভাব-গদ্‌গদ হইতেছিলেন। কথা সমাপ্ত হইলে পরে কিছুকাল স্থিরভাবে বসিয়া তারপরে পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—আরো কিছু বলুন।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—আরো? আচ্ছা, তবে শুনুন। যথার্থ ভক্ত-সাধকের দর্শনেই চিত্ত ভক্তিরসে দ্রবীভূত হয়।

অনুরোধ করায় ফকীর সাহেব আশ্রমে কিঞ্চিৎ ফলমূল গ্রহণ করিলেন এবং যাইবার সময়ে শ্রীশ্রীবাবাকে পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া গেলেন।

নির্ম্মল-চেতার ভক্তিলাভ সহজসাধ্য

একটী যুবক প্রশ্ন করিলেন,—ভক্তপুরুষকে দর্শন কর্লে সকলেরই কি মনে ভক্তি-ভাবের উদয় হবে?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিশ্চয় হবে। তবে, যার চিত্ত মলিন, তার ভিতরে ভক্তির উদয় লক্ষ্য করা যায় না। যার চিত্ত শুদ্ধ, তার ভিতরে ভক্তির সঞ্চারণা আসামাত্র দেহের প্রতি অণুপরমাণুকে ভক্তিরসে আপ্লুত ক'রে ফেলে।

চিত্ত-শুদ্ধির উপায়

যুবক প্রশ্ন করিলেন,—চিত্তশুদ্ধির উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সদ্‌গুরু-কথিত সাধন-ভজন এবং নিষ্কাম নিঃস্বার্থ চিত্তে পরোপকার।

কর্ম্ম ও কর্ম্মযোগ

অতঃপর গ্রামের সকল যুবকেরা আসিয়া পড়িলে মাটি কাটার কাজ আরম্ভ হইল। কাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবাবা প্রত্যেককে বলিয়া দিলেন,—মাটিতে কোদাল মার্‌তে যে শব্দটী হবে, তাকে ওঙ্কার ব'লে মনে মনে কল্পনা কর্ব্বে। মাটির বোঝা ফেল্‌তে যে ঝুপ্ ক'রে শব্দটী হবে, তাকেও প্রণব ব'লেই চিন্তা কর্ব্বে। অত্যন্ত কোলাহল কর্ব্বে না, নিষ্প্রয়োজনীয় কথা বল্‌বে না, বোঝা নিয়ে এক এক পা অগ্রসর হবে আর পদধ্বনিকে ঈশ্বরের নাম ব'লে অনুভব কত্তে চেষ্টা কর্ব্বে। শুধু কর্ম্মই আমি তোমাদের কাছ থেকে চাই না, চাই—কর্ম্মের মধ্য দিয়েও পরমাত্মার সঙ্গে অফুরন্ত যোগ।

সংশয়-চ্ছেদনের উপায়

রাত্রে আহারান্তে পায়চারি করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ্, নিয়ত নামস্মরণই সংশয়-নাশের একমাত্র উপায়। নামে যতই অবিশ্বাস আস্‌বে, ততই জোর ক'রে নাম চালাবি। এ ভাবে কাজ কত্তে কত্তে শেষে একদিন দেখ্‌বি মনটা একেবারে প্রশান্ত হ'য়ে গেছে, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, বিতর্ক কিচ্ছুই নেই। লেগে থাক্‌তে থাক্‌তেই নীরস নাম সরস হয়।

রহিমপুর আশ্রম,
১২ই বৈশাখ, ১৩৩৮

অসাত্ত্বিক দীক্ষা

প্রাতেই চারি পাঁচটী ভদ্রলোক আশ্রমে আসিয়াছেন। সকলে একই গ্রামের অধিবাসী। ইহাদের গ্রাম ছয় সাত মাইল দূরে অবস্থিত।

শ্রীশ্রীবাবা ইহাদিগকে বসিবার আসন দিতে বলিয়া বাঁশ-ঝাড়ের আড়ালে একখানা কুশাসন ফেলিয়া বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। আগন্তুকদের কিন্তু

অসহ্য হইল। দুই চারি মিনিট অপেক্ষা করিয়াই ধ্যানের জায়গায় গিয়া ইহারা উপস্থিত হইলেন। একজন গিয়া শ্রীশ্রীবাবার পাদুটা ধরিয়া একটান দিয়া বুকের মধ্যে লাগাইয়া ঘষিতে আরম্ভ করিলেন।

চক্ষু উন্মীলিত করিয়া শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্যাপার কি?

ভদ্রলোকেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—প্রভো, আমরা দীক্ষা নিতে এসেছি।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সে কথা পরে শুন্‌ব, এখন ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করুন।

পুনরায় শ্রীশ্রীবাবা ধ্যানস্থ হইলেন। ভদ্রলোকেরা ঐখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুই চারি মিনিট পরে নানা কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। শেষে উহা গিয়া প্রায় কোলাহলে পরিণত হইল।

শ্রীশ্রীবাবা পুনরায় চক্ষু খুলিলেন। বলিলেন,—দেখ বাছারা, গোল করোনা, কুটীরে গিয়ে ব'স।

দীক্ষাগ্রহণের আগ্রহের আতিশয্যে ভদ্রলোকেরা ঐখানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং মট্‌ করিয়া শব্দ করিয়া একবার একটা গাছের ডাল ভাঙ্গেন, খুট্‌ করিয়া একবার জুতার শব্দ করেন, একবার হাঁচেন, একবার কাসেন।

শ্রীশ্রীবাবা পুনরায় চক্ষু খুলিলেন। এবার আর মুখে বলিলেন না, অঙ্গুলী নির্দ্দেশে একটু দূরে যাইয়া বসিবার ইঙ্গিত করিলেন। ভদ্রলোকেরা তবু নড়িলেন না। শ্রীশ্রীবাবা একটু মুচ্‌কি হাসিয়া ধ্যানে বসিলেন। দু'মিনিট যায়, দশ মিনিট যায়, আধ ঘণ্টা যায়, ভদ্রলোকেরা আস্তে আস্তে পুনরায় আলাপ আরম্ভ করিলেন, মাছের খবর, শাকের খবর, ভবিচরণ দাসের চটিজুতার খবর, ছোট মেয়ের শ্বাশুড়ীর ননদ-জামায়ের খবর ইত্যাদি করিয়া সব খবর শেষ হইয়া ভদ্রলোকদের ক্লান্তি ধরিল। শ্রীশ্রীবাবার তবু ধ্যানভঙ্গ হয় না। শেষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ভদ্রলোকেরা 'একটু ঘুরিয়া আসি' বলিয়া আশ্রম ত্যাগ করিলেন।

ইহার অল্প পরেই শ্রীশ্রীবাবার ধ্যান ভাঙ্গিল। উঠিয়া আশ্রম-কুটীরে আসিতেই শ্রীমান্ দেবেন্দ্র পোদ্দার প্রণাম করিয়া বলিলেন,—আপনাকে আমাদের বাড়ী যেতে হবে, বিনু (বিনোদিনী) দিদির বিশেষ প্রার্থনা।

কারো প্রার্থনায় সহজে শ্রীশ্রীবাবাকে আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে দেখা যায় না, হয় মাটি কাটার কাজের দোহাই দিয়া, নতুবা ছেলে পড়াইবার নাম করিয়া লোক ফিরাইয়া দেন। আজ কিন্তু শ্রীশ্রীবাবা এক কথাতেই রাজি হইলেন।

পোদ্দারের বাড়ী গিয়া শ্রীশ্রীবাবা গল্পের আসর জমাইয়া বসিলেন। শ্রীমতী বিনোদিনীর আগ্রহে জঠরানল পূর্ব্বেই নিবৃত্ত হইয়াছে। কত দেশের কত গল্প বলিয়া শেষে দীক্ষার কথা তুলিলেন। বলিলেন,—সত্যিকার দীক্ষার আকাঙ্ক্ষা অতি অল্প লোকের প্রাণেই জাগে। অধিকাংশের আকাঙ্ক্ষাই অসাত্ত্বিক। কেউ আসে রোগ সারাবার জন্য দীক্ষা নিতে, কেউ আসে হারাণো গরু ফিরে পাবার জন্য দীক্ষা নিতে, কেউ আসে সম্পত্তি নিলাম নিবারণের জন্য দীক্ষা নিতে। এসব লোককে যারা দীক্ষা দেয়, সে সব গুরুর অনন্তকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ কত্তে হয়।

প্রকৃত দীক্ষার্থীর লক্ষণ

দুপুরের পরে গ্রামের দুই একটী যুবক আশ্রমে আসিয়া কথায় কথায় শ্রীশ্রীবাবাকে অনুযোগ দিল যে প্রবল রৌদ্র উঠিবার আগেই আজ স্কুল ছুটী হইয়াছিল, শ্রীশ্রীবাবা আশ্রমে থাকিলেই পুকুরের কাজ সুপ্রচুর হইত।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—রক্ষা কর বাবা, আজ যা বিপদে পড়েছিলাম, নিতান্তই ভগবান্ নিষ্কৃতি দিলেন। নইলে পা চাট্‌তে চাট্‌তে নূতন শিষ্যেরা আজ আমাকে উদরস্থ ক'রে ফেল্‌ত।

সকলে ব্যাপারটা শুনিয়া একটু হাসিয়া লইলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রকৃত দীক্ষার্থী দেখ্‌লেই চেনা যায়। "দীক্ষা চাই" ব'লে ষাঁড়ের মত চেঁচালেই সে দীক্ষা পাবার যোগ্য হ'য়ে গেল? প্রকৃত দীক্ষার্থীকে মুখ ফুটে বল্‌তেও হয় না যে, দীক্ষা চাই। তার প্রাণের ব্যাকুল আবেগ গুরুর চিত্তে গিয়ে এমন এক কোমলতা সৃষ্টি করে, যাতে গুরু তাকে নিজের গরজে কোলে

তুলে নেবার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে পড়েন। তার স্বভাবে এমন একটা নম্রতা, এমন একটা কমনীয়তা ফুটে ওঠে, তার বাক্যে, আচরণে এমন একটা মধুরতা এমন একটা মমতা আত্মপ্রকাশ করে, যার আকর্ষণ গুরু কিছুতেই উপেক্ষা কত্তে পারেন না।

দীক্ষাদানে গুরুর শক্তিক্ষয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—দীক্ষাদানে গুরুকে নিজ সাধন-শক্তির ব্যয় কত্তে হয়। শুধু একটা ইড়িং-বিড়িং ব'লে দিলেই দীক্ষা হ'ল না। এই শক্তির ব্যয়কে সাধনের দ্বারা গুরুকে নিরন্তর পূরণ ক'রে নিতে হচ্ছে। তা' হ'লেই বুঝ্‌তে পাচ্ছ, যার-তার জন্য শক্তিক্ষয় কত্তে কেউ রাজি হবে না। কষ্ট ক'রে যাকে শক্তি-সঞ্চয় কত্তে হয়েছে, শক্তির বৃথা ব্যয়কে সে কিছুতেই বাঞ্ছনীয় মনে কত্তে পারে না। এইজন্যেই দেখা যায়, অনেক উগ্রতপা মহাপুরুষ সমস্ত জীবনে একটী দুটীর বেশী চেলা করেনই না।

একটী ছেলে জিজ্ঞাসা করিল,—এটা কি বাবা ভাল?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভাল বৈকি! একটী দু'টী ত্যাগী সুপাত্রের পিছনে নিজেদের সমগ্র শক্তি উৎসর্গ ক'রে তাঁরা এক একটা হীরের টুকরো গড়ে যান্। আর, তোমাদের মত গরুর পাল যাদের চরিয়ে বেড়াতে হয়, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তাদের চ'খে বন্যা বইতে থাকে হে, বন্যা বইতে থাকে।

তারপরে হাসিয়া বলিলেন,—তবু রক্ষা, তোমরা কেউ রোগ সারাবার জন্য বা মামলা জিতবার জন্য আমার কাছে আস নি।

জীবনের সর্ব্ববৃহৎ দুঃখ

ইহার পরে মাটি কাটার কার্য্য আরম্ভ হইল। সর্ব্বাঙ্গে মাটি মাখিয়া শ্রীশ্রীবাবা ভূতনাথ সাজিয়াছেন, এমন সময়ে ভক্তরাজ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্মরণ করাইতে আসিলেন যে, আজ বৈকালে খোল্লা গ্রামে যাইবার কথা দেওয়া আছে এবং গ্রামবাসীরা এক বিরাট শোভাযাত্রা লইয়া কোম্পানী-গঞ্জ অপেক্ষা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দাঁড়াও, দু'টী ছেলে আজ দীক্ষা পাবে, তার আগে রওনা হচ্ছি না।

কিছুক্ষণ পরে একটি নিভৃত স্থানে দুইটী ভাগ্যবান্ যুবক অমৃতময় অখণ্ড-নামের আশ্রয় পাইলে শ্রীশ্রীবাবা তাহাদিগকে বলিলেন,—মনে রেখো, স্বরূপা-নন্দের বাচ্চারা, দারিদ্র্য দুঃখ নয়, অপমান দুঃখ নয়, গৃহদাহ দুঃখ নয়, বজ্রাঘাত দুঃখ নয়,—নাম ভুলে থাকাই জীবনের সব চাইতে বড় দুঃখ।

দুঃখজয়ের কৌশল

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—ভগবানকে যদি না ভুলে যাও, তাঁর অমৃতময় নামটী যদি না বিস্মৃত হও, তবে জান্‌বে বজ্রাঘাত তোমার কাছে একটা পীপ্‌ড়ের কামড়ের মত তুচ্ছ হয়ে যাবে।

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা গগন-বিদারী কণ্ঠে গান ধরিলেন,—

নাম যে আমার জীবন-ভরা সুখ,
নামটি যদি না ভুলে যাই
বিশ্ব-ভুবন হোক্ না বিমুখ।

তপস্যাই হিন্দুর পুনরভ্যুদয়ের পন্থা

থোল্লা আসিতে আসিতে রাত্রি হইল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় যথোপযুক্ত ভাবে শ্রীশ্রীবাবাকে অভ্যর্থনা করিলেন। নগেন্দ্রবাবুর গৃহে পদার্পণ-মাত্র গৃহ-মহিলারা উলুধ্বনি ও শঙ্খনাদ করিয়া সম্বর্দ্ধনা জানাইলেন। বহু জন-সমাগম হইল। গৃহমধ্যে স্থানের অসঙ্কুলান ঘটায় প্রাঙ্গণে আসন করিয়া দেওয়া হইল। সমবেত বালক, যুবক এবং প্রৌঢ় সকলকে উদ্দেশ করিয়াই শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—ললাটের উপরে "হিন্দু" নামলেখা একটা সাইন-বোর্ড টানিয়ে রাখ্‌লেই হিন্দু হওয়া যায় না, হিন্দুর মেরুদণ্ডের যা বল, হিন্দুর বক্ষের যা সাহস, হিন্দুর মনীষার যা প্রস্ফূরক, হিন্দুর বিরাট সভ্যতা ও অতীত গৌরবের যা মূল, সেই ভাগবতী চেতনাকে তপস্যার দ্বারা জাগিয়ে তোলা চাই। ব্যাস, বশিষ্ঠ, বাল্মিকীর দোহাই দিয়ে টিকি নাড়্‌লেই হিন্দু হওয়া যায় না,—তাঁদের চিত্তের ঈশ্বরাভিমুখতাকে অবিরাম সাধন-ভজনের শক্তিতে

নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা চাই। আমার দেহে, আমার মনে পরমেশ্বরেরই শক্তির খেলা হচ্ছে, আমার চিন্তার প্রতি তরঙ্গ, শরীরের প্রত্যেকটী পরমাণু তাঁরই অনির্ব্বচনীয় অভিপ্রায়কে ব্যক্ত কচ্ছে, নিমেষের জন্য আমি তাঁকে ছেড়ে যেতে পারি না, ক্ষণিকের জন্য তিনি আমাকে পরিহার করেন না,—এইরূপ ধ্যান-নিমগ্নতার মধ্য দিয়েই হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় থাক্‌বে। রান্নার হাঁড়িতে নয়, কূপমণ্ডূক-বৃত্তিতে নয়, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারে নয়, খাদ্যাখাদ্যের আড়ম্বরে নয়, বৈবাহিক গণ্ডীর সঙ্কীর্ণতায় নয়, বাধ্যকর বৈধব্যে নয়,—হিন্দুর হিন্দুত্ব শত শত্রুর ষড়যন্ত্রজালকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে নিরাপদে আত্মরক্ষা কর্ব্বে তার ঈশ্বরাভিমুখতা দিয়ে। যতক্ষণ হিন্দু পরমাত্মাকে ভুল্‌বে না, ততক্ষণ সে নিশ্চিন্ত, ততক্ষণ সে জরা-মরণ-ভয় রহিত, অক্ষয়, অমর; কে কার হাঁড়িতে খেল, আর কে কার ছোঁয়া জিনিষ খেল না, তাতে হিন্দুত্বের কিছু যায় আসে না। নিজ নিজ স্বভাবের প্রবর্ত্তনা বুঝে, নিজ নিজ অন্তরের প্রয়োজন বুঝে, নিজ চিত্ত-শুদ্ধির দাবী বুঝে যার হাতে ইচ্ছা খাও, যার হাতে ইচ্ছা না হয় না খাও। কিন্তু তুমি যে কায়মনোবাক্যে একমাত্র ভগবানেই সমর্পিত, ভগবানই যে ত্রিলোকে তোমার প্রিয়তম, শ্লাঘ্যতম, তাঁকে পাওয়াই যে তোমার চরম পাওয়া আর তাঁকে চাওয়াই যে তোমার পরম চাওয়া, এইটী না ভুল্‌লেই হল। সমুদ্র-যাত্রা তুমি কর্‌বে কি না কর্‌বে, কাউকে স্পর্শ ক'রে তুমি স্নান কর্‌বে কি না কর্‌বে, মাছ-মাংস খাবে না বেতাগ-হেলেঞ্চা খাবে, অসবর্ণ বিয়ে কর্‌বে না সবর্ণা পাত্রীই খুঁজে বেড়াবে, বিধবার পুনর্বিবাহ দেবে কি বৈধব্যের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মচর্য্য-পালনই সে কর্ব্বে,—এ সব প্রশ্নের "হাঁ" কি "না"এর উপর হিন্দুত্ব নির্ভর করে না। সমুদ্রযাত্রা কত্তে হয় কর, কিন্তু সংসার মহাসমুদ্রের যাত্রীর একমাত্র ধ্রুবতারা শ্রীভগবানের দিক্ থেকে দৃষ্টি যেন অন্য দিকে ধাবিত না হয়। কাউকে তুমি স্পর্শ কত্তে চাও, কর, না কত্তে চাও, না কর, কিন্তু শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভের জন্য, তাঁর শ্রীঅঙ্গ-পরশের জন্য যেন তোমার চিত্তের ব্যাকুলতা একটী নিমেষের জন্যও না কমে। সবর্ণা নারীকেই বিয়ে করেছ কি অসবর্ণা কন্যারই পাণিগ্রহণ কচ্ছ,—সেইটা তোমার প্রধান লক্ষ্য বা চিন্তনীয় না

হ'য়ে, এটাই তোমার একমাত্র চিন্তনীয় হোক্ যে, এই নারীর সাহচর্য্য তোমার ভগবল্লাভের সহায়ক কি ক'রে হয়, এর সঙ্গ ভগবৎ-সঙ্গে কি ক'রে পরিণত হ'তে পারে, এর প্রতি প্রীতি, অনুরাগ, লালসা ও প্রেম কি ক'রে ভগবৎ-প্রীতি, ভগবদনুরাগ, ভগবল্লালসা ও ভগবদ্প্রেমে রূপান্তরিত হ'তে পারে, কি ক'রে বিবাহিত জীবনের সকল দাম্পত্য চেষ্টা ও দাম্পত্য সুখ ভগবৎ-প্রাপ্তির চেষ্টায়, ভগবৎ-প্রাপ্তির সুখে পর্য্যবসিত হ'তে পারে। বিধবারা বিয়ে করেছে? করুক না, ভগবান্‌কে কি ক'রে এই নব-বিবাহিত জীবনে পরমৈশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সেই লক্ষ্য যেন হারিয়ো না। তা' হ'লেই তুমি হিন্দু।

সমাজ-সংস্কারকদের ব্যর্থতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—সমাজের সংস্কার-পন্থী মনীষীরাও অনেক সময়ে এই গোড়ার কথাটা ভুলে যান্। তারই জন্যে তাঁদের ভূয়সী চেষ্টা এবং অসামান্য উদ্যম সমাজ-সংস্কারের নাম ক'রে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনাস্থাকারী, হিন্দু সভ্যতার প্রতি অবজ্ঞাকারী, হিন্দুর অতীত মহিমার প্রতি অশ্রদ্ধাকারী নরনারীর সংখ্যাই মাত্র বর্দ্ধিত ক'রে দিচ্ছে। ভাগবতী বুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলাই যে হিন্দুকে স্বকীয়ত্বে প্রতিষ্ঠা করার বনিয়াদ, এ কথা বিস্মৃত হ'য়ে সমাজ-সংস্কার করার চেষ্টা হচ্ছে ব'লেই সমাজ সত্যি সত্যি সংস্কৃত হ'য়ে উঠ্‌ছে না। শাস্ত্রেরই শ্লোকোদ্ধার ক'রে তারা প্রচার ক'রেছেন 'জাতিভেদ অন্যায়', অথচ তার ফলে জাতিভেদ আজ পর্য্যন্ত উঠে যায় নি, মাঝ থেকে শাস্ত্রের প্রতি লোকের ঘোরতর অশ্রদ্ধা এসেছে, শাস্ত্র-সমুদ্রে ডুব দিয়ে তার ভিতর থেকে মুক্তা আহরণের প্রবৃত্তি ও অধ্যবসায় দেশ থেকে চলে গেছে; কারণ, শ্রদ্ধা-হীন ব্যক্তিরা কখনো অধ্যবসায়ী হ'তে পারে না! লোকের চিত্তে সাধন-ভজনের রুচি-সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তপস্যার শক্তিতে লোকের মনকে সংস্কার-পথাশ্রিত কত্তে না চেয়ে উল্টো কতকগুলি যুক্তির দ্বারা লোকের সহজ ধর্ম্মবুদ্ধিকে বারংবার আঘাত কত্তে কত্তে এমন হ'য়ে উঠেছে যে, এই সংস্কারকদের সাধু উদ্দেশ্যের প্রতি পর্য্যন্ত সবাই সন্দিহান হ'য়ে পড়্‌ছে। সমাজ-সংস্কারক প্রতিষ্ঠানগুলিতে যাও, দেখ্‌বে, এমন কতকগুলি লোক এ সব প্রতিষ্ঠানের

প্রাণশক্তিকে করধৃত ক'রে রেখেছে, যারা তপস্যার চেয়ে চালাকিতে অধিক বিশ্বাস-পরায়ণ, ভগবৎ-সেবার বুদ্ধির চেয়ে অর্থের শক্তিতে অধিকতর আস্থা-কারী। এজন্যেই আশু-প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলিও স্থায়ীভাবে হ'য়ে উঠ্‌তে পারছে না।

গোঁড়াপন্থীদের মূঢ়তা

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—এই প্রসঙ্গে গোঁড়াপন্থীদের কথাও বাদ দিলে চল্‌ছে না। সংস্কার-পন্থীদের চেষ্টায় কোথায় যে গলদ, গোঁড়াপন্থীদের মধ্যে অনেকে তা' বোঝেন। কারণ, এই দুর্গতির দিনেও উদারপন্থীদের চেয়ে গোঁড়াপন্থীদের মধ্যে ভগবৎ-প্রেমিক পুরুষের সংখ্যা বেশী। একশ' জন টুলো-পণ্ডিত আর একশ' জন কলেজি-বিদ্বান এক জায়গায় এনে যদি তাদের চিত্ত-বৃত্তির দোষগুণগুলি পরীক্ষা করা যায়, দেখা যাবে, কোনো একটা নূতন রকমের কাজে, একটা সৎসাহসিক বা অসমসাহসিক কাজে কলেজি-পণ্ডিতদের কাছে সাড়া দ্রুত মিললেও পাপকাজে বা অন্যায় কাজে টুলো পণ্ডিতরা ইংরিজিওয়ালা-দের মত দ্বিধাহীন হ'তে পারেন না, তাঁদের আস্তিক্য বুদ্ধি, ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক, ইহকাল-পরকালে বিশ্বাস তা'দিগকে কুণ্ঠিত ক'রে পাপ পথ থেকে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু হায়, কেউ যখন সমাজে সংস্কার প্রবর্ত্তন কত্তে আসেন, টুলো পণ্ডিতরা তাদের বাধা দিতে গিয়ে নিজেদের শক্তির এতখানি অপব্যয় ক'রে ফেলেন যে, সংস্কার প্রবর্ত্তনের পরে তাঁদের এত বড় ব্যক্তিত্বগুলির প্রভাব জাতির ইতিহাসে একেবারে অস্বীকৃত হয়। দারিদ্র্যপূর্ণ নির্লোভ জীবনযাপন ক'রে নীবার-কণায় জঠর-জ্বালা নিবারণ ক'রে একমাত্র ধর্ম্মবুদ্ধিকে আশ্রয় ক'রে যথার্থ ব্রাহ্মণের জীবন যাঁরা যাপন কচ্ছেন, তাঁরা যদি সমাজ-সংস্কারকদের সঙ্গে লড়াই দিতে অগ্রসর না হ'য়ে তা'দিগকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে নিজ নিজ আবাল্য-সঞ্চিত প্রতিভার বল নিয়ে ছোট-বড় নির্ব্বিশেষে সবাইকে ভগবৎ-সাধন-পরায়ণ করার জন্য পল্লীতে পল্লীতে শাস্ত্রের অমৃত সিঞ্চন ক'রে যেতেন, তবে অদূর ভবিষ্যতে দেখা যেত যে, এঁরাই সমাজের প্রকৃত সংস্কারক।

১৩ই বৈশাখ,
১৩৩৮

দেব-মন্দিরাদি স্থাপনের উদ্দেশ্য কি ?

খোল্লার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী দুইরা মধ্য-ইংরেজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তাঁহার একান্ত আগ্রহ যে শ্রীশ্রীবাবা দুইরা বিদ্যালয়ে পদধূলি প্রদান করেন। শ্রীশ্রীবাবা বলিয়াছিলেন,—বক্তৃতা যদি না দিতে হয়, তবে রাজি। বক্তৃতায় অরুচি শ্রীশ্রীবাবার চিরকালই দেখিয়া আসিতেছি। বৎসরে দুইটা একটা বক্তৃতাই দুর্ল্লভ। সম্প্রতি আবার সম্বৎসরব্যাপী মৌনের ফলে বক্তৃতা দানের অরুচিটা পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছে। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ ছাড়িবার পাত্র নহেন। মন্ত্রশিষ্য না হইলেও তিনি মন্ত্রশিষ্যদের চেয়েও অধিক আবদেরে এবং শ্রীশ্রীবাবার অধিকতর প্রীতিপাত্র। অতএব রওনা হইতেই হইল।

পথিমধ্যে খোল্লাগ্রামের শিববাড়ী। শিবরাত্রির দিন শ্রীশ্রীবাবাকে এখানে আনিবার জন্য নগেন্দ্রনাথ মাথা-কপাল খুঁড়িয়াছেন। কিন্তু রহিমপুরের আশ্রম ছাড়িয়া আসিতে রহিমপুরের গ্রামবাসী নরনারীরা বিশেষ ভাবে ভক্তরাজ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কিছুতেই দেন নাই। পাথরের শিবের উপর যত অত্যাচার হইত, সব তারা জীবন্ত শিবের উপরে করিয়া তবে ছাড়িয়াছিলেন। অদ্য তাই শ্রীশ্রীবাবা এই শিবালয়ে একটু বসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—দেবমন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্য জান? বিষয়লিপ্ত বহির্ম্মুখ মনকে টেনে এনে অন্তর্ম্মুখ করার জন্যই এ সব। তোমরা প্রত্যেকটী দেবমন্দির বা দেববিগ্রহকে উপলক্ষ ক'রে প্রত্যেককে সাধনে অনুরাগসম্পন্ন কত্তে চেষ্টা পাবে। সাধনহীন বহির্ম্মুখ জীবন দিয়ে কি কাজটা হয়?

বিশ্বাস কর

দুইরা স্কুলে পৌছিতেই এক মহাসমারোহ লাগিয়া গেল। আজ রবিবার হইলেও নগেন্দ্রবাবু স্কুল বন্ধ দেন নাই, সব ছাত্রেরা উপস্থিত। শ্রীশ্রীবাবা আসিবেন জানিতে পারিয়া চতুর্দ্দিকের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও আসিয়াছেন।

প্রণামের হুড়াহুড়িতে আর পুষ্পমাল্যের ছড়াছড়িতে শ্রীশ্রীবাবা কতকটা যেন ক্লান্তই হইয়া পড়িলেন। পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবা বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ করিয়া, অনালস্য, স্বাবলম্বন প্রভৃতি সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। উপসংহারে বলিলেন,—মহাব্রত সাধনের জন্যই এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছ, একথা বিশ্বাস কর। দশজনে যা' পারে না, তাকে সম্ভব ক'রে তোল্‌বার জন্যই যে তোমাদের আবির্ভাব, এ বিশ্বাস নিরন্তর পোষণ কর। অতীত যুগে যা' কখনো কেউ করে নি, তোমরা যে তাই কত্তে এসেছ, অফুরন্ত ধ্যানে এই বিশ্বাসকেই পরিপুষ্ট কর। বিশ্বাস কর, তোমরা সামান্য নও, নগণ্য নও, নীচ, হেয়, ঘৃণ্য নও। বিশ্বাস কর, তোমরা অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে অলস হ'য়ে ব'সে থাকতে পার না, অদৃষ্টের অহঙ্কার চূর্ণ করার শক্তি তোমাদের বাহুতে আছে, দৈবকে পদানত করার সামর্থ্য তোমরা রাখ। বিশ্বাস কর, অতীতের ভুল-ভ্রান্তির জন্যে অনুশোচনার জন্য তোমরা আস নাই, এসেছ বর্ত্তমানের অসামান্য তপস্যার বীর্য্যে, সাধনার শক্তিতে ভবিষ্যৎকে গড়্‌তে। আজ সর্ব্বপ্রযত্নে বিশ্বাসের শক্তিকে জাগিয়ে তোল। কারণ বিশ্বাসই শক্তি, বিশ্বাসই বল, বিশ্বাসই বিশ্ববিজয় করে।

বক্তৃতান্তে বিদ্যালয়ের সম্পাদকের গৃহে জলযোগ সমাপনান্তে শ্রীশ্রীবাবা পূর্ব্বধৈর গ্রামে রওনা হইলেন।

মানুষ সত্য

বেলা দশটার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা পূর্ব্বধৈর শ্রীযুক্ত দীননাথ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে শুভাগমন করিলেন। একটা আনন্দের কলরোল পড়িয়া গেল। দীননাথবাবুর সহধর্ম্মিণী যে কি ভাবে শ্রীশ্রীবাবার সেবা ও সন্তোষ-বিধান করিবেন, তাহার চেষ্টার বিরাম নাই। দীননাথ বাবুর মাতা, পত্নী, ভগ্নী, পুত্রবধূ ও অপরাপর আত্মীয়ারা ধান্যদূর্ব্বা দিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন এবং ঘন ঘন উলুধ্বনিতে আকাশ বাতাস মাতাইয়া তুলিলেন। ফুলগন্ধে, ধূপ-ধুনা-চন্দনের সৌরভে দীননাথ-ভবন আমোদিত হইয়া উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একটা মানুষকে এত পূজা-অর্চ্চনা কেন?

দীননাথবাবু বলিলেন,—সবার উপরে মানুষ সত্য, ইহার উপরে নাই।

মহিলারা একে একে আসিয়া তাঁহাদের স্নেহশ্রদ্ধা জানাইয়া যাইতে লাগিলেন, শ্রীশ্রীবাবা "জয় মা" "জয় মা" বলিয়া প্রণাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

ছেলেদের ঠাকুর

মহিলারা অপসৃতা হইতেই গ্রামের পুরুষেরা আসিয়া বসিলেন। নানা ধর্ম্মকথা হইতে লাগিল। এমন সময়ে ডালপা গ্রামনিবাসী জনৈক ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন,—ছেলেদের ঠাকুর দেখিতে আসিয়াছি, তিনি কৈ ?

শ্রীশ্রীবাবার পরিধানে গৈরিক নাই, শাদা কাপড় পরা, সাধুজনোচিত কোনও বিশেষত্ব নাই, সুতরাং ভদ্রলোক শ্রীশ্রীবাবাকে দেখিয়াও চিনিতে পারিলেন না। প্রত্যেকেরই মুখের পানে তাকান এবং অপরিচিতের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন।

শ্রীশ্রীবাবাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেই শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমিই ছেলেদের ঠাকুর।

একটা হরিধ্বনির গর্জ্জন আরম্ভ হইয়া গেল। নবাগত ভদ্রলোক শ্রীশ্রীবাবার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন, শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন,—দয়াল ঠাকুর, প্রেমের ঠাকুর, ধন্য ঠাকুর, ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একজনের মধ্যে যে ঠাকুরকে দর্শন করে, তার ঠাকুর ব্রহ্মাণ্ডময়।

জীবমাত্রেরই জাতি-ব্যবসায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস

অতঃপর পুনরায় ধর্ম্মপ্রসঙ্গ চলিতে থাকিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এক কৈবর্ত্তের ছেলে মহাদারিদ্র্যে প'ড়ে রাস্তার পাশে ব'সে কাঁদ্‌ত। তার কান্না দেখে কারো মনে দয়া হ'ত, কারো মনে বা বিদ্রূপের ভাব জাগ্‌ত। মোটের উপরে সাহায্য তাকে কেউ কত্ত না। যার মনে দয়া হ'ত, সেও কোনো সাহায্য সহায়তা না ক'রেই চলে যেত। একদিন এক যোগিপুরুষ পথ দিয়ে যাচ্ছেন, তিনি কৈবর্ত্তের ছেলেকে কাঁদ্‌তে দেখে বল্লেন,—'কাঁদিস্ কেন রে ?' ছেলে

বল্লে,—'কাঁদব না মশাই ? খেতে পাইনে !' যোগী বল্লেন,—'খেতে পাস্ না ব'লে কাঁদ্‌বি? কাঁদলে তোর প্রতি দয়া কে কর্ব্বে ?' ছেলে তেড়ে উঠে বল্লে,—'হ্যাঁ মশাই, তা' হ'লে কি কর্ব্ব ?' যোগী বল্লেন,—'জাত-ব্যবসা কর্।' ছেলে বল্লে,—'জাত-ব্যবসা আমার মাছ ধরা, কিন্তু জাল পাব কোথায়?' যোগী বল্লেন,—'সঙ্গেই আছে, জন্মকালেই জাল নিয়ে এসেছ, নইলে কি আর কৈবর্ত্তের বেটা হও ?' ছেলে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল,—'মশাই, জালই যদি পাব, তবে আর ব'সে থাকি ?' যোগীপুরুষ কৈবর্ত্ত-ছেলের ছেঁড়া কাপড়ের একদিক্ টেনে তুল্‌তেই দেখা গেল নীচে সত্যি একটা ঝাঁকি-জাল রয়েছে। কৈবর্ত্তের ছেলে বল্ল,—'এ যে ছেঁড়া জাল ? এ যে পুরুণো জিনিষ !' যোগী বল্লেন,—'জবরদস্তি করো না, আস্তে আস্তে জাল ছাড় আর জাল গুটাও, ক্রমে দেখ্‌বে, আপনি জাল মেরামত হ'য়ে যাচ্ছে। জাল ফেল্‌বার সময়ে মনে রেখো মৎস্য তোমার লক্ষ্য, জাল গুটাবার সময়েও মনে রেখো মৎস্যই তোমার লক্ষ্য। অন্য চিন্তাকে মনের কোণেও আস্‌তে দেবে না।'—আমরা সবাই এই কৈবর্ত্ত-ছেলের মত আত্মবিস্মৃত। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আমাদের জাতি-ব্যবসা। জোর জবরদস্তি না ক'রে পরমেশ্বরই যে আমাদের লক্ষ্য এই কথা স্মরণে জাগিয়ে রেখে তাঁর নাম কত্তে কত্তে জাতি-ব্যবসা কল্লে, যাঁকে পেলে কোনো অভাব থাকে না, তাঁকে পাওয়া যায়, এই ছেঁড়া জাল দিয়েই মাছ ধরা যায়। তাঁর স্মৃতিকে অহর্নিশ অন্তরে জাগিয়ে রাখ্‌বার জন্যই তাঁর নাম প্রয়োজন। নাম হচ্ছে তাঁর স্মারক। নামই তাঁকে সুলভ করে, তাঁকে পাবার বিঘ্নগুলি দূর করে, চিত্তকে তাঁর প্রতি রুচিসম্পন্ন করে, প্রেমসম্পন্ন করে। নামই দুঃখ দূরের উপায়।

সৎকথা ভাবিতে হয়

বিকাল বেলা মহিলারা ধরিলেন, তাঁহাদিগকে কিছু সৎকথা শুনাইতে হইবে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সৎকথা কি মা শুনাতে হয় ? ছোট্ট ছেলেটীর মত আমি তোদের মাঝখানে ব'সে থাকি আর তোদের চ'খে, তোদের মুখে,

তোদের হাতে, তোদের পায়ে জগন্মাতাকে দর্শন কত্তে থাকি,—এতে তোদের ভিতরে অফুরন্ত সৎচিন্তার সৃষ্টি হবে, তখন তোরাই কতজনকে সৎকথা শুনাবি। আর, আমার দিকে তাকিয়ে তোরা আমার চ'খে, মুখে, নাকে, কাণে বাল-গোপাল শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিকে ধ্যান কর,—দেখ্‌বি তার ফলে সূক্ষ্মভাবে জগতের কত আলস্য-তন্দ্রিত চিত্তে ভগবৎ-প্রেমের স্ফুরণ ঘ'টে যাবে। সৎকথা শুনাতে হয় না মা, সৎকথা ভাব্‌তে হয়।

সৎকথা কাহাকে বলে

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সৎ কে? যিনি সর্ব্বদাই আছেন, যাঁর বিনাশ নেই। সর্ব্বদা, সকল অবস্থাতে যিনি বিরাজমান, যাঁর জরা নেই, মরণ নেই, তিনিই সৎ। তাঁর সম্বন্ধীয় কথাই সৎকথা। সে কথাতেই মা ডুবে থাক্‌তে হয়; মুখে নয়, মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে।

ভগবানের জন্য ব্যাকুলতাই মনুষ্যজন্মের সার্থকতা

বাংলার পল্লী-মহিলাদের হৃদয় বড়ই কোমল এবং বড়ই সরল। সাদাসিধা ভাষায় শ্রীশ্রীবাবা ঈশ্বর সম্বন্ধে দু'-চারিটী কথা বলিতেই অধিকাংশের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। তারপরে শ্রীশ্রীবাবা মৈত্রেয়ীর কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে ডেকে বল্লেন, এই নাও ধন, এই নাও পুত্র, এই নাও শিষ্য, এই নাও গাভী, এই নাও শস্য-ক্ষেত্র। মৈত্রেয়ী বল্লেন,—এতে কি অমর হওয়া যায়? এতে কি, ভগবানকে পাওয়া যায়? যাতে অমর হওয়া যায় না, যাতে ভগবানকে পাওয়া যায় না, তা' আমি চাই না। ভেবে দেখ্‌ দেখি মায়েরা, মৈত্রেয়ীর ছিল কেমন বুকের পাটা? একখানা গয়নার জন্যে তোরা স্বামীর ভিটেয় আগুন লাগিয়ে দিতে পারিস্‌, আর স্বামীর সব কিছু পেয়েও মৈত্রেয়ী তা' অগ্রাহ্য কচ্ছেন, ভগবানকে পাবার জন্য। ভগবানের জন্য যখন চিত্ত এইরূপ ব্যাকুল হবে, বল্‌ব, তখন মনুষ্য-জন্ম সার্থক হ'ল।

ভগবানকে ছাড়া সুখ বিস্বাদ

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—তোরা মা এই রকম ব্যাকুল হ'। ভগবানকে ছাড়া সংসার বিষাক্ত, সুখ-সম্ভোগ তিক্ত। ভগবানকে ছেড়ে স্বামীপ্রেম মধুহীন, পুত্রস্নেহ প্রাণহীন, মাতৃপিতৃভক্তি স্বাদহীন। ভগবান্‌কে ভুলে বিষয়-সম্পদ আনন্দহীন, উৎসব-উল্লাস দীপ্তিহীন, মলিন। সংসারের সকল সুখের মাঝে ভগবানকেই খুঁজে বেড়া। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার ভিতর তাঁকে সন্ধান কর্। পিতা, মাতা, পুত্রকন্যা ও স্বামীর ভিতরে তাঁকে তোর পূজা দে, অর্চ্চনা দে, সকল সুখস্পর্শে তাঁর স্পর্শ স্মরণ কর, সকল স্নেহভাবে তাঁর কণ্ঠ মনে আন্। জড়দেহের পূজা ক'রে মানুষ কখনো তৃপ্তি পায় না, পূজা কর্ সেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরকে, যিনি যে কোনও জড়বস্তুর ভিতর দিয়ে নিজ স্নেহ, প্রেম, ভালবাসাকে, দয়া, মায়া, মমতাকে বিকশিত কত্তে পারেন এবং কচ্ছেন।

বাঙ্গরা,

১৪ই বৈশাখ, ১৩৩৮

যদিও শ্রীশ্রীবাবা বক্তৃতা দিবেন না বলিয়াই স্থির করিয়াছেন, তথাপি লোকে ত' ছাড়িতে চাহে না। বাঙ্গরা গ্রামে আসিবামাত্রই গ্রামের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ জমিদার রায়সাহেব শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্রলোচন মজুমদার ও বাঙ্গরা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অবনীমোহন মজুমদার মহাশয়দ্বয় শ্রীশ্রীবাবাকে বিশেষভাবেই ধরিলেন। অগত্যা শ্রীশ্রীবাবা স্কুলে একটী বক্তৃতা দিতে সম্মত হইলেন। শ্রীযুক্ত অবনীবাবু মুখবন্ধ স্বরূপে বলিলেন,—সূর্য্যদেব যেমন নিজের প্রখর রশ্মিমালার দ্বারা স্বয়ংই পরিচিত হন, আর কাহাকেও আসিয়া সূর্য্যদেবের পরিচয় দিতে হয় না, স্বামীজী মহারাজও তদ্রূপ স্বকীয় তপঃপ্রভায় এতদঞ্চলে আবালবৃদ্ধবনিতার নিকটে পরিচিত। সুতরাং আমি আর তাঁহাকে পরিচিত করিবার জন্য বাগ্‌জাল বিস্তার করিব না। আমি শুধু এইটুকু বলিতেই চাহি যে, যিনি আকৌমার ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যথার্থ আচার্য্য হইয়াছেন, এই বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থীদিগকে তিনি যে কৃপাপূর্ব্বক পদধূলি প্রদান করিলেন, ইহা বিদ্যার্থীদের বহুজন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফল এবং এই বিদ্যালয়ের এক পরমভাগ্য।

হতাশা বর্জ্জন কর

অনর্গল দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীবাবা জীবন-গঠন সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলেন। উপসংহারে তিনি প্রত্যেকটী শব্দের সহিত যেন এক অপার্থিব শক্তির সঞ্চারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—অতীত জীবন তোমার যেমনই থাকুক না, সব ভুলে যাও, স্মৃতি-পট থেকে সব মুছে ফেল। সঙ্কল্প কর, ভবিষ্যৎকে আর ব্যর্থতার ধূলিতে ধূসরিত হ'তে দেবে না। ভুলে যাও জীবনের সকল ভুল, সকল ভ্রান্তি, সকল প্রমাদ, ভুলে যাও অতীতের সকল পাপ, সকল দোষ, সকল ত্রুটী,—বিশ্বাস কর, তোমারও জগতে কিছু কর্ব্বার আছে, তোমারও বিশ্ব-সভ্যতাকে কিছু দেবার আছে, তোমারও উপরে মনুষ্য-জাতির শুভাশুভ নির্ভর করে। হতাশার মুখে শত পদাঘাত ক'রে গর্জ্জন ক'রে ব'লে ওঠ,—'অতীত! তোমার মৃত্যু হোক্, ভবিষ্যৎ! তুমি সৃষ্টির আনন্দে জেগে ওঠ।' যত পতিত আর যত অধমই তুমি হ'য়ে থাক না কেন, আশ্বস্ত হও, তোমারো জন্য ত্রিভুবনবিস্ময়কারী অপরিসীম উন্নতির দুয়ার প্রমুক্ত, তোমারও জন্য পূর্ণ মনুষ্যত্বের সম্ভাবনা সম্যক্‌রূপে প্রশস্ত। হতাশা বর্জ্জন কর, দুর্ব্বলতা পরিহার কর, আলস্য ত্যাগকর। নবীন আশায় সঞ্জীবিত হয়ে, অভিনব উদ্যমকে সহায় ক'রে, অবিরত অধ্যবসায়ের শক্তিতে অতীতের সকল মালিন্যকে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেল্‌বার জন্য আজ আত্ম-গঠন-পরায়ণ হও, সংযমী হও, ব্রহ্মচারী হও, বীর্য্য-ধারণে ব্রতী হও।

ভারতের দুর্দ্দশার প্রতীকারোপায়

বক্তৃতান্তে কথোপকথন-প্রসঙ্গে রায়সাহেব রূপেন্দ্রলোচন মজুমদার জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতীকারের পথ কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মানুষের ভিতরে ঈশ্বর-চেতনা জাগিয়ে তোলা। আমার সব কিছু ঈশ্বরের, আমার বল, বুদ্ধি, সামর্থ্য তাঁর, তাঁরই কোনও মঙ্গল অভিপ্রায়কে পূর্ণ করার জন্য তিনি এসব সম্পদ আমাকে দিয়েছেন, তিনিই আমার পরম লক্ষ্য, আমার সর্ব্ব কর্ম্ম তাঁরই প্রীতি-সাধনের জন্য,—এইরূপ চেতনা

অধিকাংশ মানব-মানবীর মনে যখন জাগিয়ে তোলা যাবে, তখন দুর্দ্ধর্ষ দুর্দ্দশাও কটাক্ষের ইঙ্গিতে ভারত-ভূমি পরিত্যাগ কর্ব্বে।

মনকে ঈশ্বরমুখী করিবার উপায়

অবনীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—মনকে ঈশ্বরমুখী করিবার উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যাঁদের মন ঈশ্বরমুখী তাঁদের সঙ্গ এর সদুপায়। ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি দেখ্‌লে স্বভাবতই মনে একটা ধ্যান-প্রবণতা আসে। স্থানে স্থানে ধ্যানরত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিকে প্রতিষ্ঠা ক'রে বৌদ্ধেরা এভাবে ঈশ্বর-বিমুখ লক্ষ লক্ষ মনকে ঈশ্বর-প্রবণ ক'রেছেন। বর্ত্তমান যুগেও এরূপ ব্যবস্থা দরকার। ধ্যানপরায়ণ জীবন্ত মানব যদি না পাই, নিত্যধামগত ব্যক্তির প্রতিকৃতিকে দিয়েও কাজ চল্‌তে পারে।

ধ্যানী কৃষ্ণ

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—কতকদিন ধ'রে—আমার মনে হচ্ছে কৃষ্ণোপাসকদের চ'খের সাম্‌নে ধ্যানরত কৃষ্ণসুন্দরের মোহন দৃষ্টি উপস্থাপিত করা। ধ্যানস্থ কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেখ্‌তে দর্শকেরও ধ্যান জমাটভাব বাঁধ্‌বে। শ্রীকৃষ্ণ আর কার ধ্যান্ কর্ব্বেন, শ্রীরাধার ছাড়া? শ্রীরাধাই তাঁর আরাধিতা। জীবের জন্যই ভগবান কেঁদে মরেন। শ্রীরাধাচিন্তনে একাগ্রমনা কৃষ্ণের কায়গ্রীবা ও শিরোদেশ ধ্যান-নম্র, স্থির, দৃষ্টি ভ্রূ-মধ্যসেবী, লক্ষ্য অপলক, শ্বাস-প্রশ্বাস নিস্পন্দ, বাহ্যজগতের সাড়াশব্দ স্তম্ভিত, অনাহত মহানাদ এসে শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরে ফেলেছে, আর দিব্যলোকে শ্রীরাধাবিগ্রহ ধ্যানালোকে ফুটে উঠেছেন সমগ্র জগতের সকল রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দকে নিজের ভিতরে সম্পুটিত ক'রে।

ভগবানই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা

বিকালবেলা শ্রীশ্রীবাবা জনৈক ভক্তগৃহে শুভাগমন করিলেন।

জনৈক জিজ্ঞাসু বলিল,—বাবা, রিপুর জ্বালায়ই অধীর হইয়া পড়িলাম, যে কামনাকে অন্যায় ব'লে জানি, নিরন্তর অন্তরে সেই কামনাই আসিতেছে, উপায় করি কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শরীরের প্রত্যেকটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান চিন্তা কর। তোমার প্রত্যেকটী ইন্দ্রিয়ের তাঁকেই অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব'লে ভাব্‌তে থাক। চিত্তের উদ্দাম লালসা যে তাঁকে পাবারই জন্য, দেহ, মন, প্রাণ দিয়ে তাঁরই সঙ্গসুখ লাভের জন্য নিয়ত তাই ধ্যান কত্তে থাক। মানুষের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হ'লে চিন্তা কত্তে আরম্ভ কর, সেই ভগবানের সাথে মিলনের কথা, যিনি সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা। এ ভাবে কিছুদিন অভ্যাস কর্ল্লেই রিপুর জ্বালা প্রশমিত হবে।

তালে তালে হাঁটা

ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবা গ্রামের চতুর্দ্দিকই দেখিতেছেন। রায়-সাহেব তৎপ্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের নূতন দালান দেখাইলেন। সঙ্গে গ্রামের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও যুবক। একজন যুবক তালে বেতালে পদচারণা করিতেছে দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তালে তালে হাঁট।

যুবকটী বলিল,—কেন?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তালে তালে হাঁট্‌লে প্রত্যেকবার পদসঞ্চারণের সময় বিনা ক্লেশে ভগবানের নাম স্মরণ করা যায়। প্রথম প্রথম সামান্য অভ্যাস কর্‌লেই শেষে এমন হ'য়ে যায় যে, পথ ভ্রমণকালে নাম আর তোমাকে কিছুতেই ছাড়্‌বে না।

যুবকটী বলিল,—আমি ভাবিয়াছিলাম, শুধু সৈনিকদেরই বুঝি তালে তালে হাঁটা দরকার।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জীব মাত্রেই সৈনিক। একজন হয়ত কামান-বন্দুক নিয়ে যুদ্ধ করে, আর একজন ঈশ্বরের নাম নিয়ে যুদ্ধ করে। শত্রুধ্বংশ উভয়েরই ব্রত। সৈনিককে যেমন তালে তালে মার্চ্চ কত্তে হয়, তালে তালে যুদ্ধ কত্তে হয়, তালে তালেই মর্‌তে হয়, যোগীকেও তেমন তালে তালে নাম কত্তে হয়, তালে তালে ইন্দ্রিয় বশীভূত কত্তে হয়, তালে তালে যোগবলে দেহ ত্যাগ কত্তে হয়। সৈনিকের তাল ব্যাণ্ডের বাজনার সঙ্গে, যোগীর তাল নামের ধ্বনির সঙ্গে।

গার্হস্থ্য জীবনে মিথ্যাচার ও পরানিষ্ট

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভদ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—সংসারী জীবনে আমরা অনেক সময়ই সত্যরক্ষা কত্তে পারি না, পরের অনিষ্টও ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় অনেক সময় কত্তে হয়। এর উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মিথ্যা বলার বা মিথ্যা ব্যবহার করার অভ্যাস জ'ন্মে গেলে একদিনে তাকে দূর করা শক্ত। তাই এই অভ্যাসকে দূর করার জন্ত দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা ক'রে যেতে হবে। চেষ্টার পূর্ণ সুফল না দেখা গেলেও, একটু একটু ক'রে ক্রমশঃ চেষ্টা ফলবতী হবেই। যাঁরা সাধন-ভজন-পরায়ণ, তাঁদের চেষ্টা একটু দ্রুত ফলবতী হয়। জগৎটার মধ্যে প্রত্যেক বস্তুই অস্থির চঞ্চল, আজ যে আছে কাল সে নেই, অনিত্যতাই সংসারের বৈশিষ্ট্য,—নিয়ত এরূপ চিন্তা কর্ল্লেও ধীরে ধীরে অসত্যাসক্তি ক'মে যেতে থাক্‌বে। আর, জগতের সকলেই আমার ভ্রাতাভগ্নী, আমার রক্তমাংস, এক জগন্মাতারই আমরা সন্তান,—নিয়ত এইরূপ চিন্তনের দ্বারা পরানিষ্টবুদ্ধি নাশ পায়।

বসন্তবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—এরূপভাবে চেষ্টা ক'রেও যদি কিছু না কিছু অসত্য ও পরানিষ্ট হ'য়ে যায়?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—স্বেচ্ছায় হ'তে দেবে না। অনিচ্ছায় হ'লে তার জন্য ভগবানের কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর্‌বে এবং সাধ্যমত ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে।

বসন্তবাবু।—কিরূপ ত্যাগ স্বীকার।

শ্রীশ্রীবাবা।—সৎপাত্রে প্রিয়বস্তু দান।

সত্য বড় না সাধন বড়?

বসন্তবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—সত্য বড় না সাধন বড়?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তার মানে?

বসন্তবাবু।—সত্য মিথ্যার বিচার বর্জ্জন ক'রে শুধু সাধন ক'রে গেলাম, এইটাতে মঙ্গল বেশী, না, সাধন-ভজনের ধার না ধে'রে শুধু সত্যপালন ক'রে গেলাম, এইটাতে মঙ্গল বেশী?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মঙ্গল দুটীতেই সমান। কিন্তু সত্যব্রত হ'য়ে যে সাধন করে, আর সাধন-নিষ্ঠ হ'য়ে যে সত্যপালন করে, পূর্ণ মঙ্গল তারই জন্য। সাধনহীন সত্যপালনকারী সব সময়ে প্রকৃত সত্যকে জান্‌তে পারে না, নিজের মনের সংস্কার অনুযায়ী সত্যাসত্য-নির্ণয় করে মাত্র। সত্যনিষ্ঠাহীন সাধনকারী সব সময় সাধনে ধৈর্য্য, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় বজায় রাখ্‌তে পারে না, তার সাধনের মধ্যেও দৈনন্দিন ফাঁকী এসে ঢুক্‌তে চায়। ফলে অসাধন সত্যকে করে পঙ্গু, অসত্য সাধনকে করে খঞ্জ। পঙ্গু কি গিরিলঙ্ঘন করে না? করে, কিন্তু যে পঙ্গু নয়, সে করে আগে। এই জন্যেই প্রত্যেক সাধকেরই সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সত্যপালনের চেষ্টা কর্ত্তব্য, প্রত্যেক সত্যানুরাগী ব্যক্তিরই সত্য-পালনের সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ-সাধন কর্ত্তব্য। সত্যনিষ্ঠা সাধননিষ্ঠাকে দৃঢ় করে, সাধননিষ্ঠা সত্যনিষ্ঠাকে দৃঢ় করে। সত্যপালন সাধন-পথের কণ্টকগুলি দূর করে, একাগ্র সাধন সত্যরক্ষার রুচি ও ক্ষমতা প্রদান করে।

সপত্নী-বিদ্বেষ বিদূরণের উপায়

গ্রামান্তর হইতে একটী ভদ্রলোক অ্যাসিয়াছেন। তাঁহার দুইটী বিবাহ। তিনি বিবাহিত জীবনের এক গুরুতর সমস্যায় পড়িয়া শ্রীশ্রীবাবার নিকটে সদুপদেশপ্রার্থী হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এক স্ত্রী থাক্‌তে পুনরায় পাণিগ্রহণ কর্‌তে গেলে কেন?

আগন্তুক।—বিবাহ স্বেচ্ছায় করি নি। প্রথমবার বিবাহের পরে স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িতা হন। তাঁকে দিয়ে সংসার-ধর্ম্ম চলা অসম্ভব দেখে আমার পিতা তাঁকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে আমার অমতেই আমাকে অন্য এক স্থানে বিবাহ দেন। কয়েক বছর হ'ল পিতা স্বর্গীয় হয়েছেন, প্রথমা স্ত্রীর স্বাস্থ্যও ইতিমধ্যে ভাল হ'য়েছে। এই স্ত্রীর বিরুদ্ধে পিতার বিরক্তির আর কোনও কারণ ছিল না। তাই আমি তাঁকে গৃহে নিয়ে এসেছি। কিন্তু দুইটী স্ত্রীর ভিতরে মোটেই বর্গ নেই, নিয়ত কলহে কাণ ঝালাপালা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীবাবা।—বৈষ্ণবদের দর্শনশাস্ত্র জানো? এক শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কোটি

ব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয় পুরুষ কেউ নেই। যত জীব, সব প্রকৃতি, সবাই তাঁরই প্রণয়-প্রার্থিনী। সবাই একই জনের প্রতি প্রেমাভিলাষিণী ব'লে একের প্রতি অপরের ঈর্ষ্যা নেই, বিদ্বেষ নেই, বরং আছে প্রাণভরা ভালবাসা, হৃদয়ঢালা সহানুভূতি। তোমার স্ত্রীদের ভিতরেও এই ভাবটীকে প্রবেশ করাও। পরস্পর পরস্পরের সপত্নী, এ ভাবটা দূর করান কঠিন হবে। কিন্তু উভয়েরই যে প্রকৃত স্বামী স্বয়ং শ্রীভগবান্, এই কথাটা তাঁদের মাথায় ঢুকান খুব কঠিন হবে না। ধারাবাহিক চেষ্টা চালালে ক্রমশঃ দেখ্‌বে যে, মেয়েদের তোমরা যত নির্ব্বোধ মনে কর, তারা ঠিক্ ততটা নির্ব্বোধ নয়। প্রথমা স্ত্রীকে ডেকে বল,—"এতদিন যার কাছে থেকে দূরে দূরে থাক্‌তে বাধ্য হ'য়েছিলে, আজ কাছে এসেছ ব'লেই সে তোমার অতিরিক্ত দাবীর কোনো জিনিষ হ'য়ে যায় নি।" দ্বিতীয় স্ত্রীকে ডেকে বল,—"এতদিন যাকে তোমার একার জিনিষ ব'লে মনে কত্তে অভ্যস্ত হ'য়ে আস্‌ছিলে, সে শুধু তোমার একারই জিনিষ নয়।" উভয়কে ডেকে বল,—"প্রকৃত প্রেম প্রেমাস্পদকে 'আমার' ব'লে দাবী করে না, নিজেকে 'তাঁর' ব'লে জ্ঞান করে।" নিজের দাবী-পূরণের ভিতরে নয়, নিজের দাবী-ত্যাগের ভিতরেই যে প্রেমাস্পদকে পাবার শ্রেষ্ঠ পথ, সেইটী উভয়কে সমযত্নে ধারাবাহিক প্রয়াসে বুঝাতে থাক।

পত্নী-বিশেষের প্রতি পক্ষপাতের প্রতীকার

আগন্তুক বলিলেন,—কিন্তু মুস্কিলের কথা এই যে, এই দু-জনের ভিতরে একজনের প্রতি আমি নিজেই অন্তরের একটা প্রবল পক্ষপাত অনুভব কচ্ছি।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সেটা কিছু আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয়। তোমার চাইতে ঢের শক্ত চরিত্রের অনেক লোকেরও এরূপ দুর্ব্বলতা দেখা গিয়েছে। কিন্তু পক্ষপাতের কাছে আত্ম-সমর্পণ করাই এর প্রতীকারের উপায় নয়। কোনো কোনো পৃথিবী-বিখ্যাত মহদ্‌ব্যক্তির জীবনেও এরূপ ঘটনা দেখা গিয়েছে যে, এক স্ত্রীর প্রতি প্রাণের অত্যধিক টান বশতঃ অপর স্ত্রীকে ত্যাগ কত্তে অভি-লাষী হয়েছেন, কিন্তু ত্যজ্যমানা স্ত্রী নিজের দাবী সপত্নীর অনুকূলে পরিত্যাগ

ক'রে সকলের শান্তি রক্ষা ক'রেছেন। এক্ষেত্রে স্ত্রীর মহত্ত্বটা খুবই অধিক, কিন্তু স্বামী একথা ব'লে দুঃখ কত্তে বাধ্য হয়েছেন যে,—তিনি ত' সকল পত্নীর প্রতি অন্নে, বস্ত্রে, প্রতিপালনে সমব্যবহারই কত্তে চান, কিন্তু মনের রুচির উপরে ত' তাঁর কোনো কর্ত্তৃত্ব নেই, অতএব তিনি নিরুপায়। তোমার ক্ষেত্রে সেই দৃষ্টান্ত অনুকরণীয় হবে না। অন্নদান, বস্ত্রদান, ভূষণাদি দান, সম্ভাষণ ও প্রতিপালন প্রভৃতি সর্ব্বব্যাপারে দুজনের প্রতি সমব্যবহার রক্ষা কর। আর দাম্পত্য-জীবনে দুজনের সঙ্গে সমভাবে পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ক'রে চল। একজন সম্পর্কেও সংযম-ব্রতের ইতর-বিশেষ কর্ব্বে না। তার পরে তিন জনে মিলে প্রত্যহ একই সঙ্গে ব'সে ভগবদুপাসনা কর। সংসারের সহস্র কর্ম্ম ফেলে-রেখেও প্রাতে, দুপুরে, সন্ধ্যায় আর শয়নকালে এই চারবার উপাসনায় ব'সে যাবে। দুই দিকে দুই স্ত্রীকে বসিয়ে মাঝখানে নিজে ব'সে সম্মুখে ইষ্টনাম স্থাপন ক'রে সাধনে লেগে যাবে। এক দিন, দু'দিন, তিন দিন ক'রে ক্রমশঃ দেখ্‌তে পাবে, সকলেরই আস্তে আস্তে আভ্যন্তরীণ রুচি ও প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন আস্‌ছে, সকলেরই সূক্ষ্ম আসক্তি সমূহের রূপান্তর এবং বদ্ধমূল কুসংস্কার সমূহের সুসংস্কার সাধিত হচ্ছে। এ ভাবে কাজ কত্তে কত্তে ক্রমশঃ দেখ্‌তে পাবে, তোমার মনের দারুণ পক্ষপাত ক্রমশঃ মুছে যাচ্ছে এবং তার বদলে উভয়ের প্রতি তোমার এমন একটা অতি প্রগাঢ় প্রেম উপজাত হচ্ছে, যার সহস্রাংশের একাংশও পূর্ব্বে কখনো আস্বাদন কর নি। দেখবে, স্বল্প-স্নেহ-লব্ধা স্ত্রী মনে মনে ভাব্‌তে সুরু করেছেন যে, না, সত্যই তুমি তাঁকে আগের চেয়ে শতগুণ বেশী ভালবাস। দেখ্‌বে, অতি-স্নেহ-গর্ব্বিতা স্ত্রী মনে মনে ভাবতে সুরু করেছেন যে, তোমার স্নেহের তিনিই একমাত্র অধিকারিণী হ'তে পারেন না, সপত্নীরও এর উপরে ন্যায্য দাবী রয়েছে। তখন ক্রমশঃ তোমাদের তিন জনের মধ্যে ভাবটা কতকটা মায়ের পেটের ভাই-বোনের মত গিয়ে দাঁড়াবে। দুইটী বোনের একটী ভাই থাকলে, তাদের মধ্যে যেমন ঈর্ষ্যা সহজেই কমে, আর একটী ভাইয়ের দুইটী বোন্ থাকলে যেমন বোন্‌দের মধ্যে একটীর প্রতি কোনো পক্ষপাত জন্মালে তা' সহজেই প্রশমিত হয়, ঠিক্ তেম্‌নি হবে।

আকুবপুর
১৫ই বৈশাখ, ১৩৩৮

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা আকুবপুর গ্রামে আসিয়াছেন। এই গ্রামে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীই শ্রীশ্রীবাবার প্রথম আশ্রিত সন্তান। প্রায় আট নয় বৎসর পূর্ব্বে সংসারিক দারিদ্র্যের প্রবল পেষণে ক্লিষ্ট হইয়া দুর্ভাগ্যের সহিত লড়াই দিতে সদ্যঃপিতৃহীন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার যখন নিতান্ত অনাদরে ও উপেক্ষায় স্থানান্তরে এক সম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে অতি কষ্টে স্বীয় বিধবা জননী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগ্নীর জন্য উদরান্ন অর্জ্জন করিতেছিলেন, তখন শ্রীশ্রীবাবা সেই গৃহে শুভাগমন করেন। বড়কর্ত্তা, মেজকর্ত্তা, ছোটকর্ত্তাদের ভিড়ে শ্রীশ্রীবাবার সম্মুখে আগমনের সুযোগ না পাইয়া শ্রীশ্রীবাবার মধ্যাহ্নিক ব্রহ্মার্পণের অন্নথালিকা পরিবেশন করিবার কালে ছলছল নেত্রে কৃপাভিখারী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার অনুযোগ দিলেন,—পিতৃহীন অনাথ নিরাশ্রয় দীনদুঃখীর প্রতি সকলেই কি বিরূপ? শ্রীশ্রীবাবা হাসিলেন এবং ঐ দিবসই রাত্রিকালে সকলে নিদ্রিত হইলে তারকা-খচিত ত্রয়োদশীর নিস্তব্ধ নিশীথে দূর্ব্বাদলাসনে বসিয়া শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমারকে সাধন প্রদান করিয়া চিরতরে আপনার করিয়া লইলেন। ইহার পর হইতে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমারকে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার অধিকাংশ প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর বলিয়া কার্য্যতঃ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবার পদধূলিপ্রদানের সংবাদ-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামস্থ অনুরাগী যুবক-যুবতীগণ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমারের গৃহে সমাগত হইলেন। মহিলারা সকলেই প্রণাম করিয়াই বিদায় লইলেন, যেহেতু তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদানের জন্য দ্বিপ্রহরের পরই সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ছেলেরা কেহ কেহ প্রশ্ন করিলেন, শ্রীশ্রীবাবা উত্তর দিতে লাগিলেন। কাহাকে কাহাকে শ্রীশ্রীবাবা বিনা প্রশ্নেই উপদেশাদি প্রদান করিতে লাগিলেন।

অন্তর্য্যামী হইবার পথ

যাহাদিগকে শ্রীশ্রীবাবা বিনা প্রশ্নেই উপদেশ দিতেছিলেন, দৈবযোগে তাহাদের মনের মধ্যে ঐ জাতীয় প্রশ্ন সমূহই সঞ্চিত ছিল, শুধু সঙ্কোচ বশতঃ

প্রকাশ্যভাবে প্রশ্নগুলি উপস্থাপিত হইতেছিল না। জিজ্ঞাসুর মনোগত প্রশ্নে আর উপদেষ্টার স্বতঃস্ফূরিত বাক্যে এই সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত রাধাচরণ দাস জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি অন্তর্য্যামী ?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—অন্তর্য্যামী বাবা তুমিও। নিজের অন্তরটা যে ভগবানের পায়ে ফেলে দেয়, ভগবানের পায়ের লাথি খেয়ে তার অন্তরে সবার অন্তরের কথাই জাগে। তবে, তোমাদের জানা উচিত যে, আমার কোনও অলৌকিক শক্তি নেই। তাঁর ইচ্ছায় যদি কদাচিৎ আমার কথায় তোমাদের মনোগত প্রশ্নেরই জবাব আপনি হয়ে গিয়ে থাকে, তবে তার সব দোষগুণের জন্য দায়ী পরমাত্মা।

বিবাহিত জীবনে কুশল লাভের পন্থা

অপর একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিবাহিত জীবনে কুশল লাভের পন্থা কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দাম্পত্য জীবনের প্রত্যেকটী অবস্থায় শ্রীভগবানের পবিত্র নাম স্মরণ রাখ, তা'হ'লেই কুশল আপনি এসে যাবে। পাপ-পুণ্য, ভালমন্দ, শুভাশুভ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার ক'রে সেই বিভ্রাটে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হওয়ার চেয়ে নিজের প্রকৃতি যখন যেমন চায়, ভগবানকে মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত না হ'য়ে, সেইমত কাজ ক'রে যাও। এই হচ্ছে সর্ব্বাঙ্গীন কুশল লাভের পথ।

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন তুলিলেন,—আমার প্রকৃতি যদি ভোগপরায়ণ হ'য়ে থাকে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নির্ভয়ে ভোগ কর এবং ভোগের প্রত্যেক স্তরে, প্রত্যেক তরঙ্গে, প্রত্যেক অভিব্যক্তিতে অফুরন্তভাবে পরমাত্মার নাম চালাতে থাক। কামও চলুক, নামও চলুক, পরিণামে নামই জয়যুক্ত হবে। জোর ক'রে ত্যাগের চাইতে প্রকৃতির দাবী পূরণার্থে ভোগ করা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জল-প্রপাতের ধারার মত অফুরন্ত নামের সাধনা ক'রে যাওয়াই হচ্ছে ভোগ-বাসনাকে সংযত করার সহজতর পন্থা। কারণ, নামের গুণে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন আপনি আস্‌বে, রুচিরও বদল হবে, লালসারও বেগ হ্রাস পাবে।

জিজ্ঞাসু পুনরায় প্রশ্ন তুলিলেন,—তাহ'লে সন্ন্যাসীরা যে কঠোর তপস্যা ক'রে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করেন, সেটা কি ভুল ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—না। কিন্তু গৃহীর আচার-নিয়ম আর সন্ন্যাসীর আচার-নিয়ম সর্ব্বত্র এক হ'তে পারে না।

কামুকী পত্নীকে সংযমিণী করিবার পথ কি ?

একজন প্রশ্ন করিলেন,—কামপরায়ণা পত্নীকে সংযমী কর্‌বার পথ কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিজে সংযমী হ'লে স্ত্রীকে সংযমী করা কি খুব শক্ত ? নিজের অন্তরের ভিতরে আগে সংযমকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর, তোমার সঙ্গই তোমার সহধর্ম্মিণীকে স্থূল লালসার প্রতি উদাসীন ক'রে তুল্‌বে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এমন সব মহীয়সী মহিলার জীবন-কাহিনী শুনাও, যাঁরা নিজ নিজ জীবনে সংযমের পরাকাষ্ঠাকে লাভ করেছিলেন। মীরাবাঈ রাজমহিষী হ'য়েও "রণ্‌ছোড়্‌জীর" (শ্রীকৃষ্ণের) প্রেমে এমনি ম'জে গেলেন যে, দেহের সুখ-লালসা বা স্থূল ইন্দ্রিয়ের ভোগকামনা তাঁর মনের সহস্র-যোজন-মধ্যেও এসে দাঁড়াতে পার্‌ল না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্ম্মিণী সারদামণি দেবী এমন নিষ্কাম, নিঃস্পৃহ, নিস্তরঙ্গ অন্তঃকরণ লাভ করেছিলেন যে, ছয় মাস একাদিক্রমে স্বামীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন কর্ল্লে'ন, কিন্তু একটী রজনীর তরেও স্বামীকে ভোগের পথে টেনে আন্‌তে চেষ্টা কর্ল্লে'ন না। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে ব'লে গেছেন যে, সারদা দেবী তাঁকে যদি আক্রমণ কত্তেন, তবে তাঁকে আর একাকী নিজের বলে সংযমী থাকৃতে হ'ত না, কামের বন্যায় সব জিতেন্দ্রিয়ত্ব ভেসে যেত। বরিশালের অশ্বিনী দত্ত তাঁর স্ত্রীকে একদিন ডেকে বল্লেন,—"আজ থেকে তোমার আর আমার মধ্যে দেহের সম্পর্ক কিছু থাকৃবে না।" নির্ব্বিকার চিত্তে স্ত্রী এই ব্রত গ্রহণ কল্লেন, সুদীর্ঘ-জীবন-ব্যাপী এই ব্রত পালন কর্ল্লে'ন, মৃত্যু পর্য্যন্ত ব্রতের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখ্‌লেন। প্রবর্ত্তক আশ্রমের মতিলাল রায় এক সন্ন্যাসীর কাছে ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত গ্রহণ ক'রে এসে স্ত্রী রাধারাণী দেবীকে সে বিষয় জানালেন। রাধারাণী এতে খুশী হলেন না, সংসারী জীবনের ভোগাধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার কোনো প্রয়োজন তাঁর স্বীকার কত্তে ইচ্ছা হ'ল

না। স্বামী কিন্তু লেগে গেলেন স্ত্রীকে বুঝাতে। দিনের পর দিন অক্লান্ত শ্রমে মতিবাবু স্ত্রীর মনে ব্রহ্মচর্য্যের স্পৃহা জাগিয়ে তুল্‌লেন। দেখ্‌তে না দেখ্‌তে চিরকালের ভোগসঙ্গিনী তাঁর এক তপস্তেজোদীপ্তা মহীয়সী ব্রহ্মচারিণীতে পরিণত হ'লেন। মতিবাবু তাঁর জীবন-কাহিনীতে লিখেছেন,—কিছুদিন পরে কিন্তু স্বয়ং স্বামীর মনেই ভোগের প্রবল লিপ্সা জাগ্রত হ'য়ে উঠ্‌ল। ধূর্ত্ত কাম নিশাচর শৃগালের মত অন্ধকারে তাঁর ব্রহ্মচর্য্যব্রতের মাটির ভিত্ খুঁড়ে গর্ত্ত কত্তে লাগ্‌ল, স্ত্রীকে তিনি কত বুঝাতে লাগ্‌লেন, "নিদ্রাবিকারে কষ্ট পাচ্ছি, পরিমিত সম্ভোগে এ রোগ কমে যাবে।" স্ত্রী বল্লেন,—"সে কি হয়? ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত একবার গ্রহণ ক'রে সে কি আর ত্যাগ করা যায়? সাধন-ভজনের মাত্রা বাড়িয়ে দাও, স্বপ্নস্খলন আপনি কমে যাবে।" তার ফল হ'ল কি? না, মতিবাবু আজ বাংলার একজন অন্যতম প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য ও যোগোপদেষ্টা। মহাত্মা গান্ধী বিয়ে করেছিলেন নিতান্ত বাল্য বয়সে। জীবনীগ্রন্থে লিখেছেন,—নিতান্ত কচি বয়স থেকেই তিনি স্ত্রীসঙ্গ আরম্ভ ক'রেছিলেন। যৌবনের মধ্যভাগে তিনি ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত গ্রহণ কর্ল্লেন। যে স্ত্রী কখনো ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে কোনো শিক্ষা পান নাই, তাঁকে তিনি ব্রহ্মচর্য্যের মহিমার কথা শুনালেন। বিনা বাক্যব্যয়ে দেবী কস্তুরীবাঈ স্বামীর ঈপ্সিত ব্রত গ্রহণ কর্ল্লেন, জীবনে একটী দিনের তরেও স্বামীকে কোনও বাক্যের দ্বারা বা ব্যবহারের দ্বারা চঞ্চল কত্তে চেষ্টা তিনি করেন নি। এরই ফলে আজ কস্তুরীবাঈ সমগ্র ভারতের জননী-স্বরূপিণী, আর মহাত্মা গান্ধী সমগ্র জগতের পূজ্য। এসব কাহিনী শুন্‌লে উদ্দাম অসংযমী নারীরও চিত্তে সংযমের একটা স্পৃহা আপনি জেগে উঠ্‌বে। তারপরে চাই ভগবৎ-সাধন। একাগ্র সাধনে ক্রমে মনের সব চঞ্চলতা আপনি প্রশমিত হয়।

বিবাহিত জীবনে আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য্য

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিবাহিত জীবনে আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সকলের পক্ষে সে প্রয়োজন নেই। আমৃত্যু সংযম

দু'-চার জন গৃহীর পক্ষেই প্রয়োজন হয়। কিন্তু এক একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালনের প্রয়োজন, প্রত্যেক দম্পতীর। তিন বৎসর, ছয় বৎসর বা দ্বাদশ বৎসর কাল যদি কোন দম্পতী একত্র অতি ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থান ক'রেও পূর্ণ ব্রহ্মচারী থাকতে পারেন, তাহ'লে ব্রতকাল পূর্ণ হবার পরে যখন তাঁরা দৈহিক সম্ভোগে রত হন, তখন সে সম্ভোগের ভিতরে লালসার স্থান থাকে না, থাকে শুধু কর্ত্তব্যবোধ ও জগৎকল্যাণেচ্ছা। যাতে বহু বিবাহিত নরনারীর জীবনে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সংযম-ব্রত-পালনের রুচি ও উৎসাহ আসে, তার জন্যে দু'-একজন দুর্লভ নরনারীর আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রয়োজন আছে। অবশ্য সেই উদ্দেশ্যেই তাঁরা ব্রত গ্রহণ করেন না, তাঁরা যাঁর যাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই ব্রত গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁদের এই সংযম-চর্য্যার ফলে অপরের ভিতরে উৎসাহ উদ্দীপিত হয়। কেউ বা তাঁদের দে'খে, কেউ বা তাঁদের কথা শুনে নিজ নিজ জীবনে সাময়িক ব্রহ্মচর্য্য পালনে অগ্রসর হয়। বিলাতের একজন মনীষী ব্যক্তি সস্ত্রীক সম্ভোগ বর্জ্জন করেছেন, পরস্পরের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে যে গভীর প্রেম ছিল, তাকে চিরকাল অটুট রাখ্‌বার জন্য, কারণ, তিনি বুঝেছেন, দৈহিক সম্পর্ক প্রাণের সম্পর্ককে শিথিল করে। শ্রীরামকৃষ্ণ স্ত্রীসম্ভোগ-লালসা বর্জ্জন কর্ল্লেন, জগন্মাতাকে লাভ করার জন্য, যেহেতু ব্রহ্মচর্য্যের মধ্য দিয়ে তাঁকে দ্রুত পাওয়া যায়; আর সারদামণি দেবী স্বামি-সহবাস-স্পৃহা বর্জ্জন কর্ল্লেন স্বামীর ইচ্ছাকে পালন করার জন্য। অশ্বিনীবাবু স্ত্রী-সঙ্গ বর্জ্জন কর্ল্লেন দেশ-মাতৃকার সেবার সামর্থ্য সঞ্চয়ের জন্য, মতিবাবু স্ত্রীসঙ্গ-বর্জ্জন কর্ল্লেন নিজের ভিতরে তপস্যার শক্তিকে জাগিয়ে তোল্‌বার জন্য, আর তাঁদের পুণ্যশ্লোকা সহধর্ম্মিণীরা স্বামি-সহবাসের আকাঙ্ক্ষা চিরতরে পরিত্যাগ কর্ল্লেন নিজ নিজ স্বামীর ভিতরে দেশপ্রেম ও ব্রহ্মবীর্য্যকে অটুট ক'রে রাখ্‌বার জন্য। মহাত্মা গান্ধী ব্রহ্মচর্য্যকে গ্রহণ কর্ল্লেন জীবনটাকে পূর্ণ সত্যের ভিতরে গ'ড়ে তোল্‌বার জন্য, যেহেতু দৃঢ় ব্রহ্মচর্য্যই দৃঢ় সত্যনিষ্ঠার জনক; আর, তাঁর পত্নী নিজ স্বামীকে সত্যব্রতে পূর্ণসিদ্ধি অর্জ্জনে সাহায্য কর্ব্বার জন্য যোগিনী সাজ্‌লেন। যিনি যে উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করুন, তাঁদের এই ব্যক্তিগত সাধনা ও তার ফল

সমগ্র দেশের, জাতির এবং জগতের সম্পদ হ'য়ে রইল। এই সম্পদ অনেক দুর্ব্বলকে বল দেবে, অনেক অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস দেবে, অনেক ভীরুকে সাহস যোগাবে।

নির্দ্দিষ্টকাল সংযম-পালনের পরে সহবাস

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—আবার ফিরে সহবাসই যদি কত্তে হ'ল, তবে আর মাঝখান থেকে কয়েকটা বছর সংযম-পালনে লাভ কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সহবাসের ভিতর থেকে ছাগলের গায়ের গন্ধটা দূর কর্ব্বার জন্যে। গঙ্গার ঘোলা জল কলসীতে পূরে রেখে দিলে কিছুকাল পরে সব ধূলাবালি নীচে প'ড়ে যায়, জল সুপেয় হয়।

দীক্ষা ও শিক্ষা

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দীক্ষা" আর "শিক্ষা" এই দুটো কথা আমরা অহরহ শুন্‌তে পাই। জিনিষ দুটো কি এবং তাদের তফাৎই বা কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দীক্ষা পাওয়ার মানে, কি কত্তে হবে, সেইটী পাওয়া। আর শিক্ষা পাওয়ার মানে, কেন কত্তে হবে, সেইটী জানা। দীক্ষা দেয় ধর্ম্ম-জীবনের programme বা সাধন, আর শিক্ষা দেয় ধর্ম্মমতের philosophy বা দর্শনশাস্ত্র। দীক্ষায় লভ্য তপস্যার পন্থা, শিক্ষায় লভ্য তপস্যার রুচি। দীক্ষার ফল পথে নামা, শিক্ষার ফল দ্রুত গমন।

দীক্ষা-গুরু ও শিক্ষা-গুরু

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—'দীক্ষা-গুরু' আর 'শিক্ষা-গুরু' শব্দ দুইটার মানে কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জীবনের পরম পথের সন্ধান যিনি ব'লে দেন, তিনি হ'লেন দীক্ষা-গুরু; এই পথের শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়ে নানা যুক্তি-বিচার-বিতর্কাদি সহকারে যিনি সাধককে সাধন বিষয়ে অহরহ উৎসাহ যোগান, তিনি হলেন শিক্ষা-গুরু। দীক্ষা-গুরু মানে পরমবস্তুর দাতা, শিক্ষাগুরু মানে পরমবস্তুর প্রতি নিজ বাক্য ও আচরণের দ্বারা অনুরাগবর্দ্ধনকারী। যাঁর উপদেশ বা নিজ জীবনের ধর্ম্মানুশীলনের দৃষ্টান্ত তোমাকে দীক্ষাপ্রাপ্ত সাধনে অত্যন্ত উৎসাহ—

সম্পন্ন, রুচিবান ও অনুরাগী করে, তাঁকে বলে শিক্ষাগুরু। ভক্তিমান্ শিষ্যের চক্ষে দীক্ষা-গুরু স্বয়ং পরমাত্মার প্রতীক স্বরূপ, আর শিক্ষা-গুরু দীক্ষাগুরুতে নিষ্ঠার বর্দ্ধক পরমহিতৈষী বান্ধব।

শিক্ষা-গুরুর নিকটও কি মন্ত্রাদি গ্রহণীয় ?

প্রশ্নকর্ত্তা।—শিক্ষা-গুরুর নিকটেও কি মন্ত্রাদি গ্রহণীয় ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তার প্রয়োজন ? দীক্ষা-গুরু যা দিয়ে গেলেন, তার কাজ ক'রেই জীবনে কুলোয় না, আবার তুমি যাবে শিক্ষা-গুরুর কাছে আর একটা মন্ত্র নিতে ? এর মত মারাত্মক ব্যাপার কি আর কিছু আছে ? আর, দীক্ষা-গুরু শুধু একজনই হ'তে পারেন। যাঁর পায়ে সর্ব্বস্ব তুমি নির্ভয়ে বিকিয়ে দিতে পার, তিনিই তোমার দীক্ষা-গুরু বা গুরু। শিক্ষা-গুরু একজন, দশ জন, শত জন বা সহস্র জনও হ'তে পারেন। যিনি তাঁর দৃষ্টি, বাক্য বা কর্ম্মের দ্বারা, স্নেহ, উপদেশ বা দৃষ্টান্তের দ্বারা তোমার চিত্তকে সর্ব্বসন্তাপহারী গুরুর পাদ-পদ্মের প্রতি আকৃষ্ট করার সাহায্য কত্তে পারেন, তিনিই তোমার শিক্ষাগুরু বা উপগুরু। যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ, নিত্যচৈতন্যময়, পরমানন্দবিগ্রহস্বরূপ অতুলন পুরুষ, তিনি হ'তে পারেন দীক্ষা-গুরু। সাধনের অবস্থাভেদে উচ্চনীচ সর্ব্বাবস্থাসম্পন্ন যে কোনও সাধক পুরুষ হ'তে পারেন তোমার শিক্ষাগুরু। যেখানে শিক্ষাগুরুর আর দীক্ষা-গুরুর উপদেশের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনে তুমি অশক্ত, সেখানে সর্ব্বতোভাবে দীক্ষা-গুরুই প্রামাণ্য, শিক্ষা-গুরু অপ্রামাণ্য। দীক্ষা-গুরু বেদস্বরূপ, শিক্ষা-গুরু স্মৃতিস্বরূপ, জ্ঞানী শিক্ষা-গুরু মনুসংহিতাস্বরূপ, স্বল্পজ্ঞানী শিক্ষা-গুরু অর্ব্বাচীন সংহিতা স্বরূপ। অন্য সংহিতার সহিত মতভেদে মনুস্মৃতি প্রামাণ্য। স্মৃতি ও বেদে বিরোধ-স্থলে বেদবাক্যই প্রামাণ্য।

পুনর্ম্মন্ত্রদায়ী শিক্ষা-গুরুর আবির্ভাবের ঐতিহ্য

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমাদের অঞ্চলে এক শ্রেণীর গুরু আছেন, যাঁরা নিজেদিগকে শিক্ষা-গুরু নামে পরিচিত করেন এবং শিষ্যদের কাণে নূতন মন্ত্র উচ্চারণ করেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এঁদের আবির্ভাব হ'য়েছে বৈষ্ণবধর্ম্মের বহুল প্রচারের

পর থেকে। এক এক জন বৈষ্ণব মহাপুরুষ কীর্ত্তন ও উৎসবাদির দ্বারা ধর্ম্ম-প্রচার ক'রে এক এক অঞ্চলে দৈনিক হয়ত শত শত শিষ্যকে দীক্ষামন্ত্র দান ক'রে যেতেন। কৃষ্ণমন্ত্র শিষ্যদের দান করা হ'ল সত্য, কিন্তু পূর্ব্ব থেকে শিষ্যদের ভিতরে সাধন-তত্ত্বের রসাদি সম্বন্ধে উপযুক্ত উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান করা ত' আর হয় নি! এখনো দেখ্‌তে পাবে, এক একটা মহোৎসব উপলক্ষে আধুনিক মহাপুরুষেরা দৈনিক শত সহস্র ক'রে অদীক্ষিত লোককে দীক্ষা দিচ্ছেন।, এত লোককে সাধন-সম্পর্কে সমগ্র দার্শনিক তত্ত্বটা শিক্ষা দেবার অবসর দীক্ষাদাতার পক্ষে হ'য়ে ওঠা অসম্ভব। সুতরাং তিনি তাঁর নিজ শিষ্যদের মধ্যেই এক এক জনকে নির্ব্বাচিত ক'রে এক এক কেন্দ্রের শিক্ষাদাতারূপে রেখে গেলেন। কালক্রমে গুরুগিরির লোভ এ সব শিক্ষাদাতাদের মধ্যে প্রবেশ কত্তে আরম্ভ কল্ল'। গুরু দিয়ে গেছেন এক কর্ণে ফুৎকার, তখন শিক্ষক বাকী কর্ণটাকে আর এক ফুৎকারে অধিকার কল্লে'ন। অজ্ঞ জনসাধারণকে ভুলান ত' পণ্ডিত লোকদের পক্ষে কঠিন কাজ নয় বাপধন! তাই, শিষ্যকে যাতে অমুক গুরুর বা তমুক গুরুর তামাক সাজ্‌তে সাজ্‌তে দুল্ল'ভ মানব-জন্ম বৃথা কাটিয়ে দিতে না হয়, তার জন্য দীক্ষাদাতার গুরুরই প্রয়োজন পূর্ব্ব থেকেই শিষ্যের হৃদয়কে যথা-সম্ভব রসমধুর ক'রে তুলে তাতে আনন্দময় নাম-দীক্ষা ঢেলে দেওয়া। এ কাজটা হচ্ছে যেন জমি ভাল ক'রে চাষ ক'রে, তারপরে বীজ বোনা। আর, দীক্ষা দিয়ে তারপরে বাকীটুকু শিক্ষাগুরুর উপরে অর্পণ করা হচ্ছে যেন, বীজ বুনে জমি চাষ করা, আগাছা বাছা,—এই চাষে অনেক সময়ে আসল বীজ চাষের ঠেলায়ই পঞ্চত্ব পায়, অথবা আগাছা বাছ্‌তে গিয়ে আসল গাছ উপড়ে ফেলা হয়। বৈদিক যুগের গুরু এই নিকৃষ্ট পন্থাকে গ্রহণীয় মনে করেন নি।

বৈদিক দীক্ষিতের তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ ও তদ্বিপরীত (vice-versa)

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শিক্ষাগুরু যে ধর্ম্মজীবনে অতি প্রধান স্থান গ্রহণ ক'রে বসলেন, তার অন্য কারণও আছে। দীক্ষাদাতা যেখানে নিস্তেজ,

নির্বীর্য্য, সেখানে শিক্ষাদাতা এসে দীক্ষাদাতার স্থান গ্রহণ কর্বেন না? অধিকাংশ মানব-মানবীই একজনকে জীবন-তরণীর কাণ্ডারীরূপে গ্রহণ না ক'রে ভব-সমুদ্র পাড়ি দিতে ভয় পায়। দীক্ষাগুরু যদি নিজ যোগ্যতায় সে আসন দখল ক'রে রাখ্‌তে না পারেন, শিক্ষাগুরুকে সে আসন প্রদান করাই ত' কর্ত্তব্য হবে। নইলে এ বেচারীদের উপায় কি? বৈদিক সাবিত্রী দীক্ষার পরেও লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণসন্তান আবার তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ কচ্ছে। তার কারণ এই যে, বর্ত্তমান কালের গায়ত্রীর দীক্ষাদাতা নিজ তপস্যার শক্তিতে দীন, তাঁর দেওয়া সাধন যতই অব্যর্থ হোক্, শিষ্য তা' গ্রহণ ক'রে তৃপ্তি পায় না। তাই দু'দিন পরে তান্ত্রিক দীক্ষা পুনরায় একটা নেয়। আবার কায়স্থ-শূদ্রাদিবর্ণ, যারা বৈদিক গায়ত্রী দীক্ষায় এতদিন অনভ্যস্ত ব'লে অবাধে তান্ত্রিক দীক্ষা পেয়ে আসৃছে,—দীক্ষাদাতাদের জীবনে পূর্ণতার প্রভা দেখ্‌তে পাচ্ছে না ব'লে তান্ত্রিক দীক্ষা লাভ করার পরেও পুনরায় যজ্ঞোপবীত ধারণ ক'রে গায়ত্রী মন্ত্রে বৈদিক দীক্ষা গ্রহণ কচ্ছে। গুরু নাই, তাই শিষ্যের এ দুর্গতি। নইলে, বৈদিক দীক্ষার পরে পুনরায় তান্ত্রিক দীক্ষা যেমন নিস্প্রয়োজন, তান্ত্রিক দীক্ষার পরেও পুনরায় বৈদিক দীক্ষা তেমন নিস্প্রয়োজন।

প্রবল কামচিন্তার পর ইচ্ছাপূর্ব্বক বীর্য্যপাত

এই সময়ে প্রসঙ্গান্তর উঠিল। একজন পল্লীবাসী অশিক্ষিত ব্যক্তি বলিলেন,—অমুক গ্রাম হইতে শিক্ষার গোঁসাই এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, প্রবল কাম-চিন্তা উপস্থিত হইলে রক্ত হইতে বীর্য্য পৃথক্ হইয়া যায়ই, সুতরাং তখন সেই অশোধিত বীর্য্যকে শরীর হইতে পাত করাই উচিত। এই বিষয়ে আপনার উপদেশ কি?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—এটা সংযমীর মুখের উপদেশ নয়, সুতরাং প্রতিপালনের যোগ্যও নয়। প্রবল কেন, সামান্য কাম-চিন্তাতেও রক্ত থেকে বীর্য্য পৃথক্ হ'য়ে যায়। সেই বীর্য্যকে শরীর থেকে বের ক'রে দেবার জন্য বাবা তোমার কেন অত মাথাব্যথা? মলমূত্রকে যিনি হিসাব-মত শরীর থেকে বের ক'রে দিচ্ছেন, তার উপরে ভার দিয়ে তুমি নামে ডুবে

যাও। নামের বলে রক্ত থেকে পৃথক্ করা বীর্য্যেরও কতকটা তোমার রক্তে আবার ফিরে আস্‌বে। ক্রমে কামভাবও কমে যাবে, দেহ-মনও স্থির হবে।

গৃহস্থ দম্পতীর সংযমব্রত গ্রহণান্তে স্মরণীয়

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা এই গ্রামের জনৈক আশ্রিত ও তাঁহার স্ত্রীকে এক বৎসরের জন্য সংযমের ব্রতে দীক্ষা দিয়া উপদেশ দিলেন,—ব্রত গ্রহণ ক'রেই বাছারা মনে করো না, কেল্লা ফতে ক'রে দিয়েছ। ব্রতকাল পর্য্যন্ত পূর্ণ সংযম তোমরা রক্ষা কর্ব্বেই, এই সঙ্কল্প যেন নিমেষের জন্যও শিথিল না হয়। একা নিজের শক্তিতে কেউ পূর্ণ সংযম রক্ষা কত্তে পারে না, চাই তাঁর নামের বল, তাঁর কৃপা। তাঁর নাম মুহূর্ত্তের তরেও বিস্মৃত হয়ো না। রিপু যদি চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, নামের সেবা তখন বেশী জিদ্ নিয়ে করবে। অতীতে পরস্পর যে সব দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছ, সেগুলিকে স্বপ্নের মত অলীক, অসার, অবাস্তব, অসত্য ব'লে মনে কর্ব্বে, একবারও তাদের ছবি মনের কাছে আস্‌তে দেবে না। মনে মনে ভাব্‌বে, ব্রত-গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তোমাদের যেন কোনো পরিচয়ই ছিল না, আজই যেন নূতন দেখা হ'ল, বিশ্বাস কর্ব্বে আজই তোমাদের যথার্থ বিবাহ হ'ল। কায়মনোবাক্যে ব্রতপালনের মধ্যদিয়েই তোমাদের বিবাহিত জীবনের পূর্ণতা, এই বিশ্বাস তোমাদের সুদৃঢ় হোক্।

দ্বিপ্রহরের রৌদ্রতাপ কমিয়া আসিলে শ্রীশ্রীবাবা কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে সাতমূড়া গ্রামের দিকে রওনা হইলেন।

সাতমূড়া, ত্রিপুরা
১৬ই বৈশাখ, ১৩৩৮

ভক্তরাজ ধরণীধর পাল

প্রায় ষাট বৎসর হইল এই গ্রামের স্বর্গীয় রামকানাই পাল নিজ গৃহে কালীমাতার আসন স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ধরণীধর পাল সস্ত্রীক এই বিগ্রহের সেবা-পূজাদি করিয়া আসিতেছেন। ধরণীবাবুর বয়স বর্ত্তমানে বাইট বৎসরের কম হইবে না। শ্রীশ্রীবাবা ধরণীবাবুর একান্ত

আগ্রহ ও সাদর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সাতমূড়াতে শুভাগমন করিয়াছেন। গত রাত্রি ভক্তির প্রসঙ্গেই অধিকাংশ সময় অতীত হইয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা ধরণীবাবুকে ভক্তরাজ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ধরণীবাবু ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণা সহধর্ম্মিণী প্রাণপণ যত্নে শ্রীশ্রীবাবার সেবা-যত্নাদি করিতেছেন।

ধরণীবাবু বহু সহস্র ধর্ম্ম-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মাতৃভাবের গানই অধিক। এই সব গান গাহিবার জন্য জগন্মাতা তাঁহাকে একটী গায়ক জুটাইয়া দিয়াছেন। নাম তার মেওয়ার চাঁদ। মেওয়ার চাঁদ জাতিতে মুসলমান, ধরণীবাবুর স্পর্শ তাহাকে মাতৃসাধনায় নবজন্ম দান করিয়াছে। সারেঙ্গী বাজাইয়া প্রাণমাতান স্বরে মেওয়ার চাঁদ যখন সুমধুর মাতৃসঙ্গীত গাহিতে থাকেন, তখন মর্ত্ত্য যেন স্বর্গ ভূমিতে পরিণত হয়।

সুবল-প্রিয়া বৈষ্ণবী

নানা সৎকথার প্রসঙ্গে এই গ্রামের একটী বৈষ্ণবী সাধিকার জীবন-কথা উঠিল। তাঁহার নাম ছিল সুবলপ্রিয়া। রামায়ণ গান করিয়া তিনি জীবিকা-অর্জ্জন করিতেন। বৈষ্ণবের কন্যা, বৈষ্ণবমতেই দীক্ষিতা; রামায়ণ গান করিতে করিতে তাঁহার চিত্তে রাম-প্রেমরস সঞ্জাত হইল, আদিকবি বাল্মিকীরই ন্যায় এই অশিক্ষিতা নিরক্ষরা বৈষ্ণবীর মধ্যে অত্যদ্ভুত কবিত্ব-শক্তির প্রস্ফুরণ ঘটিল। দেখিতে না দেখিতে এক বিরাট রামায়ণের দল গড়িয়া উঠিল, সুবল-প্রিয়া নানা স্থানে রামনামের মহিমা ও রামলীলার মাধুর্য্য প্রচার করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় সুবলপ্রিয়ার রচিত সঙ্গীতনিচয়, যাহা আসরে নামিয়া যখন তখন রচিত হইত এবং শত সহস্র শ্রোতার চিত্তবিনোদন ও ভাবসঞ্চার করিত, তাহা কেহ লিখিয়া রাখে নাই। ফলে, সুবল-প্রিয়ার দেহ-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সেই সব অমূল্যনিধি চিরতরে বিস্মৃত হইয়াছে। সুবল-প্রিয়া সাতমূড়া গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্ভবতঃ এই গ্রামেই দেহত্যাগ করেন।

সুবলপ্রিয়ার সতীত্ব-রক্ষায় ঐশী শক্তির বিকাশ

যতদিন সুবলপ্রিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া কণ্ঠস্থ করা অপরের রচিত রামলীলার

গান গাহিয়া দুয়ারে-দুয়ারে ভিক্ষা কুড়াইয়া বেড়াইতেন, ততদিন তাঁহাকে সাধারণ বৈষ্ণবী জ্ঞানেই কেহ লোভনীয় মনে করিত না। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের রাতুল চরণে শ্রদ্ধা-ভক্তির সঞ্চার হওয়ার পর হইতে এই মধ্যম-বর্ণা অসুন্দরী বৈষ্ণবীর দেহে এক অপার্থিব রূপের বিকাশ ঘটিল। কবিত্ব-শক্তির প্রস্ফুটনের সঙ্গে সঙ্গে ত' রামায়ণের দলই গড়িয়া উঠিল এবং সুবলপ্রিয়া নানা স্থানে দলসহ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময়ে এক লম্পট ব্যক্তির লুব্ধদৃষ্টি সুবলপ্রিয়ার উপরে পতিত হইল। সাধারণ নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণবীদের, বিশেষতঃ যে সব রমণী গানের দল করিয়া দেশদেশান্তর ভ্রমণ করে, তাহাদের প্রতি এতদ্দেশীয় সাধারণ লোকের চারিত্রিক শ্রদ্ধা অতিশয় অল্প। অনেকেই ইহাদিগকে বারনারীর প্রকারভেদ বলিয়া মনে করে। ফলে কামার্ত্ত ব্যক্তি একদিন হট্টগোল-বর্জ্জিত নিরিবিলি স্থানে বসিয়া সুবলপ্রিয়ার গান শুনিবার নাম করিয়া নিজগৃহে আনয়ন করিয়া সুকৌশলে তাঁহার সঙ্গীয় মৃদঙ্গ-বাদক প্রভৃতিকে অন্যত্র সরাইয়া নিজ মনোগত পাপবাসনা পরিতৃপ্তির প্রস্তাব করিল। সুবলপ্রিয়া এই জঘন্য বাক্য শ্রবণ করিয়া ঘৃণাভরে কক্ষ পরিত্যাগে উদ্যতা হইলে দুর্ব্বৃত্ত পথরোধ করিয়া বৈষ্ণবীর অঙ্গস্পর্শে উদ্যত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া বৈষ্ণবী আর্ত্তকণ্ঠে "জয়রাম, জয়রাম" বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আরাধ্য দেবতার সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সহসা বিশ্বাসঘাতক কাম-পিশাচ দুর্ব্বৃত্ত দেখিতে পাইল, গৃহমধ্যে ধনুর্ব্বাণ হস্তে শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া উপনীত হইয়াছেন, হনুমান দুই হস্তে দুই ছিন্ন শির রাক্ষসের রক্তাক্ত মুণ্ড লইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতেছেন। লম্পট ঐ গর্জ্জন শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল। সুবলপ্রিয়া সহসা চক্ষু খুলিয়া দেখেন, দুর্ব্বৃত্ত ভূপতিত। তিনি তৎক্ষণাৎ এই বিপজ্জনক স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

সাধক মনোমোহন দত্ত

স্বর্গীয় সাধক মনোমোহন দত্তের পুত্র শ্রীশ্রীবাবার সহিত দেখা করিতে আসিয়া মনোমোহন বাবুর আশ্রমে শুভাগমন করিবার জন্য শ্রীশ্রীবাবাকে

অনুরোধ করিতেই শ্রীশ্রীবাবা সানন্দে সম্মত হইলেন। ত্রিপুরার পল্লীজননী যে সকল সন্তানের জন্য গৌরব অনুভব করিতে অধিকারিণী, স্বর্গীয় মনোমোহন বাবু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। অল্প বয়সেই ইঁহার মধ্যে ঈশ্বরানুরাগ সৃষ্ট হয় এবং সংসার মধ্যে ইনি উদাসীনবৎ বাস করিতে থাকেন। পতিব্রতা পত্নীর সহযোগিতা ইঁহার কঠোর ধর্ম্মজীবন যাপনে বিশেষ ভাবে সহায়ক হইয়াছিল। মনোমোহনবাবুর তিরোধানের পরে তাঁহার সমাধি-পার্শ্বে আসন রচনা করিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী তপশ্চর্য্যায় রত রহিয়াছেন। সাধক মনোমোহন যে বিল্ববৃক্ষমূলে বসিয়া সাধন-ভজন করিতেন, সেইখানেই তাঁহার দেহ সমাহিত হইয়াছে এবং বিল্বমূলটীকে গৃহমধ্যে রাখিয়া শাখাপ্রশাখাগুলিকে বাহিরে থাকিবার পথ করিয়া দিয়া একটী মনোরম সাধন-কুঞ্জ নির্ম্মিত হইয়াছে। মনোমোহনবাবু এবং তৎশিষ্যদের একটী সুবিস্তৃত সাধন-গোষ্ঠী পল্লী-ত্রিপুরার সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের সকলেই বৎসরে একবার তীর্থজ্ঞানে এই পবিত্র স্থান দর্শন করিয়া যান।

শ্রীশ্রীবাবা আশ্রমে সমাগত হইতেই একটা আনন্দের কলরোল পড়িয়া গেল। মনোমোহনবাবুর শিষ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে সঙ্গীত-বিদ্যার চর্চ্চা অত্যধিক। অনেকে গানকেই সাধনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মনোমোহনবাবুর রচিত মনোজ্ঞ ধর্ম্মসঙ্গীতসমূহ গাহিয়াই অনেকে ধর্ম্ম-প্রচারাদিও করিয়া থাকেন। সুতরাং ভক্তগণ ধর্ম্মসঙ্গীতের দ্বারা আশ্রম মুখরিত করিয়া তুলিলেন, শ্রীকাইল-নিবাসী বাদ্যবিশারদ শ্রীযুক্ত ব্রজবাসী নট্ট তাল-সঙ্গত করিতে লাগিলেন।

নির্ভরের সুখ

প্রথম উচ্ছ্বাস থামিয়া গেলে সৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,— নির্ভরের মত সুখ নেই। নির্ভর কত্তে যে শিখেছে, জগতের সকল দুঃখ তার দূর হয়ে গেছে।

নির্ভর আসে কিসে ?

একজন প্রশ্ন করিলেন,—নির্ভর আসে কিসে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভালবাসা থেকেই নির্ভর আসে। যাকে ভালবাসি, তার উপরেই নির্ভর একেবারে শঙ্কাহীন, দ্বিধাহীন। ভগবানকে ভালবাসা চাই, তবেই নির্ভর আস্‌বে।

নির্ভর ও অলসতা

আর একজন প্রশ্ন করিলেন,—নির্ভর মানে কি হাত-পা ছেড়ে দিয়ে অলস হ'য়ে ব'সে থাকা ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—না, সমস্ত পুরুষকার তাঁর কাজে সঁপে দিয়ে একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে যাওয়ার নাম, নির্ভর। তাঁর কাজে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে ফলাফলের দিকে না তাকানোর নাম নির্ভর। তাঁর শক্তি যতটুকু আমার জিম্মায় আছে, তার সবটুকু তাঁর কাজে খরচ ক'রে দিয়ে নিরহঙ্কার, নিরভিমান, নিষ্কাম হওয়ার নাম নির্ভর। নির্ভরের অবস্থায় ডর-ভয়, আত্মাভিমান, কর্ত্তৃত্ববোধ, কামনা-বাসনা কিছুই থাকে না। অথচ দেহ ও মন তাঁরই কাজ অফুরন্তভাবে ক'রে যায়।

"তাঁর কাজ" কথাটার মানে

একজন প্রশ্ন করিলেন,—"তাঁর কাজ" কথাটার মানে কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন—নিরন্তর তাঁকে স্মরণ করাই তাঁর কাজ। তাঁকে যাতে সর্ব্বদাই স্মরণে রাখ্‌তে পারি, এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর সৃষ্ট এই জগতের জীবের সেবাও তাঁরই কাজ।

সকাম ও নিষ্কাম ঈশ্বর-স্মরণ

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—কামনা নিয়ে যদি ঈশ্বর স্মরণ করি, নাম-জপ করি, ধ্যান-ধারণা করি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তাতে তোমার মঙ্গল হবে, উন্নতি হবে, কামনা পূরণ হবে, ঐহিক ও পারত্রিক কুশল হবে। কিন্তু নিষ্কাম ভাবে যদি তাঁকে স্মরণ কর, তাতে তোমার ব্রহ্মপদ লাভ হবে, তাঁকে পাবে, তাতে লয় হবে।

পল্লী-পরিক্রমার উদ্দেশ্য

রাত্রি অধিক হইতে চলিলে শ্রীশ্রীবাবা পুনরায় ধরণীবাবুর বাড়ীতে আগমন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবার পল্লীভ্রমণ-কালে রহিমপুর ও আকুবপুরের দুই একজন ভক্ত রহিয়াছেন, রহিমপুর আশ্রমের ত্যাগী কর্ম্মীও কেহ কেহ রহিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও বৃথা প্রসঙ্গে আসক্তি দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবা দুঃখ করিয়া বলিলেন,—যেই বানর সেই বানরই থেকে গেলি। পল্লী-পরিক্রমার উদ্দেশ্য কি ইয়ারকি ঠুকে বেড়ান? আমার সাথে থাকার উদ্দেশ্য কি, গ্রাম গ্রামান্তরের যত জঞ্জাল সংগ্রহ ক'রে ঝোলনায় তোলা? তোদের দ্বারা প্রত্যেক পল্লী লাভবান্ হোক্, তোরা প্রত্যেক পল্লী থেকে ছাই উড়িয়ে অমূল্য রতন সব সংগ্রহ করে নে, এরই জন্যে না তোদের নিয়ে গ্রামে আসা?

সকলেই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইলেন এবং আর কখনো অপ্রগল্ভ আলোচনায় সময়-ক্ষেপ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

১৭ই বৈশাখ, ১৩৩৮

ধরণীবাবুর বিনয় ও ভাবুকতা

শ্রীশ্রীবাবা প্রাতঃকালীন নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া বহির্ব্বাটিতে আসিয়াছেন। ধরণীবাবু ভক্তদিগকে প্রসাদ-গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। শ্রীশ্রীবাবার অন্যতম ভ্রমণ সহচর, রহিমপুরের ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি প্রসাদ লইবেন না?"

ধরণীবাবু নিমেষের মধ্যে জানি কেমনতর হইয়া গেলেন। তাঁর সমগ্র শরীর মুহুর্ম্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল, চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল, বলিলেন,— "আমি কি প্রসাদের যোগ্য?" তৎপর প্রসাদের সমক্ষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া থালিকার চতুষ্পার্শে ভূমিতলে যে দুই এককণা পড়িয়াছিল তাহাই আগ্রহ সহকারে কুড়াইয়া লইয়া মস্তকে স্পর্শ করিয়া তৎপর গ্রহণ করিলেন।

সকলেই থালিকা হইতে প্রচুর মিষ্ট দ্রব্যাদি পাইতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত গিরিশ দাদা বলিলেন,—"ধরণীবাবু, আপনিই আসল প্রসাদটুকু লইলেন।"

সকলেই প্রসাদ পাইয়া বাহিরে আসিলে কেহ কেহ শ্রীশ্রীবাবার নিকটে ধরণীবাবুর এই আচরণ বিবৃত করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—এই কাণ্ড দেখে তোমরা মনে ক'রে ব'সো না যে আমি একটা কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে গেছি। ভগবদ্ভক্ত পুরুষ যাঁকে দেখেন, তাঁতেই ঈশ্বরত্ব আরোপ করেন। এই কৃতিত্ব তাঁর ভাবুকতার, তাঁর ভগবদ্‌ভক্তির।

শিষ্যের প্রয়োজন বুঝিয়াই গুরুর উপদেশ

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা স্বগণ-সমভিব্যাহারে পুনরায় আকুবপুর রওনা হইলেন। পথিমধ্যে প্রসঙ্গ উঠিল,—"বিবাহিত না হইলে যোগের পূর্ণতা হয় কি না? মনোমোহন বাবুর আশ্রমে কে একজন বলিতেছিলেন যে, অবিবাহিতের তপস্যা অসম্পূর্ণ। সস্ত্রীকই সাধন করা চাই।"

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—তা' হ'লে ত' বেচারী শঙ্করাচার্য্যের বেজায় বিপদ। বুদ্ধ-চৈতন্যেরও বিপদ বড় কম নয়। কারণ, তাঁরা বিয়ের পরে দারত্যাগী হয়েছিলেন।

একজন সহচর বলিলেন,—মনোমোহন বাবুর শিষ্যরা কেউ কেউ বল্লেন যে, সস্ত্রীক সাধন ছাড়া জীবের মুক্তি হ'তেই পারে না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কথা মিথ্যে নয়। সংসারী লোক যদি সস্ত্রীক সাধন না করে, তা'হলে একটা পাখার বলে পাখী আকাশে আর কতদূর উড়্‌বে!

প্রসঙ্গকর্ত্তা বলিলেন.—তা'হলে আপনিই স্বীকার কচ্ছেন যে, সন্ন্যাস-জীবন অসম্পূর্ণ।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দূর বোকা! কোনো কোনো ষ্টীমারের দুই দিকে দুইটা পাখা থাকে। এরা সংসারী জীব। দ্রুতগামী লঞ্চ বা এরোপ্লেনের পিছন দিক্ দিয়ে একটা পাখা থাকে। এরা হলেন গৃহত্যাগীর দল। সন্ন্যাসীরা দুই দিকে দুই পাখা না রেখে একটী পাখাই ভগবানের হাতে স'পে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন।

প্রসঙ্গকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তবে মনোমোহনবাবু সস্ত্রীক সাধন ব্যতীত পূর্ণ যোগ হয় না, এই কথা বল্‌লেন কেন? আমরা তাঁর স্বহস্ত-লিখিত পাণ্ডুলিপিতে এই কথা দেখে এসেছি।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তার কারণ, তিনি উপদেষ্টা হচ্ছেন গৃহীদের। যিনি যাঁর উপদেষ্টা, তিনি তাঁর উপযুক্ত উপদেশই দেবেন। তিনি যাঁদের উপদেষ্টা, তাঁদের প্রয়োজনীয় কথাই বলেছেন, নইলে সবাই ঘরদোর ছেড়ে সাতমুড়ার ঐ বেলতলাতে ব'সেই খঞ্জনী বাজিয়ে দিন কাটাবে। এর ভেতরে বাবা তোমরা ঝগড়ার কি পেলে?

মানুষ পূজা

আর একজন প্রশ্ন করিল,—আপনি ত' মানুষ-পূজার বিরোধী। আপনাকে কেউ ত' পূজা-আরতি কত্তে এলে আপনি রেগে অস্থির হন। কিন্তু চ'লে আস্‌বার সময়ে ধরণীবাবু ও তাঁর স্ত্রী যখন আপনাকে কালীমন্দিরে বসিয়ে পূজা, আরতি ও ভোগ-নিবেদন কর্ল্লেন, তখন রাগ কর্ল্লেন না কেন?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পূজা তিনি আমার করেন নাই, করেছেন তাঁর আরাধ্য দেবতার। আমাকে মধ্যবর্ত্তী করেছেন, এই মাত্র। আর, পূজা আমি নিই নাই, যাঁকে তিনি পূজা করেছেন, তাঁর কাছেই পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমরা পূজা কর মানুষকে, তাই সে পূজায় সম্মতি দেই না।

স্বামি-স্ত্রীর সত্যসম্বন্ধ পবিত্রতার উপরে প্রতিষ্ঠিত

আকুবপুর পৌছিতে পৌছিতে রাত্রি হইল। জনৈক ভক্ত নিজালয়ে প্রসাদ দিবার জন্য পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীবাবাকে আমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছেন। ভক্ত বিবাহিত এবং স্বামি-স্ত্রী উভয়েই শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণাশ্রিত। প্রসাদ-বিতরণাদি চুকিয়া গেলে আমন্ত্রিত ও শ্রীশ্রীবাবার স্নেহাকৃষ্ট সকল ভক্তেরা নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন। শিষ্য ও শিষ্যা গুরুপাদপদ্মে উপদেশ পাইবার জন্য উপবিষ্ট হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সঙ্কল্প কর যে, সংযম তোমরা প্রাণ দিয়ে হ'লেও রক্ষা কর্ব্বে। তোমরা স্বামী আর স্ত্রী, অর্থাৎ একে অন্যের ধর্ম্মের সহায়, কর্ম্মের সহায়, পূর্ণতার সহায়, সাধনার সহায়। ভুলে যাও, স্বামী আর স্ত্রীর সম্বন্ধ কদর্য্য। ভুলে যাও, স্বামী আর স্ত্রীর সম্বন্ধ লালসা-কুটিল। ভুলে যাও, স্বামী আর স্ত্রীর সম্বন্ধ ভোগমূলক। চতুর্দ্দিকে যে সব দম্পতী ভোগের

সায়রে হাবুডুবু খাচ্ছে, বিশ্বাস করো না যে, তারা স্বামী আর স্ত্রী। সুখের লোভে তারা একে অন্যের সাহচর্য্য কচ্ছে। তোমাদের সাহচর্য্য সুখের লোভে নয়; তোমাদের সাহচর্য্য ভগবানকে পাবার লোভে, পূর্ণতা লাভের লোভে, মনুষ্যজন্ম সার্থক করার লোভে। তোমাদের সকল সম্পর্ক হওয়া চাই পবিত্রতার উপরে প্রতিষ্ঠিত, সংযমের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

সাময়িক অসাফল্যে হতাশ হইও না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অসাফল্য আস্‌তে পারে, ভ্রমভ্রান্তি হ'তে পারে, কিন্তু হতাশ হয়ো না। অসাফল্য পাপ নয়, হতাশাই পাপ। হতাশার মানে ঈশ্বরে অবিশ্বাস, ভগবানের অসীম শক্তিতে অবিশ্বাস, ভগবানের অফুরন্ত কৃপায় অবিশ্বাস। জোর সঙ্কল্প কর,—"পদস্খলন হবে না।" তবু যদি হয়, তবে আরো উৎসাহ নিয়ে, আরো উদ্দীপনা নিয়ে, আরো তেজ নিয়ে সংযম-রক্ষায় ব্রতী হও।

দাম্পত্য-সংযমে পারস্পরিক সাহায্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সংযম-রক্ষায় একজন আর একজনকে সাহায্য কর। একজনের মন দুর্ব্বল হ'লে, অপর জন তাকে উৎসাহের শক্তিতে বলবান্ কর। একজনের চিত্তে চঞ্চলতা এলে অপর জন তাকে নিজ তেজস্বিতার শক্তিতে আত্মস্থ কর। একজনের চিত্তে অবসাদ এলে অপর জন তাকে আশার সঞ্জীবনী ঢেলে উদ্‌জীবিত কর। পরস্পর পরস্পরের বল যোগাও, পরস্পর পরস্পরের অভাব পূরাও, পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা কর।

দৈহিক পরিচ্ছন্নতার সহিত সংযমের সম্বন্ধ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেহটাকে জান, পরমগুরুর পূজার মন্দির। এ'কে পবিত্র রাখ্‌তে হয়, পরিচ্ছন্ন রাখ্‌তে হয়। নখের ডগাটি পর্য্যন্ত পরিষ্কার কর। প্রকাশ্য ও গুপ্ত প্রত্যেকটী অঙ্গ ধর্ম্মবোধে পরিস্কৃত রাখ। শরীরের নয়টী দুয়ার গভীর যত্ন সহকারে পরিস্কৃত রাখ, পরিচ্ছন্ন রাখ। চ'খ, কাণ, নাসাছিদ্র, মুখগহ্বর, জননেন্দ্রিয় ও গুহ্যদেশ সব পরিষ্কার রাখ। মনে রাখ, এদেহ ভোগের নিকেতন নয় যে, যেমন-তেমন ক'রে অবহেলা ক'রে গেলেও চল্‌বে। এ দেহ

পূজার মন্দির, ত্যাগ-সাধনার তপঃকুঞ্জ, এতে এক কণা অপবিত্রতা, এক রতি ক্লেদ বা দুর্গন্ধ থাকলে চলবে না। পরিধানের বস্ত্র, কৌপীন, অন্তর্বাস, সব ধব্‌ধবে পরিষ্কার রাখ, আসন, শয্যা, গৃহাঙ্গন পবিত্র কর। বাহ্য পরিচ্ছন্নতার সাথে মানসিক পবিত্রতার একটা নিকট সম্বন্ধ আছে। বাহ্য অপরিচ্ছন্নতা মনকেও জড়ভাবাপন্ন করে, মনের উদ্যমকে মন্দীভূত করে, মনের সতর্কতাকে কমিয়ে দেয়।

অসংযমীদের সংসর্গ-ত্যাগ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মন যেন ভ্রমেও অসংযমের দিকে মুখ ফিরাতে না চায়, তার জন্য অসংযমীদের সংসর্গ তোমাদের ত্যাগ কত্তে হবে। তোমাদের অঞ্চলটায় বহু নরনারী ধর্ম্মের নাম ক'রে অসংযমের চর্চ্চা করে। আত্ম-প্রসাদ তাতে কিছুই হয় না কিন্তু নানা শাস্ত্রীয় বা অশাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্ধার ক'রে তেঁতুল যে মিষ্টি এই কথা মনকে বুঝাবার চেষ্টা এরা করে। নিজের মনকে আঁখি ঠার্‌বার সাথে সাথে এ'রা অপরকেও এই অসংযমমূলক আচারের প্রতি আকৃষ্ট কত্তে চেষ্টা করে। তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার প্রয়োজন নেই, তা'দিগকে পথভ্রান্ত জেনে সযত্নে তাদের সংসর্গ পরিহার করবে। তাদের সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করাও বিপজ্জনক, যেহেতু ধর্ম্মকথার ভিতর দিয়েই তারা অসংযমের দর্শন-শাস্ত্র প্রচার ক'রে থাকে। নিজ উপাসনার আসন, নিজ উপাসনার বস্ত্র কোনো অসংযমীকে স্পর্শমাত্র কত্তে দেবে না। অবশ্য, এ ব্যাপার নিয়ে একটা শুচিবায়ু বা স্বভাবের মধ্যে কোপনতা সৃষ্টি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

অসংযমীদের চিন্তা-চর্চ্চাও বর্জ্জনীয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অসংযমীর শুধু বাহ্যসঙ্গ বর্জ্জন কর্লেই হবে না, মনে মনেও তার বিষয়ে চিন্তা কর্ব্বে না বা তার কোনও আচরণ নিয়ে নিন্দা-চর্চ্চাও কর্ব্বে না। দেহের দ্বারা সঙ্গ না কর্লেই যে কুসঙ্গ বর্জ্জন হ'ল, তা' নয়। মনে মনে যার চিন্তা কচ্ছ, তারই সঙ্গ করা হচ্ছে। যে যার সঙ্গ করে, সে তার মতই হ'য়ে যায়। যে যার নিন্দা করে, সে তার দোষগুলি

পায়। ভাগবত ব্যাখ্যা কত্তে ব'সে অনেকে অভাগবতীয় লোকদের নিন্দা কত্তে আরম্ভ করে, এরকম প্রায়ই দেখা যায়। এ'তে ভাগবত পাঠ হয় না, তাই ভাগবত পাঠের ফল যে চিত্তশুদ্ধি, তা লাভও হয় না। এ'তে হয়, নিন্দিত ব্যক্তিদের চরিত্রের বা মতের নিকৃষ্ট অংশের অধ্যয়ন, তার ফলে লাভও হয় নীচ মনোবৃত্তি, বা হীন মনোভাব, নিকৃষ্ট গতি।

নামের মধ্যে মনকে নিবিষ্ট কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নামের মধ্যে সমগ্র মনটাকে নিবিষ্ট কর, কেন্দ্রীভূত কর। জগৎকে নামময় ক'রে ফেল। নামই তোমাদের পরম লক্ষ্য হোক্ এবং সর্ব্ববস্তুতে, সর্ব্বদৃশ্যে সেই লক্ষ্যকেই ভেদ কর। মনকে তীরের মত কর, নামের দিকে অনবরত তাকে নিক্ষেপ কত্তে থাক। যে বস্তুতে মন পতিত হবে, সেই বস্তুতেই নামের জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহ সৃষ্টি ক'রে নাও। চিত্তবৃত্তি-গুলিকে নানাবর্ণের তূলিকার ন্যায় পরিচালিত কর, যে বস্তুতে তাদের স্পর্শ লাগে, তাতেই যেন তারা জ্যোতির্ম্মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী তেজোময় নামই শুধু অঙ্কিত করে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তোমরা নাম-ময় ক'রে নাও। নামই পরম জ্ঞান হোক্, নামই পরম ধ্যান হোক্, নামই জাগরণের হোক স্বপ্ন, স্বপ্নের হোক্ জাগরণ। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখ্‌বে, সমগ্র জগৎ যেন নামে পরিণত হ'য়ে গেছে, শয়নের পূর্ব্বে এমন গভীরভাবে নামের সেবা কর্‌বে যেন যদি স্বপ্ন দেখ, তবে তাতে নাম ছাড়া আর কোনও দৃশ্যপটের উদ্‌ঘাটন না ঘটে। নিজ শরীরের পানে তাকাচ্ছ ত' প্রতি অঙ্গে, প্রতি প্রত্যঙ্গে নাম-চিন্তন কর, পরস্পরের দেহের দিকে তাকাচ্ছ ত' একে অন্যের প্রতি অঙ্গে, প্রতি প্রত্যঙ্গে, প্রকাশ্য ও গুপ্ত প্রতি ইন্দ্রিয়ে, প্রতি রোমকূপে নামের রূপ চিন্তন কর। নামের ধ্যান জমাও, সদ্‌গুরুর ধ্যান জমাও,—নামই সদ্‌গুরু, সদ্‌গুরুই নাম।

দাম্পত্য সংযমে যোনিমুদ্রাদির উপযোগিতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—উপাসনার কালে একদিনও যোনিমুদ্রা বাদ দেবে না। আমাদের যোনিমুদ্রা তান্ত্রিক বামাচারীর জঘন্যতায় পরিপূর্ণ যোনিমুদ্রা নয় যে, এর দ্বারা কারো কোনো ক্ষতি হবে। এই যোনিমুদ্রা যে-কোনও সাধক-

সাধিকার যে-কোনও অবস্থাতে উপকারই সাধন করে। এতে গুহ্যরোগ নাশ হয়, ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য কমে, প্রবৃত্তির বেগ মন্দীভূত হয়, আত্মদমনের ক্ষমতা বাড়ে। উপাসনার কাল ছাড়া অন্য সময়েও দরকার হ'লেই যোনিমুদ্রা কর্ব্বে। যোনিমুদ্রা হচ্ছে তোমার অধোগত কামনারাশিকে, অধোগত মনোবৃত্তিকে, অধোগত শক্তিনিচয়কে ঠেলে উপরের দিকে তোলা,—একেই যৌগিক পরিভাষায় বলে কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ। দাম্পত্য-সংযমে যোনিমুদ্রা, সন্ধিনী-মুদ্রা প্রভৃতির প্রয়োজন অপরিসীম। অবহেলা করা ভুল। শরীর-গঠনে যোনিমুদ্রার এতবড় শক্তি যে, তিনপুরুষ ধ'রে কোনও একটা বংশের দম্পতীরা যদি এর অভ্যাস ক'রে যায়, তাহ'লে সেই বংশের মধ্যে যে-কেহ জন্মগ্রহণ কর্ব্বে, সে সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যের প্রায় উর্দ্ধদেশে স্বভাবতঃই বিচরণ কত্তে সমর্থ হবে। যোনি, সন্ধিনী, সঞ্জীবনী, কুলাঞ্জনী প্রভৃতি মুদ্রা যদি কোনও একটা সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত হ'তে থাকে, তাহ'লে কালক্রমে সেই সমাজের মানুষদের মেরুদণ্ডের দৈর্ঘ্য ও দৃঢ়তা, জরায়ু ও জননেন্দ্রিয়ের গঠন ও শক্তি, স্বাভাবিক কর্ম্মক্ষমতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা, কামবেগ ধারণের সামর্থ্য ও জিতেন্দ্রিয়ত্ব আশ্চর্য্যরূপে বর্দ্ধিত হবে। জগৎকে চমকিত ক'রে দেবার যোগ্য একটা বলদুর্দ্ধর্ষ মহাজাতি সৃষ্টির যোনি বা জন্মস্থানই হচ্ছে এই যোনিমুদ্রা।

দাম্পত্য-সংযমের ফলে সাধক-সাধিকার ব্যাধি হয় না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অনেক হিতৈষী ব্যক্তি তোমাদের বল্‌তে পারেন যে, বিবাহিত জীবনে সম্ভোগ-বর্জ্জন কর্লে ব্যাধি হবে। বাস্তবিক ব্যাধি হয়ও। কিন্তু কার হয়? ইন্দ্রিয়-সম্ভোগই যার জীবন, সম্ভোগ-বর্জ্জনে তার ব্যাধি হয়। ইন্দ্রিয়ের সেবাই যার পরম মোক্ষ, সে যদি ইন্দ্রিয় সেবার সুযোগ না পায়, তার ব্যাধি হয়। এমন সকল ক্ষেত্রে সংযম-ব্রতের উপদেশ কোনো পাগলেও দেবে না। কিন্তু তোমাদের পক্ষে ব্যাপার ত' তা' নয়! ইন্দ্রিয়-সেবার আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু তার চেয়েও বড় আকাঙ্ক্ষার তোমরা দেখা পেয়েছ। তোমাদের সংযমব্রত সেই বড় আকাঙ্ক্ষাকে

পূর্ণ করার জন্য ছোট আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করা। ব্যাধি তোমাদের হবে না। এক এক সময়ে ইন্দ্রিয়-সেবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা তোমাদের আস্‌তে পারে, তাকে খুব জোর ক'রে, খুব কসরৎ ক'রে তবে দমন কত্তে হ'তে পারে, কিন্তু এতেও তোমাদের ব্যাধি হবে না। কারণ, তোমরা ভগবৎ-সাধক। অতৃপ্ত ভোগলিপ্সা সাধক-সাধিকার কামগ্রন্থিতে বা জরায়ুতে কোনো ব্যাধি সৃষ্টি কত্তে পারে না। কারণ, ভগবৎ-চিন্তা ধীরে ধীরে কামলিপ্সার মূলকে ধ'রে টেনে তোলে, কামগ্রন্থিকে স্নিগ্ধ ও জরায়ুকে শীতল করে। এই যে তোমাদের "পরিভ্রমণ" প্রক্রিয়া, তার প্রধান শক্তিই এখানে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই জনন-যন্ত্রকে সে উত্তেজনাহীন করে। পুরুষের লিঙ্গমূলে, লিঙ্গদেশে, অণ্ডকোষে, স্ত্রীলোকের যোনিপথে, জরায়ুতে, ডিম্বকোষে নিরন্তর ধ্যান এই "পরিভ্রমণের" অঙ্গীভূত। এই ধ্যানশীলতা সর্ব্বব্যাধির নিরসন করে বা মূলোৎপাটন করে।

যোনিপথে প্রেমের অপচয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অনেক বন্ধুবান্ধব তোমাদের বল্‌তে আস্‌বেন যে, সম্ভোগ বর্জ্জন কর্লে স্বামি-স্ত্রীর প্রেম ক'মে যায়, ভালবাসা হ্রাস পায়। ওটা কোনো কাজেরই কথা নয়। এতবড় একটা মিথ্যা কথা জগতে আর হ'তেই পারে না। ভালবাসা ত' দেহের ধর্ম্ম নয়, ওটা হচ্ছে প্রাণের ধর্ম্ম। সম্ভোগরত নরনারীর প্রাণ যোনিপথে খরচ হ'য়ে যাচ্ছে, তাদের প্রেম যোনিপথে অপচয়িত হচ্ছে। তারা পূর্ণ প্রেমের স্বাদ, সমগ্র প্রাণ দিয়ে ভালবাসার আস্বাদন, পাবে কি ক'রে? যোনিপথে প্রেমের অপচয়কে যারা রুদ্ধ ক'রেছে, তাদের চ'খে মুখে প্রেম এক অপার্থিব জ্যোতিঃস্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। লম্পট এক রজনীতে শতবার স্ত্রীসঙ্গ ক'রে স্ত্রীর প্রতি যে প্রেম প্রকাশ কত্তে পার্কে না, সংযমী তাঁর চ'খের একটু স্নেহদৃষ্টিতে স্ত্রীকে তার কোটিগুণ অধিক প্রেম নিবেদন কত্তে পারে। এগুলি কল্পনার কথা নয়, অলীক ভাষণ নয়,—নিজেরাই নিজ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ ক'রে নিঃসন্দিগ্ধ হও। প্রেমের পরিচয় পরস্পরের সম্ভোগেচ্ছা-পূরণে নয়, একের জন্য অপরের স্বার্থ-বিসর্জ্জনেই এর পরিচয়। নিত্যমৈথুনকারী

লম্পট স্বার্থবিসর্জ্জনে অক্ষম হয়, নিজের স্বার্থই তার পক্ষে বেশী মূল্যবান ব'লে মনে হয়, আর সংযমী পুরুষ বা নারী অতি সহজে অবহেলে নিজ জীবন অপরের জন্য বলি দিতে পারে।

সংযম-ব্রতীর মন্ত্রগুপ্তি

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—লোকের মতামত বা অযাচিত হিতোপদেশই সংযম-ব্রতীর ব্রতরক্ষার বিষম বিঘ্ন। সকলের কথাতেই যদি কাণ দিতে হয়, তবে গুরুবাক্য শুনবে কি! সকলের উপদেশেরই যদি প্রয়োজন হয়, তবে গুরূপদেশের প্রয়োজন কি! সকলের কথাই যদি পালন কত্তে হয় তবে গুরুবাক্য পালন কর্ব্বে কখন? অথচ এমন বান্ধব আছে, যারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে উপদেশ দিতে এলে তুমি তাদের অপমানও কত্তে পার না। তাই শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে, মন্ত্রগুপ্তি, নিজেদের ব্রতের কথা কারো কাছে প্রকাশ না করা। অসৎ-লোকে ভ্রূণহত্যা যেমন অতি গোপনে করে, সংযমব্রতীর ব্রতের বিষয়ও তেমনি গোপন রাখা উচিত। কারণ, যার সঙ্গে তোমার দেনা-পাওনা নেই, তার উপদেশ-শ্রবণ ব্রত-সঙ্কল্পের দৃঢ়তার হানিজনক।

আকুবপুর,
১৮ই বৈশাখ, ১৩৩৮

জীবন-বৃক্ষের ফল

প্রাতঃকালীন ধ্যান-জপাদি সমাপনান্তে শ্রীশ্রীবাবা বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এই গ্রামের এক ভক্ত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র দে তাঁর নিজ বাগানে উৎপন্ন একটী মিষ্টি কুমড়া আনিয়া শ্রীশ্রীবাবার পদপ্রান্তে রাখিলেন। বলা কর্ত্তব্য যে, আকুবপুর গ্রামে শ্রীশ্রীবাবার ভক্ত-সংখ্যা অধিক নহে এবং ইহারা সকলেই দরিদ্র। কিন্তু ধনী শিষ্যের বাড়ীতেও যাঁকে অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া নেওয়া সম্ভব হয় না, প্রায়ই তিনি রহিমপুর হইতে এই গরীব শিষ্যদের গ্রামে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীর গৃহে দশ মাইল পথ পদব্রজে আসিয়া চরণধূলি প্রদান করেন। বলিতে কি যিনি কখনো পান্ত-ভাত জীবনে খান নাই, বিদুর-তুল্য শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমারের গৃহে সেই পান্ত-ভাতেও শ্রীশ্রীবাবার অসামান্য রুচি

দেখা গিয়াছে। অতএব এই দীনবৎসল ঠাকুরের পায়ে একটা মিষ্টি কুমড়ার মত সামান্য বস্তু নিবেদন করিতে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রের কোনও সঙ্কোচই নাই।

সুন্দর, সুপক্ক, সুপুষ্ট কুমড়াটি দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবা বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—ব্যাপার কি রে?

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র বলিলেন,—আপনার নামে মানসিক করিয়াছিলাম। গাছটাতে একটা ফলও বাড়িতে পারিত না, সব পচিয়া নষ্ট হইত।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এখন ত' আর পচে না?

উপেন্দ্র বলিলেন,—না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তবে এখন থেকে লাউ, কুমড়া মানসিক না ক'রে জীবন-বৃক্ষের ফল মানসিক কর, তাতে ইহকালেরও কল্যাণ হবে, পরকালেরও কল্যাণ হবে।

মানসিকের মন্ত্র

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মানসিকের মন্ত্র জানিস? ভগবানের নাম। শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রতি শাখায় প্রতি পাতায়, তাঁর প্রাণারাম নাম উচ্চারণ কর্। মনের প্রত্যেকটা স্পন্দনে তাঁর নামকে স্মরণ কর্। তা'হলে জীবনবৃক্ষের শ্রেষ্ঠ ফল ভক্তি ও জ্ঞান অকালে শুকিয়ে যাবে না, অকালে প'চে গ'লে খ'সে পড়্‌বে না। জীবনের শ্রেষ্ঠ লভ্যকে তাঁর নামে বিকিয়ে দেওয়াই হচ্ছে সমগ্র জীবনটাকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে পাওয়ার পথ।

নারীজাতির সহজ-সারল্যের দোষ ও গুণ

মেটংঘর গ্রাম হইতে কয়েকটী যুবক আসিয়া যম-কিঙ্করের ন্যায় বসিয়া আছেন, শ্রীশ্রীবাবাকে মেটংঘর যাইতেই হইবে। আগ্রহ দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবা সম্মতি প্রকাশ করিলে একজন ব্যতীত অপর সকলেই স্বগ্রামে ফিরিলেন। অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা মেটংঘর রওনা হইলেন। সঙ্গে আকুবপুরের শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র-কুমার এবং রহিমপুরের ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র রহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার এক শ্রেণীর ধর্ম্ম-প্রচারকদের দ্বারা কি ভাবে

স্ত্রীজাতির সহজ-সারল্য ব্যভিচার-বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হইতেছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সহজ সারল্য স্ত্রীজাতিটার একটা মস্ত গুণ, আবার মস্ত বড় দোষও। সারল্যের গুণে এরা মহাদাম্ভিকেরও চিত্ত জয় করে, মহা-কুটিলকেও অনুরাগী করে কিন্তু সারল্যের দোষে এরা শয়তানের ষড়যন্ত্রজালে সহজে জড়িয়ে পড়ে, সতীত্ব-গৌরব হারায়, পথের ভিখারিণী হয়। সারল্যের গুণে এরা দুঃখময় সংসারকে সুখোজ্জ্বল করে, সারল্যের দোষে এরা, যে ভ্রম কর্‌লে আর সংশোধনের পথ থাকে না, এমন ভ্রমে প'ড়ে চির-দুঃখের সাগরে ডোবে।

লম্পটেরা কি ভাবে মেয়েদের সর্ব্বনাশ করে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কি ভাবে মেয়েদের এ সর্ব্বনাশ ঘটে তা' জান? হঠাৎ একদিনে কেউ কোনো মেয়েকে নষ্ট কত্তে পারে না। প্রথমে নানা প্রিয়-প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে ধূর্ত্ত পুরুষেরা বেশ ক'রে ঘনিষ্ঠতা জমিয়ে নেয়। এ প্রিয়-প্রসঙ্গের, এ সব সৎকথার পশ্চাতে যে কি আছে, তা' তখন শ্যেনদৃষ্টি সমালোচকেরও বুঝে উঠ্‌বার উপায় থাকে না। ঘনিষ্ঠতা বেশ পেকে উঠ্‌লে আরম্ভ হয় দুটো একটা মৃদুগোছের বেসামাল আচরণ, যার ভিতরে দোষ থাক্‌লেও পূর্ব্বপ্রীতি বশতঃ মেয়েরা চেপে যায় এবং যে সব আচরণকে সামান্য চেষ্টা কর্ল্লেই শাস্ত্রের বচন ঝেড়ে সদর্থযুক্ত করা যায়। এ সময়ে যদি মেয়েরা সিংহীর মত গর্জ্জন ক'রে উঠ্‌তে পারে, তবে সব কদাচার ব্যস্‌ ঐ পর্য্যন্তই। কিন্তু দেশের মেয়েদের সে শিক্ষাই বা কোথায়, সে সৎসাহসই বা কোথায়? নির্জ্জীব পুরুষদের ঘর কত্তে কত্তে মেয়েগুলিও নির্জ্জীব জড়পদার্থে পরিণত হ'য়ে পড়েছে। ধূর্ত্ত শয়তানগুলি রগ্‌ বুঝে চলে। যখন দেখে যে, ছোট ছোট মন্দ আচরণে বাধা তেমন আস্‌ছে না, তখন তারা চরম অপমান ক'রে বসে। যখন তারা দেখে যে, ছোট ছোট সতীত্ব-বিরোধী কাজকে ধর্ম্মের নাম দিয়ে বেশ চালিয়ে দেওয়া যাচ্ছে, তখন তারা চরম অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ব'লে চালানো আর মোটেই কঠিন মনে করে না। মেয়েদের মধ্যে আবার এমন কতকগুলি

হতভাগিনী আছে, যারা নিজেদের সরলতার অপব্যবহার ক'রে নিজ বুদ্ধির দোষে লম্পটের জন্য প্রবেশ-দুয়ার ক'রে দেয়। এই হ'ল পল্লীগ্রামের ব্যাপার। সহরেও এই ব্যাপার চল্‌ছে ইয়ত্তাহীন। তবে তা' ধর্ম্মের নামে নয়, য়ুরোপ থেকে আমদানী করা এক নূতন দার্শনিক মতবাদ দিয়ে। এই সব ভোগবাদের প্রচারকেরা প্রথম চোটেই যদি ভোগধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন কত্তে আরম্ভ করে, তা'হলে অনেক মেয়েই সম্মার্জ্জনী দিয়ে তাদের অভ্যর্থনা কর্ব্বে। কারণ, সহরের মেয়েরা কতকটা শিক্ষার আলোক পায়। তাই ধূর্ত্ত লম্পটেরা প্রথমে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা-সৃষ্টি করে দেশ-সেবার, সমাজ-সেবার, জাতীয় উন্নতির কথা দিয়ে। দেশ-সেবার সৎকথার ভিতর দিয়ে ঘনিষ্ঠতা যখন জমে উঠ্‌ল, তখন এমন ভাবে দু-একটা নারী-মর্য্যাদাবিরোধী আচরণ ইচ্ছা ক'রেই করে, যেন হঠাৎ হ'য়ে গেছে। এতে যে সব মেয়ে ক্ষেপে উঠে বুকে লাথি মে'রে দেয়, তাদের কাছ থেকে অমনি চম্পট। যে মূর্খ মেয়ে ক্ষমা করে, ক্রমে তার ক্ষমার মূল্যে দেহের পবিত্রতা আর মনের শান্তি একদিনেই যায়। তখন তাকে বুঝান হয়—ভোগই জগতের একমাত্র সত্য, ভোগই মানবের পরম লক্ষ্য, ত্যাগ হচ্ছে গঞ্জিকাসেবীদের জন্য, সংযত থাকার মানে আত্মবঞ্চনা। নিশাচর গুণ্ডারা বেড়া কেটে ঘরে ঢু'কে যত নারীর সতীত্ব নাশ করে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাটক্ষেতে, খালের ধারে, পুকুরপারে, বনের পথে, খেওয়া ঘাটে, রেলে আর ষ্টীমারে যত নারীর মর্য্যাদা নষ্ট হয়, তার চেয়ে শতগুণ সহস্রগুণ মেয়ে এভাবে নষ্ট হয়। পল্লীর মেয়েরা দু'দিন গোসাইচাঁদী কীর্ত্তনের হট্টগোলে তাদের এ মর্য্যাদার ব্যথাটা ভু'লে থাকে, সহরের মেয়েরাও দু'দিনের জন্য পাশ্চাত্য ভোগবাদের মত্ততায় নিজেদের এ অসম্ভব অসম্ভ্রমকে অগ্রাহ্য করে, কিন্তু যৌবনের নদীতে ভাঁটার টান আরম্ভ হ'লে আপনি প্রত্যেকের মনে হিসাব-নিকাশ আরম্ভ হয়। তখন প্রত্যেকে বুঝতে পারে, ভোগার্থী নরপশু কতবড় দুঃখময় ক্ষতই জীবনের প্রথম প্রভাতে অসতর্ক সারল্যের সুযোগে ক'রে রেখে গেছে, যার ক্ষত মৃত্যু পর্য্যন্ত শুকাতে চায় না, যার ভিতর থেকে অবিরাম পূতিগন্ধই বেরুতে থাকে।

নারী-অমর্য্যাদার প্রতীকার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই সর্ব্বনাশের প্রতীকার কি জান? পুরুষ জাতির বিরুদ্ধে তীব্র সন্দেহের ভাব জাগিয়ে দিয়ে মেয়েদের ভিতরে আত্মরক্ষণেচ্ছার সৃষ্টি করা ফলপ্রদ হবে না। কারণ, অতি সন্দিগ্ধতা তার নিজের চিত্তেই ঘোরতর অবনতি এনে দেবে। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোনো পুরুষ কোনো কুমারী মেয়ের গায়ে হাত দিলে, আঁচল ধ'রে টান্‌লে, গলা জড়িয়ে ধর্‌লে, চুমু খেলে, অসংযত পত্র লিখ্‌লে বা গর্হিত রসিকতা কর্ল্লে যে তার অপমান হয়, এই শিক্ষাটুকু তাকে দিয়ে দিলেই যথেষ্ট। গোড়া থেকেই সমগ্র পুরুষ জাতির প্রতি বিদ্বেষ বা অশ্রদ্ধা জাগিয়ে দেওয়া একটা কাজের কথাই নয়। নারীর শ্রেষ্ঠতার বিচার হয়, তার স্পর্শকাতরতা দিয়ে। এই বিষয়ে একটা উদ্ভট শ্লোক আছে যে, রাজার পরিচয় দানে, মণির পরিচয় গুরুত্বে, ঘোড়ার পরিচয় কর্ণ-মর্দ্দনে আর স্ত্রীলোকের পরিচয় অঙ্গ-স্পর্শনে। যার গায়ে হাত দিলে চুপ্ ক'রে থাকে, সে হচ্ছে অধমা নারী। যার গায়ে হাত দিতেই চম্‌কে উঠে, সে হচ্ছে উত্তমা নারী। কোনো প্রকার অসম্ভ্রমের সম্ভাবনা দেখ্‌লেই চম্‌কে উঠার শিক্ষা প্রত্যেক মেয়েকে দিতে হবে। মেয়েদের সম্মান মেয়েরা নিজেরাই রক্ষা কর্ব্বে, এই শিক্ষা তাদের চাই। রাতদিন অন্যে এসে তাদের সতীত্বের অভিভাবকরূপে পাহারাওয়ালার মত দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, এ আশা যেমন অন্যায়, তেমনি অসম্ভব।

একলব্যের সাধনা

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে সকলে মেটংঘর গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সাহা স্বালয়ে শ্রীশ্রীবাবাকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ সাহা এবং বীরেন্দ্রচন্দ্র মেটংঘর গ্রামে একটী আশ্রম স্থাপনের জন্য শ্রীশ্রীবাবাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মানুষের চিত্তক্ষেত্রই আমার আশ্রমভূমি, এক একটা মানুষই এক একটা যথার্থ প্রতিষ্ঠান। এই আশ্রমই আমি গড়্‌তে চাই, জায়গা-জমি দিয়ে আমাকে বিব্রত ক'রো না।

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন,—আমরা তিন সরিকে পরামর্শ ক'রে ভূমিটুকু আপনার নামে উৎসর্গ ক'রেই রেখেছি, এখন আপনি যদি আশ্রম না করেন, তবে আমরা একলব্যের মত খড়ের গুরুমূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে আশ্রম গ'ড়ে তুল্‌ব।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তথাস্তু!

রাত্রি সাড়ে তিনটার সময়ে আশ্রমভূমিতে মাটিকাটা আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীবাবা প্রথম এক কোদাল মাটি কাটিয়া দিলেন।

ডাল্‌পা

১৯ বৈশাখ, ১৩৩৮।

আপন-জন আপন-জনকে দেখিলেই চিনিতে পারে

সূর্য্যোদয়ে শ্রীশ্রীবাবা ডাল্‌পা পৌছিলেন এবং মৌনব্রত আরম্ভ হইল। এই গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান যুবক কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণাশ্রয় পাইয়াছেন। তিনি গুরুপাদপদ্ম দর্শনে আগমন করিয়া নিবেদন করিলেন যে, এই গ্রামের অনেকগুলি যুবক নানা কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়া অনৈতিক পাপের অনুষ্ঠানে দিন কাটাইতেছে।

শ্রীশ্রীবাবা একখণ্ড কাগজে লিখিয়া দিলেন,—"Give them a chance to see me once. The very sight will revolutionise those that are really my own men" (আমাকে আসিয়া দেখিবার একটা সুযোগ ইহাদিগকে দাও। যারা আমার প্রকৃতই আপন-জন, আমাকে দর্শনমাত্র তাদের জীবন রূপান্তরিত হইবে)।

ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিরূপে?

শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—আপন-জন আপন-জনকে দেখিলেই চিনিতে পারে। ইহার জন্য যুক্তি, তর্ক বা উপদেশের অপেক্ষা করিতে হয় না। সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে থাকিয়া নিয়তই আপন-জন চিনাইয়া দিতেছেন। যে যখন নিজ আপনার-জনকে চিনিতে পারিতেছে, তখনি তার নবজন্ম লাভ হইতেছে।

সংযম কাহাকে বলে

অপরাহ্ণে চারি ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা মৌনভঙ্গ করিলেন। একজনে প্রশ্ন করিলেন,—সংযম কাহাকে বলে?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কোনও এক গ্রামে একটী উপাদেয় আস্বাদযুক্ত কুলের গাছ ছিল। একটী তরুণ তাপস গিয়ে সেই কুলগাছের নীচে দাঁড়ালেন। দাঁড়াতেই তাঁর জিভ জলসিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। গাছের মালিক তাপসকে বল্লেন, —"কুল খাবেন? বেশ ত' খান না!" তাপস দেখ্‌লেন,—"খেলে কুল এখনি খাওয়া যায়, কিন্তু খাওয়াটার প্রেরণা প্রয়োজন-বুদ্ধি থেকে আসে নি, এসেছে লোভ থেকে, অতএব গাছের মালিক খেতে দিলে কি হয়, আমার খাওয়া উচিত নয়।" তাপস কুল খাওয়ার লোভ পরিত্যাগ কর্ব্বার জন্য সাতদিন সাতরাত্রি কেবলি ভাব্‌তে লাগ্‌লেন,—"লোভ আমার নেই, লালসা আমার নেই, প্রতি মুহূর্ত্তে আমার মন থেকে লালসার পূর্ব্বসংস্কার নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যাচ্ছে, আমি প্রতিমুহূর্ত্তে লোভ-জয়ী, লালসা-জয়ী হচ্ছি।" এইরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে তাঁর মনে এক নির্লোভ নির্লালস স্থিরত্বের ভাব এল। তখন তিনি কুল গাছের তলে গিয়ে একটী কুল দশ মিনিটকাল পর্য্যন্ত মুখের কাছে ধ'রে রেখেও যখন দেখ্‌লেন যে, জিভে জল আসে নি, তখন তিনি ইচ্ছামত কুল পেড়ে খেলেন। সংযম ব্যাপারটা এই রকম। ভোগের দুয়ার খোলা তবু তুমি ভোগ কর না, এর নাম সংযম। চিত্তে ভোগলুব্ধতা এলে সুযোগ পেয়েও তুমি সে সুযোগ গ্রহণ কর না, তোমার ভিতরে লুব্ধতা এসেছে কিনা, বারংবার যত্নসহকারে তার পরীক্ষা কর, মনের লুব্ধতাকে দমন করার জন্য দিনের পর দিন অবিশ্রাম সঙ্কল্প পরিচালিত কর, সৎচিন্তা, স্বাধ্যায় ও সাধুসঙ্গের দ্বারা ভোগের অস্থায়িত্ব উপলব্ধি কর্ত্তে চেষ্টা কর এবং যখন প্রয়োজন, একমাত্র কর্ত্তব্যবোধেই ভোগ কর, এরই নাম সংযম।

সংযমের সাধন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সংযমের মহিমা-চিন্তনই হচ্ছে সংযমের প্রথম সাধন। যার মহিমা নেই, সে তোমার তপোমুখিনী চিত্তবৃত্তির সেবা দাবী কর্ব্বে

কি ক'রে? সংযমের মধ্য দিয়ে পরম কল্যাণকে যাঁরা লাভ করেছেন, তাঁদের শান্ত সমাহিত নিস্পন্দ চিত্তটীর অনির্ব্বচনীয় স্থির-ভাবটীর অনুধ্যান হচ্ছে, সংযমের দ্বিতীয় সাধন। এই জন্যই দেখা যায়, যথার্থ ত্যাগীর শিষ্যদের মধ্যে ত্যাগ সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংযমের তৃতীয় সাধন হচ্ছে,—অসংযমের দোষ ও অপূর্ণতা দর্শন। এতে পরোক্ষভাবে মন সংযমের দিকে অলক্ষিত উৎসাহ পায়। কিন্তু এতে অন্যরকম ভয়ও আছে। অসংযমের অপূর্ণতার দিকেই যদি তুমি তোমার সবটুকু দৃষ্টি পরিচালিত কর, তোমার মন প্রতিবাদচ্ছলে অসংযমেরই সঙ্গ কত্তে থাকবে এবং দীর্ঘকালের সঙ্গ মনকে অসংযমীই করে ফেল্‌বে। যদিও জান্‌ছ, যে, অসংযমের দোষ জানা আবশ্যক, তবু মনে রাখ্‌তে হবে যে, সংযমের মহিমায় বিশ্বাস যত দ্রুত সংযমকে আনয়ন করে, অসংযমের নিন্দা তত দ্রুত সংযমকে আনয়ন করে না।

সন্ন্যাসী ও গৃহীর সংযমে পার্থক্য কোথায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গৃহীর সংযমে আর সন্ন্যাসীর সংযমে একটু তফাৎ আছে। উভয়েরই লক্ষ্য এক পরমাত্মাকে জানা, ভগবানকে পাওয়া, সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুব দেওয়া, মরণশীল অস্তিত্বকে মরণাতীত করা। কিন্তু বাহ্য ব্যবহারে সামান্য পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। তাই ব'লে একজন সংযমী-গৃহীকে একজন সংযমী-সন্ন্যাসীর চেয়ে হেয় মনে করার কোনও প্রয়োজন নেই। সংযমের প্রাণ হচ্ছে নির্লালস চিত্ত, ভোগবুদ্ধিহীন মন, ভোগগন্ধহীন হৃদয়, কামতরঙ্গহীন আবেগ। সন্ন্যাসী নিঃসঙ্গ-জীবন-যাপন-কারী ব'লে তাঁর সংযমের সৌষ্ঠব সুবৃহৎ তালবৃক্ষের ন্যায় অত্যন্ত দূর থেকেও পথহারা পথিকের পথ-প্রদর্শক। গৃহস্থ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন না ব'লে তাঁর সংযমের সৌষ্ঠব শাখাপত্র-বিস্তারিত আম্রপাদপের ন্যায় নানাবিচিত্রতায় রমণীয়। উভয়ের ব্যবহার-গত পার্থক্য থাকবেই, কিন্তু প্রাণের মহত্ত্বে পার্থক্য নেই। সন্ন্যাসী স্ত্রী-সঙ্গ-বর্জ্জী একক সংযমী, গৃহী স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে একত্র বাস ক'রেও সর্ব্ববিধ প্রেমাস্বাদনমূলক ব্যবহার বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ও

নির্লিপ্ত। উভয়েরই ব্যবহারিক অধিকারের সীমা নির্দ্দিষ্ট করা রয়েছে, কিন্তু অনাসক্তি ও নির্লিপ্ততা উভয়েরই অফুরন্ত।

সংযমের পরীক্ষা

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সংযম তোমাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা, তারও একটা পরীক্ষা আছে। ভোগ্যবস্তু যতক্ষণ আস্বাদে মধুর বোধ হবে, ততক্ষণ দূরে যতই থাক না, পূর্ণ সংযমী তোমাকে বলা চলে না। কারণ, জোর ক'রেই তুমি ভোগ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত কচ্ছ, কিন্তু ভোগ্যবস্তু তার মোহিনী শক্তি হারায়নি, কোনো ক্রমে তোমার কাছে এসে পড়্‌তে পারলে সে তখন তোমার উপরে এক চোট্ নিশ্চিতই নিয়ে নেবে, নিশ্চিতই সে তার মাধুর্য্যের আকর্ষণে তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয়কে অধীর চঞ্চল ক'রে তুল্‌বে; তুমি বশীভূত হ'য়ে নিজেকে তার পায়ে বিকিয়ে দাও আর নাই দাও, সে তার সুষমা দিয়ে তোমার মনের দৃঢ়তাকে, চিত্তের শুদ্ধতাকে দু'চারবার হ'লেও হঠিয়ে দেবেই দেবে। ভোগ্যবস্তু যখন তোমার নিকট স্বাদুতা বর্জ্জিত ব'লে বোধ হবে, তার ভিতরে কোনো স্বাদই যখন তোমার অনুভবে আস্‌বে না, আলুনি ব্যঞ্জনের মত যখন তা' নিতান্তই অতৃপ্তিকর হবে, তখন তোমার সংযম এসেছে ব'লে মনে করা যাবে। ভোগ্যবস্তু নিকটে এলেও যখন তার কোনো মাধুর্য্য নিজেকে প্রকাশ ক'রে তোমার চিত্তকে তোলপাড় কত্তে পারে না, এটা তোমার ভোগের যোগ্য কি ত্যাগের যোগ্য সেই প্রশ্নটি পর্য্যন্ত মনের কোণে উঁকি মারে না, তখনই তুমি পূর্ণ সংযমী।

ডালপার বক্তৃতা—চিন্তার শক্তি

ইতিমধ্যে ডালপা-গ্রামবা'সগণ স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র দেব ডাক্তারের বাড়ীর সম্মুখস্থ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে একটী সভার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বক্তৃতাদানে অনিচ্ছুক হইলেও বাবাকে বলিতেই হইল। প্রথমেই শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, মানব-মনের একাগ্র চিন্তার অলঙ্ঘনীয় শক্তির কথা।

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—জগতের যেদিকে তাকাবে দেখ্‌তে পাবে কি সব অত্যাশ্চর্য্য ভাঙ্গা আর গড়ার অভাবনীয় লীলা। এসব হচ্ছে কার

বলে? বাহুর বলে? নিশ্চয়ই না। বাহু ত একটা নির্জ্জীব যন্ত্র মাত্র, যার পশ্চাতে চিন্তার প্রখর শক্তি বিদ্যমান না থাক্‌লে সে অলস তন্দ্রায় ঘুমিয়ে থাক্‌তেই বাধ্য। চিন্তাই জগৎকে পরিচালিত কচ্ছে, চিন্তার অশুদ্ধতাই জগতের সকল কর্ম্মকে অশুদ্ধ ক'রে দিচ্ছে, আবার চিন্তার অশুদ্ধতাই জগৎকে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধীকৃত কত্তে সমর্থ। জগৎজোড়া এই যে হাহাকার, এই যে আর্ত্তের ক্রন্দন, এই যে দরিদ্রের পীড়ন, এই যে বলদর্পিত অসুরের প্রবল অত্যাচার, তার মূল হচ্ছে জগৎবাসীর আসুরিকী চিন্তা। জগদ্ব্যাপী এই মহাদুঃখকে নিবারণ কত্তে যা চাই, তা হচ্ছে দৈবীচিন্তার প্রসারণ, শুদ্ধ চিন্তার বিকাশ। অশুদ্ধ চিন্তার বিকারে ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছন্ন হ'য়ে রয়েছে, তাকে সুস্থ, সুন্দর ও সুশান্ত কত্তে চাই শুদ্ধ চিন্তার বিমল বিভার সর্ব্বব্যাপী সঞ্চরণ। তাকেই বল্‌ব দেশমাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক, যিনি সচ্চিন্তার মহীয়সী শক্তিকে নিজের ভিতরে জাগিয়ে তুলে অপরাপরের ভিতরে সংক্রামিত ক'রে দেবার মহান্ ব্রতকে গ্রহণ করেছেন।

চিন্তার শক্তি জাগাইবার কৌশল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু জগদ্বিপ্লাবী অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে নিজ চিন্তার মধ্যে জাগিয়ে তোল্‌বার কৌশল জানা চাই। সে কৌশল হচ্ছে, একটী সচ্চিন্তার পায়ে সর্ব্বাগ্রে নিজেকে সমর্পণ করা, নিঃশেষে সমর্পণ করা। মহা-সমুদ্রের একটী জায়গায় যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারে, স্রোতের টানে স্থান থেকে স্থানান্তরে যে ভেসে বেড়ায় না, মহাসমুদ্রের তলদেশের সাক্ষাৎকার সে-ই লাভ করে, বিশাল বারিধির শত-শতাব্দী-সঞ্চিত মণিমুক্তারাজি সে-ই আহরণ করে। যে যাকে ভালোবাসো, সে তাতে ডুব দাও। যার জন্ম ও সংস্কার যে মহৎ প্রেরণার সঙ্গে তোমাকে সহজ ভাবে যুক্ত ক'রেছে, সে তার সঙ্গে প্রেমের ডোরে আমরণের বন্ধন রচনা কর। প্রিয় ব'লে একবার যে মহীয়সী ভাবকণাকে স্বীকার করেছ, প্রতি অঙ্গে তাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন প্রদান কর। এই বাহুবেষ্টন যেন মৃত্যু ও এসে ছিন্ন ক'রে দিয়ে যেতে না পারে। এইখানে হ'ল নিজের ভিতরে সত্যচিন্তার ঐশী শক্তি জাগিয়ে তোলার অব্যর্থ ইঙ্গিত ৮

ভবিষ্যতের ভারত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—

নিত্যদিন মোর ধ্যান ভারতের পুণ্য ভবিষ্যৎ ;
ক্লেদ নাহি, গ্লানি নাহি, আছে শুধু যা-কিছু মহৎ ;
সকলের প্রাণভরা পূর্ণানন্দ, কুশল, অভয়,
সত্য কাজে সত্য পথে মৃত্যুহীন সাহস দুর্জ্জয় ; *

এমন দিন ভারতবর্ষে ছিল এবং

পুনরায় তাহা আসিবে ফিরে,
পুনরায় তার যমুনা-পুলিনে মোহন-বংশী বাজিবে ধীরে,
পুনরায় তার আবাহনী-গীতি বেড়াইবে ভেসে ধীর সমীরে,
পুনরায় যত প্রেমিকের বুক সিক্ত হইবে নয়ন-নীরে।

শুদ্ধ চিন্তার অমোঘ বীর্য্যে সহস্র অচতুর পুনরায় চতুর হবে, সহস্র অলস পুনরায় অনলস হবে, সহস্র ভীরু কাপুরুষ সাহসের স্পর্দ্ধিত শৌর্য্যে জগতের বুকে বীরের মত দাঁড়াবে, স্বকীয় অভ্রভেদী মনুষ্যত্বের অভ্রান্ত পরিচয় প্রদান কর্ব্বে। পুণ্য চিন্তার অব্যর্থ বীর্য্যে শতকোটি মুমূর্ষু নবযৌবনের সঞ্চারণা অনুভব কর্ব্বে, দুর্ব্বল সবল হবে, অক্ষম সক্ষম হবে, পাশবিক জীবনে দৈবী প্রতিভার স্ফূরণ হবে, অমানুষ মানুষ হবে। সত্য চিন্তার অমোঘ শক্তি কৃপণকে কর্ব্বে সর্ব্বস্বদাতা, স্বার্থপরকে কর্ব্বে পরার্থে আত্মোৎসর্গকারী, ইন্দ্রিয়-সুখলুব্ধ বিষ্ঠাকুণ্ডের ক্রিমিকীটকে কর্ব্বে জিতেন্দ্রিয় ঋষি, পরমুখাপেক্ষীকে কর্ব্বে আত্মবলদৃপ্ত স্বাবলম্বী অভিক্ষু, আর নাস্তিককে কর্ব্বে পরমেশ্বরানুরাগী ভাব-বিহ্বল প্রেমিক।

চিন্তার শক্তিতে বিশ্বাস কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নবজাগরণলুব্ধ নবযুগের যুবক, আজ তুমি চিন্তার শক্তিতে বিশ্বাস কর, চিন্তার বীর্য্যে বিশ্বাস কর, চিন্তার অমোঘত্বে বিশ্বাস

* এই সকল কবিতা-কণা অন্য লেখকের লেখা হইতে উদ্ধৃত নহে। বক্তৃতা-প্রদান-কালে অত্যন্ত আবেগ আসিলে অনেক সময়ই শ্রীশ্রীবাবার শ্রীমুখ হইতে সদ্যরচিত কবিতা অনর্গল বহির্গত হইতে দেখা গিয়াছে।

কর। সত্য-চিন্তার মৃত্যু নাই, একাগ্র চিন্তার ধ্বংশ নাই; একান্ত চিন্তার ক্ষয় নাই। জীবনের বিনিময়ে যে চিন্তায় তুমি প্রাণ-সঞ্চার করেছ, মরণেও সেই চিন্তার অমোঘ সত্ত্বা একচুল টল্‌বে না, এক তিল নড়্‌বে না। তোমার অস্তিত্বের চেয়েও তোমার চিন্তার অস্তিত্ব অধিক-যুগান্তরস্থায়ী, তোমার ব্যক্তিত্বের চেয়েও তোমার চিন্তার ব্যক্তিত্ব অধিকতর দূরব্যাপী। সাধক, আজ সত্য চিন্তাকে সাধ্‌বার দিন এসেছে, তপস্যার উগ্র বীর্য্যে সত্য চিন্তাকে জীবনের সর্ব্বেশ্বর ব'লে গ্রহণ কর্‌বার দিন এসেছে, শুদ্ধ চিন্তার অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির হাতে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডকে যন্ত্ররূপে ন্যস্ত করবার দিন এসেছে,—

বৈদিক ঋষি যজ্ঞায়তন রচিতে চাহিছে তোমার বুকে,
বৈষ্ণব কবি প্রেমের মহিমা শুনিতে চাহিছে তোমার মুখে,
তান্ত্রিক যোগী শক্তি-সাধনা করিতে চাহিছে তোমার সাথে,
বৌদ্ধ ত্যাগীরা মৈত্রী-অমিয় অর্পিতে চাহে তোমার হাতে,
শঙ্কর চাহে জ্ঞানের দীপ্তি ফুটাইতে তব তৃতীয় চোখে,
নানক চাহিছে টানিয়া লইতে সমন্বয়ের অমৃত লোকে।

ইহাদের আকাঙ্ক্ষা আজ পূরণ কর,—একটী মাত্র সত্য চিন্তার পায়ে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে একটী মাত্র শুদ্ধ চিন্তার মহিমায় নিঃশেষে বিশ্বাস ন্যস্ত ক'রে।

ত্যাগেচ্ছু সন্তানও পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য

রাত্রিতে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিলেন,—বৃদ্ধ পিতামাতাকে ত্যাগ ক'রে কারো সংসারাশ্রম বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য কি না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাধারণ অবস্থায় অকর্ত্তব্য। কিন্তু এমন অসাধারণ অবস্থা মানবের জীবনে আস্‌তে পারে, যখন দৈনিক কর্ত্তব্যের চেয়ে আগন্তুক কর্ত্তব্য বড় হ'য়ে দাঁড়ায়। অকৃতজ্ঞতা পরম অধর্ম্ম, সুতরাং পিতৃমাতৃসেবায় ঔদাসীন্য সমর্থনযোগ্য নয়।

রজস্বলা স্ত্রীলোকের দীক্ষা-গ্রহণ

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—রজস্বলা অবস্থায় কোনও স্ত্রীলোক দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তে পারে কি না?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাধারণ অবস্থায় পারে না। কিন্তু এমন অসাধারণ অবস্থার উদয় রমণীর মনে হ'তে পারে, যে সময়ে দেহ রজস্বলা হ'লেও তাকে অপবিত্র মনে করা ভ্রম। তেমন স্ত্রীলোকের দীক্ষা সর্ব্বসময়েই হ'তে পারে।

প্রশ্ন।—সদ্‌গুরুকে ত' সর্ব্বশক্তিমান ব'লে মানা হয়। রজস্বলা নারীকে স্পর্শমাত্র বা দৃষ্টিমাত্র তিনি কি পবিত্র ক'রে নিতে পারেন না? তখন কি তাকে দীক্ষা দেওয়া চলে না?

শ্রীশ্রীবাবা।—সদ্‌গুরুর বাক্য, দৃষ্টি বা স্পর্শ শিষ্যকে পবিত্র করে সন্দেহ নেই। কিন্তু রজস্বলা নারীকে দীক্ষাদান প্রচলিত সদাচারের বিরোধী। নিষ্প্রয়োজনে বা সামান্য প্রয়োজনে এই সদাচার লঙ্ঘন করা উচিত নয়।

রজস্বলা নারীকে অপবিত্র মনে করা হয় কেন?

প্রশ্ন।—আচ্ছা, রজস্বলা নারীকে অপবিত্র ব'লে মনে করা হয় কেন? প্রত্যহই ত' আমরা স্ত্রীপুরুষ প্রত্যেকে মলমূত্র ত্যাগ কচ্ছি, কৈ সেজন্য ত' আমাদিগকে অশুচি ব'লে মনে করা হয় না! মলমূত্র-স্রাবের মত রজঃস্রাবও একটা স্বাভাবিক ব্যাপার মাত্র।

শ্রীশ্রীবাবা।—মলমূত্র ত্যাগ কল্লে'ও তোমাকে অশুচি মনে করা হয়, যতক্ষণ না তুমি শৌচক্রিয়া সমাপন কচ্ছ। বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করা বা কোমর-জলি করা প্রভৃতি সম্পর্কে নানা অঞ্চলে নানা মত আছে, কিন্তু শৌচ না করা পর্য্যন্ত তুমি সকল অঞ্চলের লোকের মতানুসারেই অশুচি ও অস্পৃশ্য। তার মানসিক কারণ হচ্ছে, শৌচ না করা পর্য্যন্ত মলমূত্র-ত্যাগকারীর মন নিম্নাঙ্গে থাকে। রজস্বলা নারীকেও অপবিত্র মনে করার মানসিক কারণ উহাই। রজো-নিঃস্রাবের দিবসত্রয় তার মন নিম্নাঙ্গেই থাকে। মন যখন নিম্নাঙ্গ-বিহারী, তখন সে অল্প হোক বেশী হোক্ পশুভাব পায়।

প্রশ্ন।—যার পায় না?

শ্রীশ্রীবাবা।—তাকে সাধারণ মানব-মানবীর চেয়ে উঁচু থাকের লোক ব'লে জান্‌তে হবে।

রজস্বলা নারীর সন্ধ্যোপাসনা

প্রশ্ন।—রজস্বলা অবস্থায় ধ্যান-জপাদি উচিত কি না?

শ্রীশ্রীবাবা।—আমি ত' মোটেই অনুচিত মনে করি না। আমার শিষ্যাদের আমি ঋতুর তিন দিনও আত্মকার্য্য কত্তে উপদেশ দেই। ঐ তিন দিন দেহের উপর দিয়ে একটা বিপর্য্যয় যায় ব'লে দৈহিক বিশ্রাম দরকার। কিন্তু ভগবানকে ডাকৃতে বাধা থাকা অনুচিত।

প্রশ্ন।—অনেক সাধকেরাই যে ঋতুমতী অবস্থায় সন্ধ্যোপাসনা নিষেধ করেন।

শ্রীশ্রীবাবা।—সন্ধ্যোপাসনার অঙ্গীভূত আসন-মুদ্রাদির অভ্যাস নিষেধ আমিও করি। কারণ, এই সময়ে দৈহিক বিশ্রামের প্রয়োজন খুব বেশী। কিন্তু ধ্যান ও নামজপে নিষেধ করি না। দেহ রুগ্ন হ'লে গুরুপাক পথ্য বর্জ্জন ক'রে সব ডাক্তারই লঘুপাক পথ্য দেন,—এখানেও ব্যাপারটা তাই। তবে এখানে কথাটা হচ্ছে মানসিক পথ্যের। রজঃস্বলা অবস্থায় গুরুতর মানসিক পরিশ্রম কর্লে স্রাবের স্বাভাবিক গতি পরিবর্ত্তিত হ'তে পারে, তাতে জরায়ুর বা মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য বা রক্তাল্পতা ঘটে রোগ হ'তে পারে, এজন্যই কঠোর কৃচ্ছ্রমূলক ধ্যানজপাদি এই সময়ে না করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু আমাদের সাধন বড় সহজ সাধন, দেহ-মনের উপরে এমন কোনো উৎপীড়ন বা জবরদস্তি এই সাধনে নেই, যাতে রুগ্ন অবস্থাতেও তার কোনো প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে। এজন্যই রজস্বলা অবস্থায় সাধন বন্ধ রাখ্‌তে আমি কখনো উপদেশ দিই না।

অপবিত্র দেহে ঈশ্বর-সাধন

প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—অপবিত্র দেহে কি ঈশ্বর-সাধন সঙ্গত?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাধারণতঃ দেহের পবিত্রতা বিধান ক'রে নিয়েই পরমাত্ম-সাধনে বসা উচিত। কারণ, দেহকে শুচি কত্তে গেলেই মনও স্বভাবতই একটা শুচিতা প্রাপ্ত হয়, দেহের শুদ্ধি-বিধানের চেষ্টায় মনেরও শুদ্ধি-বিধান ঘটে। বিশেষ বিশেষ নির্দ্দিষ্ট সময়গুলিতে সাধন-ভজন কত্তে বস্‌লে এই জন্যই নির্ম্মল দেহ, বিধৌত বস্ত্র, পবিত্র আসন ও শুচি স্থানের

প্রয়োজন। কিন্তু অহর্নিশ যে ভগবানকে ডাকবে, তার দৃষ্টি শুচি-অশুচির দিকে না গিয়ে নিরন্তর ভগবানেরই দিকে থাকা উচিত। ধ্যান-জপের নির্দ্দিষ্ট সময়গুলিতে স্থানের, আসনের, বস্ত্রের ও দেহের শুদ্ধি রক্ষা ক'রে অপর সকল সময়ে বাহ্য শুদ্ধির আড়ম্বরের দিকে উদাসীন থেকে নিজ সাধন ক'রে যাওয়া কর্ত্তব্য।

রজোনিস্রাব স্তব্ধ করার সামর্থ্য

প্রশ্ন।—রজস্বলা অবস্থাতে ত' নির্দ্দিষ্ট সময়গুলিতে দৈহিক শুচিতা রক্ষার চেষ্টা চল্‌তে পারে?

শ্রীশ্রীবাবা।—পারে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে নয়। নিজ জরায়ুর উপরে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ক'রে যে-কোনও সময়ের জন্য রজঃস্রাবকে স্তব্ধ ক'রে রাখার সামর্থ্য অনেক সাধিকারই থাকে। কিন্তু এ সামর্থ্যের প্রয়োগ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। স্বভাবের পথে প্রত্যেক নারীর দেহে তিন-দিবসব্যাপী যে বিপর্য্যয় আপনি আসে, তার উপরে ঔষধের বলেই হোক্ আর ইচ্ছার বলেই হোক্, কোনো নির্য্যাতনই দেহের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। রজঃস্বলা হয়েছে ব'লেই কোনও নারীর উচিত নয় নিজেকে অপরাধিনী মনে করা। মাঝে মাঝে নিদ্রাযোগে কিঞ্চিৎ শুক্র-ক্ষরণ হ'য়ে যাওয়া যেমন অধিকাংশ পুরুষের পক্ষে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার মাত্র, মাসে একবার ক'রে ঋতুমতী হওয়াও রমণীমাত্রেরই পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। এজন্য নিজেকে অপরাধিনী বা হেয় মনে করাও যেমন ভুল, ঋতুস্রাবকে বন্ধ ক'রে রাখ্‌বার চেষ্টাও তদ্রূপ ভুল। পাইখানায় বসেও ত' আমি নামজপ করিরে! তাতে আমার কোনো অপরাধ কখনো হয়নি। রজস্বলা অবস্থায় ভগবানের নামজপ কর্ল্লেই বুঝি নারীদের যত অপরাধ হ'য়ে যাবে!

রজস্বলা-নারীর মন্দির-প্রবেশাদি

প্রশ্ন।—রজস্বলা নারীর পক্ষে কি ঠাকুর ঘর, দেবমন্দির প্রভৃতিতে প্রবেশ করা কিম্বা দেববিগ্রহাদি স্পর্শ করা উচিত?

শ্রীশ্রীবাবা।—প্রাণের আবেগের দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে অনুচিত

বলব না। কিন্তু সমগ্র দেশের সাধারণ সদাচারের বিধি উল্লঙ্ঘন ক'রে এই অবস্থায় এরূপ না করাই সঙ্গত। দেবতা নিত্য-পবিত্র, তিনি কি কখনো অপবিত্র হন? কিন্তু যে বিগ্রহ একা আমারই পূজার জন্য নয়, যে বিগ্রহের মধ্যবর্ত্তিতায় আরো অনেক মানবাত্মা অধ্যাত্মিক সাধন ক'রে জীবনকে সার্থক কত্তে চান, তার উপরে আমার একার দাবী খাটাতে যাওয়া অসঙ্গত।

প্রশ্ন।—বিগ্রহটী বা পূজাঘরটী যদি ঐ রমণীর একার জন্য হয়?

শ্রীশ্রীবাবা।—এখানে কোনো বিধিও নেই, নিষেধও নেই। ভক্তের প্রাণ যখন যা চায়, তখন তাই কত্তে পারে। তথাপি, সদাচার সদাচারই। সদাচার লঙ্ঘন করা সঙ্গত নয়।

রজঃস্বলা নারীর গুরু-প্রণাম

প্রশ্ন।—রজস্বলা নারী কি নিজ গুরুদেবেরও পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম কত্তে পারে না? তার যদি জ্ঞান থাকে যে, গুরুদেবই সর্ব্বদেবদেব?

শ্রীশ্রীবাবা।—তিনটী দিন বই ত নয়! আর্য্য-সদাচার লঙ্ঘন করা আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

প্রশ্ন।—গুরুদেবের প্রতিমূর্ত্তি স্পর্শ কর্লে?

শ্রীশ্রীবাবা।—তাতে নিষেধ নেই, যদি এই প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ না হ'য়ে থাকে।

২০শে বৈশাখ, ১৩৩৮

গুরুই গঙ্গা

রহিমপুরের ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং আরও কতিপয় ব্রহ্মচারী সেবক শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে আছেন। শ্রীশ্রীবাবা রাত্রি থাকিতেই ডালপা হইতে রওনা হইয়াছেন, কমলাসাগর যাইবেন। কুটির বাজারে আসিয়া সূর্য্যোদয় হইল। বাজারের মধ্যেই একটী পুকুর আছে, তাহাতেই সকলে প্রাতঃস্নান সারিলেন। পুকুরে জল অতি অল্প, সংস্কারের অভাবে বিশাল জলাশয় মৃত-রাজহস্তীর ন্যায় পড়িয়া আছে, কটিদেশ পর্য্যন্তও জলে ডোবে না। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র স্নান করিতে করিতে গুরু-স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন।

জনৈক সঙ্গী বলিলেন,—গিরিশ দা, জলে নেমে গঙ্গা-স্তোত্র পাঠ কত্তে হয় যে!

শ্রীযুক্ত গিরিশ হাসিয়া উত্তর করিলেন,—গুরুই গঙ্গা, পৃথক্ গঙ্গা মানি্ না।

নামের সেবকই সত্যের সেবক

স্নান সমাপন করিয়া সকলে পথিপার্শ্বেই একস্থানে বসিয়া নিজ নিজ ধ্যানাদি সমাপন করিলেন। ডাল্পা গ্রামবাসী জনৈক ভক্ত যুবক শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গেই আছেন। তিনি নিজ গৃহ হইতে সদ্যঃপ্রস্তুত কতকগুলি খাবার আনিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা গ্রহণ করিলে সকলে প্রসাদ পাইতে আত্মনিয়োগ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—শ্রীভগবানই নিত্য সত্য, তাঁর নামই সত্য, তাঁকে ছেড়ে যত কিছু, সবই অসত্য, তাঁর নাম ছাড়া যত কিছু সবই খণ্ড ও অচিরস্থায়ী। তাঁর যে পূজা করে, তাঁর নামের যে সেবা করে, সেই সত্যের পূজারী, সেই সত্যের সেবক।

নামের সেবকই যথার্থ বীর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জগন্ময় তোমরা বীর খুঁজে বেড়াচ্ছ ত? নামের সেবা যে একনিষ্ঠ প্রযত্নে কত্তে পারে, জগতে সেই হচ্ছে পয়লা নম্বরের বীর।

মান যশ লোভ নাহি করে, ডুবে থাকে নাম-রসে
প্রলোভন দেখি নাহি ডরে, রাখে সে জগৎ বশে।

নাম-সেবকের শ্রেষ্ঠতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নামের যে সেবক, সেই শ্রেষ্ঠ, সেই পূজ্য, সেই মহামহীয়ান্ মহাপুরুষ। নামকে যে ভালবাসে, অর্থের হিসাবে দীন-দরিদ্র হ'লেও, যথার্থ পক্ষে সেই হচ্ছে জগতের সেরা ধনী। শ্রীভগবানের পরমমঙ্গল নাম যার ধ্যান, নাম যার জ্ঞান, তার কাছে রাজপ্রাসাদও তুচ্ছ, চতুর্দ্দোলাও হেয়, বংশের আভিজাত্যও নগণ্য। যে রসনা দিনান্তে একবার সত্যগুরুর সত্যনামের জয়ধ্বনি দিল না, সেই রসনা অষ্টপ্রহর ছত্রিশ রাগিণীর চর্চ্চা কর্ল্লেই বা তাতে কি আসে আর কি যায়? যে দেহ দিনান্তে একবার ভগবানের

পায়ের কাছে এসে লুণ্ঠিত হ'য়ে পড়্‌ল না, সেই দেহ কুস্তি-কসরতের দু'হাজার কৌশল রোজ অভ্যাস কর্‌লেই বা তাতে কি সার্থকতা? রূপ-যৌবন, বল-বিক্রম, সুকণ্ঠের মাধুরী সবই ত' চিতা-শয্যায় ভস্ম হ'য়ে যাবে,—সঙ্গে যাবে সত্য, সঙ্গে যাবে প্রেম, আর সঙ্গে যাবে মঙ্গলময়ের প্রতি ভাবুকের নিবিড় নিষ্ঠাটুকু।

জীবনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইও না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দুর্ল্লভ জীবন মনুষ্যের, আর এই জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্ল্লভতর। জীবনের উদ্দেশ্যকে বাবা ভুলে যেও না। কর্ম্মের হট্টগোলে ভুলে যেও না, তোমরা শুধু কর্ম্মীই নও, তোমরা কর্ম্মযোগী, কর্ম্মের ভিতর দিয়ে যোগ-লাভ তোমাদের পন্থা, যোগের ভিতর দিয়ে কর্ম্ম করা তোমাদের কৌশল, কর্ম্মের সাথে যোগের আর যোগের সাথে কর্ম্মের পূর্ণ সমন্বয় সাধন তোমাদের তপস্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য। চতুর্দ্দিকের কলরোলে এই নিগূঢ় সংবাদ বিস্মৃত হয়ো না, বাহ্য কোলাহলের তুমুল আকর্ষণে নিজ নিজ জীবনের ভারকেন্দ্র থেকে দূরে যেন বাবা স'রে প'ড়না, কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের মত বৃথা ছুটাছুটি ক'রেই জীবনটা পণ্ড ক'রে দিও না।

নামই কর্ম্মীর জীবনের ভারকেন্দ্র

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—চতুর্দ্দিকের সহস্রমুখিনী সংঘাতবতী তরঙ্গমালার অফুরন্ত আক্রোশে জীবন-তরণী যখন টাল খেয়ে পড়্‌তে চায়, জান্‌বে ভগবানের পরমপবিত্র মহানাম তখন তোমার জীবনের ভারকেন্দ্র-রক্ষক। ঝটিকাহীন নদীবক্ষে নাম তোমার নৌকার পাল, জীবনের গতিকে সে দ্রুত করে, লক্ষ্যাভিমুখী করে। আর ঝড়-বাদলের আঁধার রাতে নাম তোমার নঙ্গর, নিশ্চিত ধ্বংশ থেকে সে তোমাকে রক্ষা করে, একটী স্থানে দৃঢ় ক'রে ধ'রে রেখে তোমাকে ঝঞ্ঝাক্ষিপ্তা প্রকৃতির উন্মত্ত পদতলে পিষ্ট হয়ে অস্তিত্ব হারাবার নিদারুণ সম্ভাবনা থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

নামের সাধক, লোভহীন হও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নামের সাধক, তুমি লোভ-লালসায় জড়িয়ে পড়ো না, ক্ষুদ্র ধনে ক্ষুদ্র তুষ্টিতে আসক্ত হ'য়ে নিজেকে অপমানিত করো না, তোমার

ইষ্টকে অপমানিত করো না। সোণার থালায় আহার্য্য গ্রহণের তোমার কোন্ প্রয়োজন, কলার পাতে ভাত খেলে কি পেট ভরে না? রেশমের জামা গায়ে দেবার তোমার কোন্ প্রয়োজন, কার্পাসের বস্ত্রে কি শীতাতপ-লজ্জা-নিবারণ হয় না? রাজভোগে তোমার কোন্ প্রয়োজন, কোটি কোটি দীন-দরিদ্র নিত্য যে খাদ্যপানীয়ে জীবন ধারণ কচ্ছে, তাতেই কি তোমার দেহের দাবী পূরণ হয় না? দেহ যদি দাবী করে, তার দাবী মিটিও, কিন্তু মনের দাবীকে আমলেই এনো না। লোভ-লালসার অতীত হও, ভোগ-বিলাসের উর্দ্ধে যাও, যাঁর প্রতি লোভ এলে সকল লোভ পালিয়ে যায়, যাঁর প্রতি লালসা এলে সকল লালসা স্তম্ভিত হয়, তাঁর প্রতি লোভ কর, তাঁর প্রতি লালসা কর। ভগবানকে ভালবাসার বিনিময়ে যদি দারিদ্র্য তোমাকে পীড়ন করে, তবে সে দারিদ্র্যকে তুমি সাদরে অভিনন্দন কর, পূজার অর্ঘ্য দিয়ে তাকে স্বালয়ে আহ্বান কর। সহস্রতল স্ফটিকহর্ম্ম্য ধূলায় গড়াগড়ি যাক্; তোমার জীর্ণ-শীর্ণ পর্ণকুটীরই জগতের সবচেয়ে সেরা অট্টালিকা। বিদুরের ঘরে ক্ষুদের কণায় শ্রীভগবানের নিত্যলোভ, দুর্য্যোধনের রাজভোগে তাঁর উপেক্ষা, তাঁর বিরাগ।

ভক্তদেহই ভগবানের মন্দির

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মঠ, মন্দির, আশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'রে তার মধ্যে ভগবান্‌কে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা ক'রে কি হবে বাবা, তিনি ত কাঠে, মাটিতে, পাথরে, ইটে, চুণে, সুরকীতে আটক পড়ার পাত্র নন বাপধন! অসীম তিনি, সসীমে থাকৃতে পারেন না, তা' নয়। কিন্তু বাঁধা পড়েন না। মা যশোদার দাম-বন্ধনের ন্যায় তাঁকে বেঁধে রাখবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়ে যায়। আছেন সব কিছুতেই, কিন্তু বাঁধন মানেন না কারো,—বাদে ভক্তের হৃদয়। ভক্তের হৃদয় তাঁকে বাঁধতে পারে, ভক্তির ডোরে তাঁকে ধ'রে রাখ্‌তে পারে, কারণ ভক্ত-দেহই শ্রীভগবানের মন্দির। ভক্ত-দেহে শ্রীভগবান্ তাঁর পুণ্যময় সিংহাসন বড় প্রীতি-ভরে রচনা করেন। তোমাদের দেহ সেই পুণ্য-পীঠস্থান হোক, নামের পবিত্র ধ্বনি প্রতি অণুপরমাণুতে পুণ্য-সঞ্চার করুক, প্রতি অঙ্গস্পন্দন ইষ্ট পূজার আরতির মধুময় ঝঙ্কার তুলুক, এই জড়দেহ, ক্ষণস্থায়ী এই ভঙ্গুর দেহ চৈতন্যের

অধিষ্ঠানভূমি হোক্। মঠ, মন্দির স্থাপনের আকাঙ্ক্ষাকে গুটিয়ে নাও দিগ্দেশ-ব্যাপী শাখাপল্লবান্বিত কর্ম্মতালিকাকে একটু খর্ব্ব কর, নিজের জীবনের ভিতরে আগে আশ্রমের সৌন্দর্য্য, মন্দিরের মাধুর্য্য, মঠের মহিমা ফুঠে উঠুক। নামের সেবা কর, অন্তরের দেবতাকে জাগাও, তাঁর জাগরণের জয়ধ্বনির সাথে তোমার বহির্ম্মুখ কর্ম্মজীবনের অভাবনীয় ভাঙ্গা-গড়া সুরু হোক্।

দেবতার মন্দির তোমার মনে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অমুক খানে দেখে এলুম এক বিরাট দেবমন্দির তৈরী হচ্ছে, ইট, চূণ, সুরকীর ছড়াছড়ি,—একটা দালান উঠ্‌বে সত্যিই কিন্তু মন্দিরই ওটা হবে কি না—কে জানে? দেবতার মন্দির তোমার মনে।

শুদ্ধ দেহে শুদ্ধ মন সহজে প্রকাশ,—
শুদ্ধ মনে ইষ্ট মোর নিত্য করে বাস।

কাঞ্চন মন্দির ধ্বসে পড়ুক, কি যায় আসে? কারণ, বাইরের কাঞ্চন সব সময়েই কাঞ্চন নয়, কখনো কখনো সে দারিদ্র্যের বিকশিত দ্রংষ্ট্রাপংক্তি। বাইরের সমৃদ্ধি সব সময়েই সমৃদ্ধি নয়, কখনো কখনো সে চিরদৈন্যেরই প্রকটতর মুর্ত্তিমাত্র। পর্ব্বতগুহার বন্ধুর পৃষ্ঠে জীর্ণ অজিনাসন পে'তে ব'সে কি ঋষিরা ভগবান্‌কে পান নাই? আরণ্যভূমির কণ্টকগুল্মের পার্শ্বে ব'সে ধ্যান জমিয়ে কি সাধু সজ্জনেরা তাঁকে লাভ করেন নাই? বৃক্ষচ্ছায়ায় আসন রচনা ক'রে কি ধ্যানস্থ যোগীর ভাগ্যে তাঁর সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে নাই? আসল মন্দির ইমারত নয়, দালান-বালাখানা নয়, আসল মন্দির তোমার মনে, তোমার প্রাণে তোমার হৃদয়ে। বাইরের বিচার ধু'য়ে যাক্, মুছে যাক্—অমৃতের শিশু, অন্তরের অমৃতে ডুব দাও,—আনন্দের শিশু, অন্তরের আনন্দে নিমজ্জিত হও।

আশুতোষ চক্রবর্ত্তী

বেলা প্রায় আট ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা স্বগণে পরিবৃত হইয়া কমলা-সাগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাঘাউড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কমলাসাগরে বাসা-বাড়ী আছে। তিনি সকলকে মহা-সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে এই একটী ব্যক্তি

শ্রীশ্রীবাবাকে যে ভাবে নানা সময়ে সেবা করিয়াছেন, তাহার ইতিবৃত্ত চিত্তা-কর্ষক না হইতে পারে, কিন্তু এই প্রগাঢ় অনুরাগ, এই অকৃত্রিম প্রীতি ও এই অনবদ্য শ্রদ্ধার স্মৃতি শ্রীশ্রীবাবার অধিকাংশ সন্তানই সুগভীর শ্রদ্ধার সহিত চিরকাল স্মরণে রাখিবেন। শ্রীশ্রীবাবার দৈবী প্রতিভা বিশেষ করিয়া ত্রিপুরা জেলার অসংখ্য তপ্ত প্রাণে শীতলতা বিধানে নিয়োজিত না হইয়া অন্যত্রও নিজ ক্ষেত্র খুঁজিয়া লইতে পারিত, কিন্তু সপরিবারে যাঁহার অননুকরণীয় প্রেম শ্রীশ্রীবাবাকে এই জেলাটার মধ্যেই স্বকীয় আশীষ বিকীরণ করিতে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, ভুলিলে চলিবে না যে, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী।

জ্যেষ্ঠ না শ্রেষ্ঠ ?

শ্রীযুক্ত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্প্রতি কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের সহিত মনোমিলনের অভাবহেতু মানসিক বড় ক্লেশে আছেন। তিনি ক্ষমার দৃষ্টিতে সকলকে দেখিতে চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আপনি সহোদরদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। বয়সে এই জ্যেষ্ঠত্বের পরিচয় হবে না, আপনার স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্বের মধ্য দিয়েই জ্যেষ্ঠত্বের প্রকৃত পরিচয় হবে। নিজের সহস্র ক্ষতিতেও দ্বিধাহীন হ'য়ে কনিষ্ঠদের জন্য হাসিমুখে যথাসাধ্য স্বার্থ বর্জ্জন করুন, সানন্দে তা'দিগকে আশীষ দান করুন যেন তারা শত দুর্ব্যবহারের বিনিময়েও শুধু মঙ্গলই আহরণ করে, দুঃখের মুখ তারা কখনো না দেখে। আশীর্ব্বাদের শক্তিতেই আপনি দুর্জ্জয় হবেন, বিরোধের তীক্ষ্ণ তরবার জ্যেষ্ঠের হাতে শোভা পাবে না।

আশুবাবু খুব শ্রদ্ধা ও তৃপ্তির সহিত পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহ সমর্থন করিলেন।

ভারতীয়তার বিস্মৃতি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই যে আজ ঘরে ঘরে ভ্রাতৃবিরোধের বিদ্বেষানল প্রজ্জলিত হ'য়ে উঠেছে, একশ' বছর আগের লোক কল্পনায়ও এই চিত্র আঁকতে পারত না। ছোট ভাই হ'য়ে বড় ভাই-এর বিরুদ্ধতা কর্ব্বার চিন্তাও তারা মনে আন্তে পারত না। বড় ভাই হ'য়ে ছোট ভাইকে প্রতারিত করার বুদ্ধি তাদের মগজের ভিতরে ঢুকত না। আজ একটা কনে-বৌ মত্ত হস্তীর মত পাঁচটা ভাইকে দিয়ে রোজ তিনবার ক'রে ষাঁড়ের লড়াই করিয়ে নিতে

পারে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, আমরা যে ভারতীয়, এই বিষয়ে আমাদের বিস্মৃতি এসে গেছে। আমরা এখন পৃথিবীর অপর দশটা দেশের আচার ব্যবহার দেখে একান্নবর্ত্তী পরিবারের দোষগুলিই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বড় ক'রে দিচ্ছি, আমাদের নিজস্ব সভ্যতার যা দান, আমাদের নিজস্ব কৃষ্টির যা পুরুষ-পরম্পরাগত সৌন্দর্য্য, তার মধ্যে টেনে এনে পাশ্চাত্য ঘূণকে বাসা বাঁধতে দিচ্ছি, নিজেদের সুখশান্তির মূলদেশে নিজেরাই কুঠারাঘাত কচ্ছি।

সৌভ্রাত্র্যের ধ্যান

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু এখনো ফির্‌বার পথ আছে। ঠিক্ আগেকার জীবন-যাপনের ঢংটিতে আমরা ফিরে যাব কি না, সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের প্রবৃত্তি-পন্থা যেভাবে আমাদের সহজতৃপ্তিশীল উদার মনকে ক্ষুদ্রের দিকে, তুচ্ছের দিকে, হেয়ের দিকে অবিরাম উন্মার্গগামী ক'রে দিচ্ছে, তার কবল থেকে নিজেদিগকে বাঁচিয়ে নেবার সময় এখনো আছে। এখনো প্রত্যেক গৃহ-জননী স্তন্য-ধারার সাথে সৌভ্রাত্র্যের অবদান প্রতি সন্তানে বিতরণ কত্তে পারেন, শিশুঘাতিনী পুতনার কুটিল কুচক্র ব্যর্থ কত্তে পারেন। এই দেশেরই রাজপুত্র লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের অনুগমন ক'রে বনে গিয়েছিলেন, পত্নীসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে, রাজসুখ তুচ্ছ ক'রে, চতুর্দ্দশ বর্ষকাল ব্রহ্মচারি-ব্রতে অবস্থান করেছিলেন, এই দেশেরই রাজপুত্র ভরত মাতৃবরে রাজসিংহাসন পেয়েও রাজার মত সেই সিংহাসনোপরি আসীন হন নাই, রাজভৃত্যের মত সিংহাসনের ছায়ায় ব'সে রাজা রামচন্দ্রের পাদুকা দীর্ঘ চতুর্দ্দশবর্ষকাল পূজা ক'রে নিষ্কাম নিঃস্বার্থ চিত্তে প্রজাপালন করেছিলেন; দুঃখ, কষ্ট, কৃচ্ছ্র লক্ষ্মণকে টলাতে পারে নি, লোভ, লালসা, কর্ত্তৃত্বলিপ্সা ভরতকে বিচলিত কত্তে পারেনি; সমগ্র জগতে অতুলনীয়, বিশ্বসাহিত্যে অদ্বিতীয়, এই অসামান্য সৌভ্রাত্র্যের কাহিনী যে জাতির শৈশবের উপবনে প্রতি উদ্গতাঙ্কুর মানববৃক্ষের মূলদেশে সার-সঞ্চার ক'রেছে, সেই জাতির ঘরে ঘরে যে আজ ভ্রাতৃ-বিরোধ, তার কারণ, রামায়ণ মহাগ্রন্থকে আমরা আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষদের ইতিবৃত্ত ব'লে আর মনে করি না, আমাদেরই অতীতের গৌরব-কাহিনী ব'লে বিশ্বাস করি না,

এমন কি কাব্য-মাত্র ব'লেও যখন মনে করি, তখনো মন দিয়ে একবার পড়ি না, সেক্‌স্‌পীয়ার, মিল্টন, গেটে নিয়েই আমাদের দিন কাটে, হোমার ভার্জ্জিলের পাতা গুণ্‌তেই আমাদের চ'খের চশমার কাচখণ্ড পুরু হ'য়ে যায়, আকৈশোর বাইরণ আর শেলী মুখস্থ ক'রে ক'রে বুড়ো হ'য়ে যাই, আত্মস্থতা হারাই, স্মৃতিবিভ্রম এসে যায়,—সমগ্র ভারতের সামাজিক জীবনকে, পারিবারিক জীবনকে সুন্দর ক'রে ধ'রে রেখেছিল যে সৌভ্রাত্র্যের ধ্যান, তাকে আজগুবি উপকথা ব'লে আমরা এক তুড়িতে উড়িয়ে দিই। প্রাচীনের সেই সৌভ্রাত্র্যের ধ্যানকে পুনরায় জমিয়ে তুল্‌তে হবে। ভারত নিজেকে এই পথেই ফিরে পাবে। তার সুপ্তপ্রায় সত্তার সাথে, তার হারানো মহত্ত্বের সাথে এই পথেই তার পুনরায় সাক্ষাৎকার লাভ হবে।

মহিলা-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী ও স্থান নির্ণয়ে বিবেচ্য

দ্বিপ্রহরের আহারাদি সমাপ্ত হইলে ঘণ্টা'দুই বিশ্রাম করিয়া শ্রীশ্রীবাবা সকলকে লইয়া নিকটবর্ত্তী একটী পার্ব্বত্য পল্লীতে রওনা হইলেন। এই পল্লীটীতে একজন কর্ম্মী ব্যক্তি একটী বালক-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। কর্ম্মিবরের একান্ত ইচ্ছা, এই বালক-বিদ্যালয়টীর সাথে ব্যাপকতর পরিকল্পনানুযায়ী একটী নারী-প্রতিষ্ঠান গঠন করা। ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার নিজ বসতবাটীটুকু সম্পূর্ণরূপে মহিলা-প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করিয়া রহিমপুরেই ইহা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন। কিন্তু উল্লিখিত কর্ম্মিবর কতকগুলি পার্ব্বত্য খিল বন্দোবস্ত নিয়া কমলাসাগর-অঞ্চলে নিজ তত্ত্বাবধানে এবং অবিলম্বে নারীপ্রতিষ্ঠান গড়িতে চাহেন। সকল দিক্ না বুঝিয়া শ্রীশ্রীবাবা কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছুক নহেন।

পথে পথে ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—দেখ গিরিশ, কন্যাদান করার আগে যেমন কন্যার পিতা শতবার বিবেচনা করে যে, যার হাতে পাত্রী সম্প্রদান করব, সে কেমন লোক, তার চরিত্র কেমন, স্বাস্থ্য কেমন, তার পরিবারস্থ লোকদের স্বভাব কেমন, তার আত্মীয়বর্গের চালচলন কেমন, যে গ্রামে প্রস্তাবিত বরের বাস

সেই গ্রামের জনসাধারণের নৈতিকতার মানদণ্ড কি প্রকার, মেয়েদের প্রতিষ্ঠান গড়্‌তে গেলেও ঠিক্ তেমনি বিশেষ বিবেচনা কত্তে হয় যে, যার উপরে ভার পড়্‌বে, সে রক্ষকবেশে ভক্ষক হবে কিনা, ন্যস্ত দায়িত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে সমর্থ হবে কিনা, যেই সব লোকের দ্বারা সে পরিবৃত, তাদের নৈতিক মেরুদণ্ড কিরূপ শক্ত, যে অঞ্চলে প্রতিষ্ঠান হচ্ছে, সেই অঞ্চলের লোকের চালচলন ও মনোভঙ্গী কি প্রকার, চারদিকের স্বাভাবিক আবেষ্টনগুলি নারীর সতীত্ববোধ ও পবিত্রতার ভাব উদ্দীপনের পক্ষে মুখ্যতঃ বা গৌণভাবে সহায়ক কিনা ;—ইত্যাদি। রহিমপুরই বল আর কমলাসাগরের পার্ব্বত্য খিলই বল, সব স্থান সম্পর্কেই এই কথাগুলি ভাব্‌বার রয়েছে।

২১ বৈশাখ, ১৩৩৮

প্রাতঃকালে কয়েকজনে মিলিয়া মহিলাশ্রম প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা হইতেছে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যুগ গিয়েছে বদ্‌লে, তাই মহিলাদের আলাদা প্রতিষ্ঠানের কথাটাও উঠেছে। নইলে, গার্হস্থ্যাশ্রমই মহিলাদের স্বাভাবিক আশ্রম। গার্হস্থ্যাশ্রম থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যখনি দলে দলে মেয়েদিগকে সন্ন্যাসিনী ক'রে মঠভুক্ত করা হ'তে আরম্ভ হ'ল, তখনি, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হ'য়ে ইতিহাসের বুকে হিসাব ক'ষে রেখে গেল যে, স্ত্রীজাতিকে তার স্বাভাবিক জননীত্ব থেকে, জায়াত্ব থেকে বঞ্চিত ক'রে সমাজকে লাভবান্ করা হয় কতটুকু আর পঙ্গু করা হয় কতটুকু।

বর্ত্তমান যুগে মহিলাদের আশ্রম প্রয়োজন কেন ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু কিছুদিন আগেও কন্যারূপে পিতৃগৃহে আর পত্নীরূপে স্বামিগৃহে রমণীরা নিজেদের ভিতরের সৌষ্ঠবকে যে ভাবে ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌তেন, এখন আর তা' পারেন না। যুগবিপ্লব আর ঐতিহাসিক ভাগ্য-বিবর্ত্তন, এই দুটো মিলেই এই অবস্থাটা আনয়ন করেছে। কুমারী অবস্থায় অন্তর্বত্নী হওয়া আর অসময়ে স্বামি-সঙ্গ করা কথা দুটা কিছুদিন আগেও একেবারে অশ্রুতপূর্ব্ব বস্তুই ছিল বল্লে দোষ হয় না। আর্য্য

না। ছোট্ট একখানা হীরার টুক্‌রো দু'লাখ ইটের টুক্‌রোর চেয়ে মূল্যবান্‌। যে আশ্রমীর জীবন যত মহৎ, তার সেবায় আশ্রমও তত মহৎ। পঙ্গু জীবনের উৎসর্গটাও পঙ্গুই হবে,—উৎসর্গ চাই অখণ্ড, তাই উৎসর্গের উদ্দেশ্যে সমর্পিত জীবনটাও চাই অক্ষত, নিখুঁত, অখণ্ড। সত্য কাজে যখনি হাত দেবে, সংখ্যাকে বড় ক'রে দেখ্‌তে বিরত হ'তেই হবে। সংখ্যার মোহ জগতে কত মহৎ ব্যক্তিত্বের বিনাশ সাধন ক'রেছে, কত মহৎ প্রতিষ্ঠানের মূলদেশ পর্য্যন্ত উৎখাত ক'রেছে, তার ইয়ত্তা নেই। এইত' আমি হাজার হাজার লোককে মন্ত্র দিয়ে বেড়াচ্ছি,—অবশ্য জীব-কল্যাণ-বুদ্ধি এর পশ্চাতে রয়েছে, নইলে সাধন দিতে পাত্তুম না,—কিন্তু এই সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে দু'একটী ব্যক্তিই কর্ম্মজীবনে আমার সহকারী হ'তে সমর্থ হবে। কারণ, সম্যক্‌ উৎসর্গ ছাড়া সত্যিকার সহকারিত্ব কেউ কত্তে পার্ব্বে না এবং সম্যক্‌ উৎসর্গ-তপঃশুদ্ধ, ব্রহ্মচর্য্যপুষ্ট, সংযমপূত আধারেই মাত্র সম্ভবে। অসংখ্য লোকের আমি ধর্ম্মগুরু, কিন্তু কর্ম্মগুরু থাক্‌ব মাত্র মুষ্টিমেয় দুই চারিজন কোহিনূর-তুল্য দুর্ল্লভ মনুষ্যরত্নের।

বীজ-বিতরণই সদ্‌গুরুর কাজ

নিকটে দ্বাদশ কাণি পরিমিত একটা খিল জমি পড়িয়া আছে। মহিলাশ্রম হইলে এখানে তাহার ফলোদ্যান করার কল্পনা চলিতেছে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মানুষের মনেও এই খিলটারই মত উপযুক্ত বীজের অভাবে শুধু কণ্টকের বীজই অঙ্কুরিত হচ্ছে, শাখাপত্রে প্রবর্দ্ধিত হচ্ছে। বটবৃক্ষের বীজ যদি এখানে কোনো রকমে পড়ে, তাহ'লে ক্রমশঃ বটের ছায়ায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার হ'য়ে পড়্‌বে, কাঁটার গাছ আপনি নির্জ্জীব হ'য়ে যাবে, ক্রমে হয়ত এই বটবৃক্ষকে অবলম্বন ক'রে কত নরনারী অখণ্ড দেবতার পূজা কর্ব্বে। এই রকম সব খিল জমিতে বটের বীজ ছড়িয়ে যাওয়াই সদ্‌গুরুর কাজ।

বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীবাবা সত্যসত্যই কতকগুলি কিসের বীজ মাটির মধ্যে ছড়াইয়া দিলেন। তৎপরে বলিলেন,—এখন যেমন বীজ ছড়ালাম,

এই রকম ক'রে বীজ ছড়ালে তাতে বটের গাছ নাও হ'তে পারে। কাকের পেটে গিয়ে জঠরানলের উত্তাপে যে বীজের বাহ্য আবরণ অনেকটা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে, ভিতরের শক্তি অতি সামান্য আনুকূল্যেই প্রকাশ পেতে পারে, তেমন বীজ চাই, তাতে শতকরা একশটা বীজেই গাছ গজায়।

জনৈক সহচর জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাইতেই শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বুঝতে পারিস্ নি! সদ্গুরু হচ্ছেন, কাক, অর্থাৎ কাকের মত যাযাবর, এক দেশ হ'তে অপর দেশে ভ্রমণ ক'রে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বটের বীজ ছড়িয়ে যাচ্ছেন,—যে বটফল তিনি নিজে খেয়েছেন, স্বাদ পেয়েছেন, যার সত্ত্বাকে তিনি জীর্ণ ক'রে পুষ্ট হয়েছেন, যে ফল তাঁর প্রাণকে দিয়েছে স্থৈর্য্য, মনকে দিয়েছে তুষ্টি, দেহকে দিয়েছে বল, আর রসনাকে দিয়েছে তৃপ্তি।

নাম তোমার জীবন হউক

সন্ধ্যাকালে মণিঅন্ধ নিবাসী একটী ধর্ম্মার্থী দীক্ষাগ্রহণ করিলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—Take the holy name as your whole life,—depend on it. নামকেই তোমার সমগ্র জীবনরূপে গ্রহণ কর,—এই বাক্য তোমার জীবনের বেদস্বরূপ হউক।

২২শে বৈশাখ, ১৩৩৮

সঙ্গীরা সকলেই রহিমপুর আশ্রমে পদব্রজে ফিরিবেন। শ্রীশ্রীবাবা কুমিল্লা-গামী রেলগাড়ী ধরিবার জন্য ষ্টেশনে যাইতেছেন। স্থানীয় একজন সদ্যো-বিবাহিত ভক্ত শ্রীশ্রীবাবাকে প্রত্যুদ্গমন করিতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবা যুবকটীকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

বিবাহিতের অধিকারের সীমা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিয়ে করেছ ব'লেই স্ত্রীর উপরে তোমার এমন কিছু অধিকার জন্মে যায় নি, যার বলে তুমি তার অসম্মান বা অনিষ্ট কত্তে পার। তোমার অধিকারের একটা সীমা আছে। এমন কি স্ত্রীও যদি তোমার হাতে অসীম স্বাধীনতা দিয়ে দেয়, তবু তুমি তার প্রতি যা-তা ব্যবহার কত্তে পার না। তার দেহের পূর্ণ পরিপুষ্টি আস্বার আগে তুমি তাকে কোনো ভোগমূলক

চেষ্টায় ব্যবহার কত্তে অধিকারী নও। তার জরায়ু প্রভৃতি অঙ্গে ঋতুস্রাব-জনিত বিক্ষেপ ও বিকার সম্পূর্ণরূপে শান্ত না হ'য়ে যেতে, তার অনুমতি সত্ত্বেও তুমি তার দেহকে যা-তা ভাবে ব্যবহার কত্তে পার না। ইন্দ্রিয়গুলি কি জন্য, এদের সার্থকতা কি, কখন কি ভাবে এদের ব্যবহার উচিত এবং অনুচিত, কোন্ অবস্থায় ইন্দ্রিয়-সেবা ধর্ম্মানুমোদিত আর কোন্ অবস্থায় অধর্ম্ম, কোন্ স্থলে স্বামীর কামুকতাকে দৃঢ়তার সহিত প্রতিহত করা স্ত্রীর কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞান দান ক'রে তার চক্ষু ফুটিয়ে দেবার পূর্ব্বে তুমি তাকে স্ত্রী ব'লে দাবী করার যোগ্য নও। স্ত্রীর ভিতরে যতখানি আত্মসম্মান জাগিয়ে তুমি দিতে পার্ব্বে, ততটুকুই তুমি তার সত্যিকারের আপন হবে। যতটুকু ধর্ম্মবুদ্ধি তুমি তার ভিতরে উদ্বুদ্ধ কত্তে পার্ব্বে, ততটুকুই তুমি তার আপন হবে। জ্ঞান দিয়ে যতটুকু তুমি তার সেবা কর্ব্বে, ততটুকুই তুমি তার আপন হবে। যে যার আপন, তার উপরে তারই অধিকার। যে অশিক্ষিতা মেয়েটীকে বিয়ে ক'রে ঘরে তুলে এনেছ, তাকে আগে শিক্ষা দাও, তার অজ্ঞান-তিমির দূর কর। মনুষ্যজন্ম লাভ যে কত দুর্ল্লভ, তা' তাকে বুঝ্‌তে শিখাও। কি ক'রে এই দুর্ল্লভাতিদুর্ল্লভ জন্মকে সার্থক কত্তে হবে, তার চিন্তায় তাকে ব্যাকুল ক'রে তোল। এই জন্মেই ভগবদ্দর্শন চাই, এই দেহেই ভগবৎ-প্রেমের অধিকারী হওয়া চাই, এই ব্যগ্রতা তার অন্তর বাহির মথিত ক'রে তুলুক।—তবে গিয়ে তুমি হবে তার স্বামী, সে হবে তোমার সহধর্ম্মিণী। তবে গিয়ে তার উপরে তোমার অধিকারের দাবী জন্মাবে। যে যার জন্য প্রাণ দেয় নাই, সে তার প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেল্‌তে পারে না।

বিবাহের অর্থ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিবাহের অর্থ কি শুধু ইন্দ্রিয়-সুখ ও ইন্দ্রিয়-সেবা? নিশ্চয়ই নয়। আত্মোৎসর্গের সাধনাই বিবাহের প্রাণ। বিশ্বদেবতার জন্য যে আত্মোৎসর্গ ক'রে উঠ্‌তে পারে না, খণ্ডদেবতার মধ্য দিয়ে সে আত্মসুখ বলি দেয়। স্বামী কি স্ত্রীর শুধুই স্বামী, সে কি পূজার ইষ্ট নয়? স্ত্রী কি

স্বামীর শুধুই স্ত্রী, সে কি অর্চ্চনার দেবী নয়? স্বামীর উপরে স্ত্রীর অধিকার মানে সম্ভোগের অধিকার নয়, খোরপোষ আদায়ের অধিকার নয়,—তাকে সেবা করার অধিকার, তার জন্য প্রাণ দেওয়ার অধিকার। স্ত্রীর উপরে স্বামীর অধিকার মানে ইতর সুখের পঙ্কিল প্রবাহে তাকে ভাসিয়ে দেবার অধিকার নয়,—তার যাতে অপূর্ণতা, তা' তাকে দিয়ে, তাকে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী ভগবতী-মূর্ত্তিতে পরিণত করার জন্য সর্ব্বতোমুখী সেবার অধিকার, তার জন্য আত্মাহুতি দেওয়ার অধিকার।

অপূর্ণ-যৌবনা স্ত্রীর সহিত সঙ্গম

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার স্ত্রীর যৌবন এখনো উদ্গত হয় নাই, তার দেহ অপুষ্ট, ইন্দ্রিয়নিচয় অবিকশিত, জরায়ু অগঠিত, শারীরিক ধর্ম্ম অনিয়মিত,—আর তুমি এখনি তাকে শয্যার সঙ্গিনী করার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে পড়েছ। কুকুরগুলিও এরূপ করে না, তারাও সময় অসময় বাছে, কিন্তু তুমি বাছ না, তোমার মত আরো শত সহস্র যুবক তা' বাছে না। বলি, তোমরা মানুষ না পশু? অথবা পশুরও অধম? একটা বিয়ে করার জন্য জন্ম থেকে আজ পর্য্যন্ত বাইশটা বছর অপেক্ষা কত্তে পেরেছ, আর স্ত্রীর দেহটা গ'ড়ে উঠ্‌বার জন্য আর দুই চারটা বছর অপেক্ষা কত্তে পার না? পার, কিন্তু এমনি জ্ঞানশূন্য যে, পেরেও কর না। অপেক্ষা করার শক্তি তোমাদের আছে,—নাই শিক্ষা। শিক্ষার অভাবে তোমার এই দুর্গতি। আজ নূতন করে সংযমের পাঠশালায় হাতেখড়ি দাও; সঙ্কল্প কর, অতীতে যা' ভুল করেছ, সেই ভুল ফিরে আর কর্ব্বে না।

নর-নারীর ভোগেন্দ্রিয়-নির্ম্মাণে বিধাতার অপূর্ব্ব কৃতিত্ব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বাপুহে, তোমার আমার চাইতে বিধাতা কিছু কম কৌশলী কারুকর নন। তাঁ'র সৃষ্টির সব জায়গায় অপূর্ব্বত্ব, সব জায়গায় কৃতিত্বের পরিচয়। নরনারীর ভোগেন্দ্রিয়গুলিও তিনিই তাঁর নির্ভুল হস্তে নিজের চ'খে দেখে-শুনেই নির্ম্মাণ করেছেন। ধৈর্য্য অবলম্বন ক'রে বিধাতার কাজটুকু বিধাতাকে শেষ ক'রে দিতে সময় দাও। শৈশবের বনিয়াদের

উপরেই কৈশোর দাঁড়ায়, কৈশোরের বনিয়াদের উপরেই যৌবন দাঁড়ায়। কৈশোরটাকে পূর্ণ হ'তে দাও, পাকা-পোক্ত হ'তে দাও, দেখ্‌বে যৌবন তখন তার সবগুলি পাখায় ভর ক'রে হঠাৎ একদিন এক নিমেষের মধ্যে তোমার চ'খের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে তোমার স্ত্রীর বিগ্রহে রূপান্বিত হ'য়ে। ভোগই যদি কত্তে হয় বাপ্‌, তবে তখন ভোগ ক'রো। সৌরভই যদি পেতে চাও, আগে ফুলটাকে ফুট্‌তে দাও। ভোগের যোগ্য হবার আগেই বলপ্রয়োগ কচ্ছ, ফুটে ওঠ্‌বার আগেই টানা-হ্যাচড়া আরম্ভ করেছ, তাই ভোগও হচ্ছে অসম্পূর্ণ, এই ভোগের তৃপ্তিও হচ্ছে অসম্পূর্ণ। যৌবন যেখানে দুদিকেই জাগে নাই, সেখানে একজন ভোগের লোভে করে অত্যাচার, আর একজন চক্ষু বু'জে নির্জ্জীব প্রস্তরের মত সহ্য করে অপমান। এই অপবাদকে ভারতীয় গার্হস্থ্যের পুণ্যজীবন থেকে তোমরা আজ নির্ব্বাসিত কর বাপধন। ভোগেন্দ্রিয়কে বাদ দিয়ে স্ত্রীকে চিন্তা করা যদি একান্ত অসম্ভব হয়, তবে সেই ইন্দ্রিয়ের সাথে সাথে ইন্দ্রিয়-স্রষ্টার আশ্চর্য্য কৌশলকেও চিন্তা কর। স্ত্রী-পুরুষের ইন্দ্রিয়-সংযোগ এক অত্যদ্ভুত, ব্যাপার সৃষ্টিকর্ত্তার একটুখানি ভুল হ'য়ে গেলে জীবের এত সুখের মোহ আর এত আবেগের তরঙ্গ একটী নিমেষে খতম হ'য়ে যেত। কত দূর-দূরান্তরের মানব-মানবীর দেহ তিনি এনে একত্র মিলিয়ে দিচ্ছেন, আর এমন অদ্ভুত ভাবে খাপ খেয়ে যাচ্ছে, যেন তিনি স্কেল হাতে নিয়ে মেপে জুখে জীবদেহ নির্ম্মাণ করেছেন। যোনিগত যার মন, এই চিন্তাতে ত' তারও মন থেকে ক্লেদ-কালিমা দূর হ'য়ে যায় রে!

অনাগত-যৌবনার যৌবন-বিকাশের সহায়সমূহ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এমন স্ত্রী আছে, বয়সে যে যুবতী, কিন্তু দেহে যে কিশোরী মাত্র। এসব স্থলে জরায়ুর ক্রিয়া-শোধক উপায় অবলম্বন কত্তে হয়, ডিম্বাধারের (Overy) শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা দেখ্‌তে হয়। অশোক ও ওলটকম্বলের ছাল এই বিষয়ে উৎকৃষ্ট ভেষজ। জরায়ু মধ্যে ইষ্ট ধ্যানের দ্বারা এই বিষয়ের মানস-চিকিৎসাও সম্ভব। আর, সঙ্কিনী-মুদ্রার অভ্যাসের দ্বারা অগঠিত ভোগেন্দ্রিয় অতি দ্রুত সুগঠন প্রাপ্ত হয়। সঙ্কিনী-মুদ্রা কেবল

ভোগোত্তেজনার উপশমই করে না, ইন্দ্রিয়ের দৃঢ়তাও বর্দ্ধন করে। মোট কথা, প্রত্যেক রমণীকে যোগেশ্বরী মহামায়ায় পরিণত কত্তে হবে—তারপর মা প্রবৃত্তির পথে লেলিহান রসনা বিস্তারিতই করুন, আর নিবৃত্তের পথে দশনের চাপে জিহ্বা সংযতই করুন।

সম্ভোগ-প্রবৃত্তির নিগূঢ় অর্থ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বাইরের দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পাচ্ছ ভোগ, কিন্তু ভোগের ভিতরে সূক্ষ্ম প্রেরণাটা কি, তাও যে দেখ্‌তে হবে। বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে, দেহ দেহকে পাবার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু ব্যাপারটার কি এইখানেই শেষ? দেহ দেহকে পেলেই যদি চুকে যেত, তবে দেহের সাথে দেহের সর্ব্বাঙ্গীন মিলনের পরেও আবার বক্ষপঞ্জর-বিচূর্ণন-প্রয়াসী নিবিড় আলিঙ্গন কেন? কণ্ঠের হার তখন প্রেমের কেন বাধা? বুকের পাঁজর তখন মিলনের কেন বিঘ্ন? কারণ, যাকে তুমি চাও, তা ত' বাবা ঐ দেহটাই নয়! যাকে তুমি চাও, সে বাস করে ঐ দেহটার ভিতর! মূল্যবান্ সে, তাই তাকে বক্ষ-পঞ্জরের শক্ত সিন্দুকের ভিতরে অতি অলক্ষিতভাবে সঙ্গোপনে রাখা হয়েছে। তুমি যে রত্নের ভিখারী, সে রয়েছে ঐ সিন্দুকের ভিতরে। অন্যভাবে তাকে পাচ্ছ না, তাই হাতুড়ী মেরে সিন্দুক ভাঙ্গতে চাচ্ছ,—এই হচ্ছে দেহের সাথে দেহের নিবিড় আলিঙ্গনের গূঢ়তম অর্থ। আত্মা আত্মাতে মিল্‌তে চায়, আত্মার কাছে আত্মাকে টেনে নেবার জন্য দেহ করে মধ্যবর্ত্তিতার কাজ, কিন্তু যার সঙ্গে যার কারবার, তার সঙ্গে লেনা-দেনা আরম্ভ হ'য়ে গেলে দোভাষী নিষ্প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়ে, দেহের তখন কদর কমে যায়ই যায়।

পুরুষ ও নারীর আত্মিক মিলনে শক্তি-সাম্য

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আত্মিক মিলনের দিকে একটু গতি বেড়ে গেলেই দেহ আর দেহের বন্ধুও থাকে না, শত্রুও থাকে না, থাকে উদাসীন বা ভাড়াটে বাড়ীর মত সাময়িক যত্ন-আদরের পাত্র,—আত্মার সাথে তখন আত্মার চলে রমণ, আত্মার সাথে তখন আত্মার চলে সুখ-সম্ভোগের দান ও প্রতিদান, আত্মাকে তখন আত্মা বক্ষ প্রসারিত ক'রে ধারণ করে, আত্মাতে তখন আত্মা

নিঃশেষে সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রে ডুবে যায়। আধ্যাত্মিক শক্তি-সাম্যের প্রক্রিয়া-গুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে এই রমণ, একটী দেহ অপর দেহের সাথে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যোগে ঐক্যসাধন কত্তে চেষ্টা ক'রে দেহের ধর্ম্মের উপরে আত্মার ধর্ম্মকে জয়ী করে, তখন ষোড়শী যুবতীকে কোলে নিয়ে স্বামীর মনে থাকে না, এটী যুবতী না বালিকা, পঞ্চবিংশ বছরের যুবকের কোলে ব'সে স্ত্রীর মনে থাকে না, এটী যুবক না বৃদ্ধ। দ্বৈত তখন ঘুচে যায়, দুই মিলে এক হয়, তান্ত্রিক বামাচারীর আসব-পান ব্যতীতই তখন ভাবের নেশা জমে যায়, তান্ত্রিক বীরাচারীর পঞ্চমকার ছাড়াই তখন প্রাণে প্রাণে রমণ চলে।

দীক্ষা নিবার রোগ

শ্রীশ্রীবাবা এই ট্রেণেই চলিয়া যাইবেন শুনিয়া এগারগ্রাম ও কল্লবাস-নিবাসী দুইটী যুবক দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্মদর্শন মাত্র তাঁহারা প্রাণের বেদনা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—দীক্ষার ব্যারাম হয়নি ত' তোদের ?

কথাটা যুবকদ্বয় বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কলেরা, নিমোনিয়া, প্লেগ যেমন এক একটা রোগ, দীক্ষা-গ্রহণ নামেও তেমন একটা রোগ আছে। এই রোগ কোনো কোনো সময়ে এক এক অঞ্চলে অতি ভয়ঙ্করভাবে সংক্রামক হ'য়ে পড়ে। তখন আর পাত্রপাত্রের বিচার থাকে না, যে জন্মে কখনো সাধন কর্ব্বে না, সেও একটা দীক্ষা নিয়ে রাখে, অর্থাৎ যদিই নেহাৎ মরণকালেও কাজে আসে! কারো কারো রোগ-লক্ষণ এমনি প্রকাশ পায় যে, একটামাত্র দীক্ষা নিয়েই চুকে যায় না, গণ্ডায় গণ্ডায় গুরু করে, কুড়িতে কুড়িতে উপগুরু করে, আর ঝুড়িতে ঝুড়িতে মন্ত্র আর 'ইড়িং বিড়িং' ভার বোঝাই ক'রে বাড়ী নিয়ে যায়। সে রকম ব্যারাম ত' বাবা তোমাদের হয় নাই ?

ছেলে দুটী হাসিতে লাগিলেন।

দীক্ষা দিবার রোগ

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—দীক্ষা দেবারও একটা রোগ

আছে। পাত্রাপাত্র বিচার নেই, 'হুং ফট্ স্বাহা' একটা কাণের মধ্যে ফুঁকে দেওয়াই চাই। এই ব্যারাম বাবা আমার হ'য়েছিল। কুকুর ডাক্‌ছে ঘেউ ঘেউ ক'রে, আমার ইচ্ছে হয়েছে তার কাণের মধ্যে একটা 'হুং ফট্' ফুঁকে দিয়ে আসি। রাত দুপুরে শেয়ালগুলি ডাক্‌ছে হুক্কাহুয়া, আর আমার ইচ্ছে হয়েছে তাদের কাণে একটা ক'রে দীক্ষামন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়ে আসি। সাপ, বাঘ, কুমীর কাউকে বাদ দিতে ইচ্ছে হয়নি। এই রেল-রাস্তার পাথরগুলিই বা মন্দ কি, এদের কাণেও একটা করে মন্ত্রপূত ফুৎকার দিতে ইচ্ছে হয়েছে। এর ফলও হয়েছে চমৎকার। ডাইনি বুড়ীকে মন্ত্র দিয়ে শিষ্য কত্তে গেলাম, সে রাখ্‌ল আমার কাণ কেটে। জুজু বুড়ীকে মন্ত্র দিয়ে শিষ্য কত্তে গেলাম, সে দিল আমার নাক ফু'ড়ে। কালনেমীর গোষ্ঠিকে মন্ত্র দিয়ে শিষ্য কত্তে গেলাম, সবাই মিলে তারা দিল আমার সবল, পেশল, বিক্রমপরায়ণ বাহুযুগল দ্বিখণ্ডিত ক'রে। যারা শিষ্য ব'লে কালও আমি ছিলাম জগদ্‌গুরু, আজ তারা শিষ্য ব'লেই আমি একেবারেই ঠুঁটো জগন্নাথ। শুন্‌বে মজার কথা? এইমাত্র আস্‌চি আমি, শিষ্যগৃহে থেকে, এরা শিষ্য ব'লে আমার কত মান. কিন্তু দুদিন না যেতে এরাই করবে আমাকে অপদস্থ ও হতমান।

কথাগুলি বলিবার সময়ে শ্রীশ্রীবাবার কণ্ঠস্বর একটু ভারী, একটু বেদনাহত হইয়াছিল কি না, অকৃতজ্ঞ সন্তানদলের আত্মবিস্মৃতিমূলক নির্ব্বুদ্ধিতার স্মৃতি তাঁর আঁখির কোণে দুই একবিন্দু তপ্ত অশ্রু অলক্ষিতে সঞ্চারিত করিয়াছিল কিনা, কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই। বাহিরে দেখা যাইতেছিল, শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে মাটিতে গড়াইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু এই তারিখের ঠিক্ দেড় বৎসর পরে শ্রীশ্রীবাবার উল্লিখিত কথাগুলি অত্যন্ত মর্ম্মপীড়াদায়ক ঘটনার দ্বারা এমনভাবেই সত্য হইয়া দেখা দিয়াছিল যে, আমাদের বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি হয়,—সদ্‌গুরু সর্ব্বদর্শী।

যাহা হউক, রেল লাইনের পাথরের উপরে বসিয়াই যুবকদ্বয় সদ্‌গুরুর কৃপা পাইল।

গুরু-শিষ্যের অধীনতা ও স্বাধীনতা

রেলগাড়ী বেলা নবম ঘটিকায় কুমিল্লা পৌছিল। শ্রীশ্রীবাবা বাগিচাগাঁও শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দেবনাথের কয়লার গুদামে উঠিলেন। পথিমধ্যে জনৈক শিষ্যের সহিত দেখা। শিষ্যটী শ্রীশ্রীবাবার অনুগমন করিলেন।

গুরুর অননুমতিতে তাঁর নামের দোহাই দিয়া কোনও মত প্রচার করা কর্ত্তব্য কিনা, গুরুর দ্বারাই প্রেরিত হইয়াছি বলিয়া নিজেকে জাহির করিয়া গুরুর অজ্ঞাতসারে তদীয় শিষ্য-সমাজে দলপুষ্টির চেষ্টা উচিত কিনা, স্বয়ং এইরূপ কার্য্য না করিলেও অন্যান্য সহচরেরা এইরূপ করিতেছে দেখিতে পাইয়াও বিনা প্রতিবাদে এই কার্য্য চলিতে দেওয়া সঙ্গত কিনা,—ঘটনাচক্রে এই জাতীয় কতকগুলি কথা উঠিয়া পড়িল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গুরু শিষ্যের অধীন, শিষ্যও গুরুর অধীন,—এটা সনাতন সত্য। কিন্তু কতটুকু অধীন? একজন অপরের কাছে যতটুকু অধীন, অপরে তার কাছে ততটুকুই অধীন। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ মূলতঃ আধ্যাত্মিক। বিশেষতঃ এ পর্য্যন্ত অধিকাংশ গুরুই কর্ম্মযোগে ঝাঁপ দেন নাই ব'লে এবং যাঁরা কর্ম্মযোগের পথে গিয়েছেন, তাঁরা নিজ নিজ শিষ্যদের কাছ থেকে implicit obedience (দ্বিধাহীন আনুগত্য) আদায় ক'রে নিয়েছেন ব'লে গুরু-শিষ্যের মধ্যে অধীনতা ও স্বাধীনতার কোনো প্রশ্ন এ পর্য্যন্ত উঠে নাই। কিন্তু কারো ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধিকে ব্যক্তিত্বের তর্জ্জনী হেলনে পঙ্গু ক'রে দেওয়া আমার আদর্শ-বিরোধী ব'লে আমি কখনো তোমাদের কাছে বশ্যতা দাবী করি নাই। নিজ নিজ রুচি, শক্তি ও প্রতিভা অনুযায়ী কর্ম্ম ক'রে যাওয়ার স্বাধীনতা তোমাদের দিয়েছি। আমার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মধারার সঙ্গে জোর ক'রে তোমাদিগকে গেঁথে রাখ্‌বার জন্য কোনো চেষ্টা করিনি। কারণ, আমি জানি, আমাকে কর্ম্মজীবনেও যারা অনুসরণ কর্ব্বে, তারা কোনো ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির ফলে আস্‌বে না, নিজের সর্ব্বস্ব উজাড় ক'রে ঢেলে দেবার জন্য নিজেদেরই প্রাণের প্রেরণায় আপনি ছুটে আস্‌বে,—। গুরু যখন

শিষ্যকে সাধন দিয়েও কর্ম্মজীবনে স্বাধীনতা দেন, তখন বুঝ্‌তে হবে তিনি নিজেও শিষ্যের interference (হস্তক্ষেপ) চান্ না।

২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৮

ত্যাগেচ্ছু গৃহীর ঘরেই ত্যাগীরা জন্মেন

প্রাতের মটরে শ্রীশ্রীবাবা কুমিল্লা হইতে রহিমপুর ফিরিবেন, জনৈক সদ্যোবিবাহিত এক যুবক পাদবন্দনা করিলেন। এক সময়ে যুবকটীর সন্ন্যাস-জীবন গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং শ্রীশ্রীবাবাও তার আকাঙ্ক্ষাটীকে নানাভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়া আসিয়াছেন। ফলে বিবাহ করিয়া যুবকটী নিজেকে একান্তই অপরাধী মনে করিয়া ম্রিয়মান হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবা পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন,—বোকা কোথাকার! তোরা বিয়ে না কর্লে ত্যাগী সন্ন্যাসীরা জন্মাবে কার ঘরে? আমার পিতৃদেবের তীব্র ইচ্ছা ছিল, তিনি সন্ন্যাসী হবেন। সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। তারই ফলে বিনা চেষ্টায় আমাতে সন্ন্যাস এসেছে। তাঁর ত্যাগমুখী মনের সহস্র-সংগ্রাম-জাত বল আমি শুধু উত্তরাধিকার-সূত্রেই বিনা চেষ্টায় পেয়ে গেছি। পিতৃদেবের পক্ষে এতে লাভ থাকুক আর না থাকুক, আমার কি কম লাভ হয়েছে?

যুবক মাত্রেরই কৌমার্য্যের আকাঙ্ক্ষা হিতকর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার অধিকার আছে আমাকে এই প্রশ্ন করার যে, বিবাহই যদি শেষটায় কত্তে হবে, তবে তোমাকে বারংবার কৌমার্য্যের সঙ্কল্প কঠোর কত্তে প্রেরণা দিয়েছি কেন? কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর খুব সোজা। প্রত্যেক যুবকের আজ চিরকৌমার্য্যের সঙ্কল্প ক'রেই জীবনের পথ চল্‌তে আরম্ভ করা উচিত। শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে সে যেখানেই ঠেকুক, তার এই সঙ্কল্প তার ব্রহ্মচর্য্যকে পুষ্ট কর্ব্বে, প্রাণের প্রশস্ততা বাড়িয়ে দেবে, হৃদয়কে উদার কর্ব্বে, স্বার্থবুদ্ধি হ্রাস কর্ব্বে। বিবাহের কল্পনাও কারো মনের ভিতরে ততদিন আস্‌তে দেওয়া উচিত নয়, যতদিন সে মানুষের মত মানুষ হ'তে না পেরেছে। বিবাহের চিন্তা, বিবাহিত জীবনের সুখ-কল্পনা মহাবীরেরও মেরুদণ্ডে ক্ষয় ধরিয়ে দেয়, পরার্থ-প্রেরণা ম্লান ক'রে ফেলে। এই জন্যেই আমি তোমার

কৌমার্য্যের সঙ্কল্পকে বারংবার অভিনন্দিত করেছি। আমি অভিনন্দন দিয়েছি ব'লেই যে তোমার কৌমার্য্য আমিই রক্ষা ক'রে দিব, তা' নয়। যার যার কৌমার্য্য যার যার নিজ বলে অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে হবে। এই অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টায় যে বিপুল পুরুষকারের প্রয়োগ হবে, তা' তোমার ভাবী জীবনে অমৃতের মত কাজ কর্ব্বে, চাই তুমি চিরকুমার হ'য়েই থাক, চাই তুমি বিবাহই কর। আমি গার্হস্থ্য বা সন্ন্যাসের প্রচারক নই। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস আমার চ'খে সমান শ্রদ্ধার, সমান মর্য্যাদার। এক আশ্রমকে বাদ দিয়ে অপর আশ্রম সরল মেরুদণ্ডে চল্‌তে পারে না, একের সঙ্গে অপরের সহযোগিতার বান্ধবতা রয়ে গেছে। তোমাকে বা তোমার মত আমার আরও শত শত প্রিয়জনকে সন্ন্যাসী ক'রেই গ'ড়ে তুল্‌ব, এ কখনো আমার চেষ্টা বা লক্ষ্য হ'তে পারে না। সন্ন্যাসীর প্রশান্ত জীবনের ধ্যান যুবকমাত্রেরই রিপুর উদ্দাম নৃত্যের প্রতিষেধক, সেই হিসাবেই আমি প্রত্যেকের চিরকৌমার্য্যের আকাঙ্ক্ষাকে সমাদর করি। কৌমার্য্যের সঙ্কল্পকে তীব্র হ'তে তীব্রতর ক'রেও শেষ পর্য্যন্ত যাকে বিবাহিত-জীবন গ্রহণ কর্ত্তে হ'য়েছে, তার কাছেই দাম্পত্য-জীবনের সংযত ব্যবহার সহজে প্রত্যাশা কর্ত্তে পারি।

মেয়েদের মধ্যেও কৌমার্য্যের আকাঙ্ক্ষা হিতকর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মেয়েদের ভিতরেও তরুণ বয়সেই কৌমার্য্যের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেওয়া তাদের চরিত্রবল বৃদ্ধির পক্ষে হিতকর। যে মেয়ের ভিতরে কুমারী থে'কে দেশ ও ভগবানের সেবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল, সামান্য প্রলোভন তাকে ভোগসুখের দিকে টান্‌তে পারে না। কৌমার্য্যের মহিমা যার অন্তরে যত নিবিড়ভাবে জাগ্রত, তার সতীত্ব তত দুর্ভেদ্য, তত অলঙ্ঘনীয়। বিয়ে না ক'রে যা' তা' ক'রে দায়িত্বহীন একটা অবিবাহিত জীবন যাপন ক'রে যাওয়ার কথা বল্‌ছি না, ঈশ্বরানুরক্তি যে কৌমার্য্যের ভিত্তিভূমি, সেই পবিত্রতা-সুরভি সুমধুর কৌমার্য্যের কথা বল্‌ছি। কুমারী মেয়েদের দেখ্‌লে আমার মনের ভাব কেমন হয় জানিস্? আমার সমগ্র দেহের প্রত্যেকটা অনুপরমাণু যেন এক একটা ফুল হ'য়ে ফুটে উঠে, কুমারী রূপিণী জগজ্জননীর চরণতলে লু'টে

প'ড়ে ধন্য হ'তে চায়। এখন যারা কুমারী, যদি তারা সত্যিকার শিক্ষার মধ্য দিয়ে গ'ড়ে উঠ্‌তে পারে, তাহ'লে তাদের বিবাহিত জীবনের সংযম-শুদ্ধ জঠর কত শিবাজী, কত গুরুগোবিন্দের জন্ম দেবে তা জানিস্‌ ?

সাধন গোপনে রাখার জিনিষ

রহিমপুর আশ্রমে পৌঁছিতে বেলা বারোটা হইল। দ্বিপ্রহরের ব্রহ্মার্পণের পরে শ্রীশ্রীবাবা কয়েকখানা পত্র লিখিলেন। সঠিকভাবে তারিখ-সঙ্গতি না করিতে পারিয়া আনুমানিক এই তারিখের একখানা পত্র এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম। একজন ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"গোড়ায়ই তোমাকে মনে রাখিতে হইবে যে, সাধন-বস্তুর ভিতরের দিক্‌ যাহা, তাহা হাটে বাজারে প্রচার বিধেয় নহে এবং অন্তরের বস্তুকে বাহিরে প্রকাশ করিয়া সংখ্যাপুষ্টি বা স্বমত-পরিপোষণ অত্যন্ত বিপজ্জনক। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে প্রকৃত সাধন-নিষ্ঠার চাইতে বাহ্য অনুষ্ঠানের সম্মান এত অধিক যে, সতর্ক হইয়া না চলিলে গড্ডলিকা-প্রবাহে অঙ্গ ভাসাইয়া জীবনময় ব্যর্থতা আহরণ করিবারই সম্ভাবনা অত্যধিক। এজন্য আমাকে আমার ধর্ম্মের মূল রহস্য প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইয়াছে এবং হইতেছে।

সাধকের দৃষ্টিতে গুরু

"কোনও কোনও সাধকের জন্য শ্রীগুরু বিগ্রহবান্‌ পরমাত্মাস্বরূপ। তদ্রূপ সাধকের জন্য শ্রীগুরু সর্ব্বরূপৈশ্বর্য্যের আধার আনন্দময় চিৎশক্তিস্বরূপ। সেই াধকের জন্য গুরু পূজ্য, উপাস্য ও ইষ্ট। অপরের জন্য নহে। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত মানববৃন্দের পিপাসার প্রকৃতি গুরু-প্রতীকে চিত্ত-সমাধানের অনুকূল নহে। এজন্য তাহাদের নিকটে গুরুতত্ত্ব তাহাদের সাধন-নিষ্ঠা বর্দ্ধনের সহায়ক-রূপেই ব্যাখ্যাত হওয়া সুসঙ্গত।

উপাস্য সাকার না নিরাকার

"তোমাদের উপাস্য সাকার বা নিরাকার কিছুই নহে,—এইরূপ অদ্ভুত উপদেশ সদ্‌গুরু তোমাকে দেন নাই। যে যেরূপ অধিকারী, উপাস্য তাহার পক্ষে সেইরূপ। তুমি কি প্রকার অধিকারী, তাহা নির্ণয়ের উপরেই নির্ভর

করিবে, তোমার উপাস্য কিরূপ ? কোনও মূর্ত্তি গোড়া হইতেই কল্পনা করিয়া উপাসনা আরম্ভ করিলে দু'দিন পরে আবার হয়ত রুচি-পরিবর্ত্তন হইতে পারে। এজন্যই প্রথম উপাসনা আরম্ভকালে প্রবর্ত্তক সাধককে কোনও নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তি কল্পনা করিতে উপদেশ দেওয়া হয় না। কিছুদিন শুধু নামেরই সেবা করিয়া গেলে আস্তে আস্তে রূপহীন শুধু নাম জপিতে যখন শুষ্কতা বোধ হয়, তখন গুরূপদেশক্রমে নির্দ্দিষ্ট রূপ স্থির করিতে হয়। প্রথমতঃ নামে রুচি আসা অত্যন্ত প্রয়োজন। নামে রুচি আসিবার পরে এই নামটী অবলম্বন করিয়া যে রূপটীতে অভিনিবেশ প্রদান করা যায়, তাহা সহজে জীবন্ত হয়।

খাদ্য-নিবেদনের সার্থকতা কি

"খাদ্য জড়দেহেরই পুষ্টির জন্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জড়দেহের প্রতি অণুপরমাণুকে ভগবৎ-প্রেমরসাশ্রিত করিতে পারিলে জীব ঐহিক দুর্ণিবার লালসা-প্রপঞ্চ হইতে নিজেকে সহজে রক্ষা করিতে পারে। এই জন্য, এই দেহের পুষ্টির জন্য যে বস্তু গ্রহণ করা যায়, তাহাকেও ভগবৎ-প্রেম-রসাশ্রিত করিয়া লওয়া আবশ্যক। 'নিবেদন' একটা জড়বস্তুর উপাসনা নয়, খাদ্যদ্রব্যের ধ্যান নয়, জড়কে, চৈতন্য-রসাশ্রিত ভোগ্যকে ভগবৎপ্রেমাস্বাদু করিবার একটী কৌশল মাত্র। যে কোনও ব্যক্তি নিজ রুচিমত নিবেদন করিতে পারেন, কিন্তু গুরূপদিষ্ট প্রণালীতে নিবেদন করিবার সার্থকতা অধিকাংশ স্থলেই বেশী।

পাত্রভেদে সত্যের রূপান্তর-প্রাপ্তি

"যেই সময়ে একজন গৃহীও আমার নিকটে সাধন-দীক্ষা পাইত না, সেই সময়ে কাহাকে কি উপদেশ দিয়াছি, তাহা অনুসন্ধান করিয়া তুমি দিগ্‌ভ্রান্তই হইবে। সর্ব্বজনীন সত্যও উপদেশকালে অধিকারি-ভেদে অল্পবিস্তর রূপান্তর পাইয়া থাকে।

রূপ কল্পনার জিনিষ নয়, প্রত্যক্ষ বস্তু

"কল্পনায়' রূপের আবির্ভাব হয় না, নাম করিতে করিতে রূপ আপনি প্রত্যক্ষ হয়। অখণ্ডগণের মধ্যে এরূপ ভাগ্যবান্ অনেক আছেন, নামের স্মরণেই রূপের অফুরন্ত লীলা যাঁহারা ধ্যাননেত্রে দর্শন করেন। নাম করিতে

করিতে রূপ আপনি প্রত্যক্ষ হয়। ইহা নিশান্তে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় অভ্রান্ত সত্য বলিয়াই সহিষ্ণু ও দীর্ঘ-সাধনক্ষম অখণ্ডের জন্য উপদেশ এই যে, কল্পনা করিয়া রূপ-চিন্তন নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তেমন উত্তম অধিকারী যে হইবে না, তাহাকে রূপধ্যানে নিষেধ করা হয় নাই। শুধু এই একটী Condition (সর্ত্ত) দেওয়া হইয়াছে যে, অখণ্ড-নামের দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া, রুচি অনুযায়ী রূপধ্যান করিবে।

রূপ-কল্পনাকারীর ভোগ-নিবেদনাদি

"রূপ কল্পনা করিয়া যাঁহারা নাম-সেবা করেন, বাহ্যভোগ বা নৈবেদ্যাদির দ্বারা উপাস্যের পূজা তাঁহাদের পক্ষে কোথাও নিষিদ্ধ হয় নাই। তবে, এই নিবেদনে প্রাণের ভক্তিই প্রধানতম আয়োজন হওয়া উচিত এবং গুরূপদিষ্ট সাধন-প্রণালীই মন্ত্র বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। অনুষ্ঠান কতকটুকু প্রয়োজন। কিন্তু অনুষ্ঠানের হ্যাঙ্গামা অত্যধিক বাড়াইলে শেষে আসল সাধনার ধন নাম-রতনে অবহেলা আসিয়া যায়, কারণ তার সেবায় সময় কুলাইয়া উঠা যায় না।

আসনে বিগ্রহ-স্থাপন

"রূপাশ্রয় করিয়া যাঁহারা উপাসনা করেন, তেমন অখণ্ডগণের পক্ষে আসন রাখা, আসনে প্রতীক স্থাপন প্রশস্ত। কিন্তু স্বকীয় উপাস্য প্রতীক ব্যতীত অন্য কোনও প্রতীক বা মূর্ত্তি সেই আসনে রাখা সাধারণতঃ উচিত নহে।

"উপাসনার আসনে মূর্ত্তি রাখিবার মূলীভূত উদ্দেশ্য কি, তাহা আগে বিচার কর। অনির্ব্বচনীয় পরমাত্মার অনির্ব্বচনীয় বিরাট রূপে মন ডুবান কঠিন বলিয়া একটী প্রতীকের মধ্য দিয়া মনকে ব্রহ্মসাগরে ডুবাইবার চেষ্টা হইতেই আসনে মূর্ত্তি-স্থাপনের রীতি আসিয়াছে। শেরশাহ কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করিতে গিয়াছিলেন, কঠিন দুর্গপ্রাকার ভেদ না করিতে পারিয়া সমস্ত গোলাবারুদ একটা স্থানে জড় করিয়া রন্ধ্র নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করেন। একটা স্থান যখন ধ্বসিয়া পড়িল, শত বাধা সত্ত্বেও অনতি-ক্লেশে তিনি দুর্গ জয় করিলেন। পরমাত্মাকে লাভ করিতেই হইবে, কিন্তু

চতুর্দ্দিক হইতেই একযোগে মনঃপরিচালন অসম্ভব। তাই জীবের সাধন-কুশলতার পরিচায়ক রূপে একটী প্রতীকে মন স্থির করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মূল উদ্দেশ্য ইহা। লক্ষ্য পরমাত্মা, উপলক্ষ্য প্রতীক, এজন্য প্রতীক অতীব মূল্যবান।

"কেহ কেহ উপাসনার আসনে অনেকগুলি মূর্ত্তি স্থাপন করেন। সকলেই এক কারণে করেন না, নানা কারণে করেন। কিন্তু যে মূল লক্ষ্য হেতু আসনে প্রতীক বসাইবার রীতি আসিল, সেই লক্ষ্যকে অটুট রাখিবার উদ্দেশ্যে করেন কি না, ভাবিতে হইবে। যদি করেন, ভাল। যদি না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের আচরণ অনুকরণে লাভ নাই। কোনও একটা রীতি দেশপ্রচলিত বলিয়াই ভাল বা মন্দ হইতে পারে না। রীতিটীর উৎপত্তি কোন্ লক্ষ্যে এবং সেই লক্ষ্য-সাধনে এই রীতির দ্বারা কতটুকু সৌকর্য্য হইতেছে, তাহা বিচার করিতেই হইবে।

"—নিষ্ঠা মানে 'এক জায়গায় নিজকে ডুবাইয়া দেওয়া'। হনুমান বলিয়াছিলেন,—'শ্রীনাথে ও জানকীনাথে পরমাত্মদৃষ্টিতে অভেদ-ভাব জানি, কিন্তু তথাপি রাজীবলোচন রামই আমার সর্ব্বস্ব।' হনুমান বিষ্ণুমূর্ত্তিকে অবজ্ঞা করেন নাই, কিন্তু রামমূর্ত্তিকেই তাঁর ধ্যানের ধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিষ্ঠার ইঙ্গিত এখান হইতে লইতে হইবে। কোন্ সম্প্রদায়ের কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কতগুলি বিগ্রহের পূজা করিতেন, তাহার উপরে বাবা তোমার জন্মকর্ম্ম সার্থক হওয়া নির্ভর করে না।

"চ'খ বুজিলেই যেন একজনকে দর্শন করি, তারই জন্য প্রতীক সাম্‌নে রাখা। যতদিন নামের সেবা করিতে করিতে নামীর দিব্যরূপ আপনি মানস-নয়ন উদ্ভাসিত করিয়া সমুদিত না হয়, ততদিন নির্দ্দিষ্ট প্রতীকের মধ্য দিয়া মনকে এক-কেন্দ্রক রাখিবার চেষ্টাই সাধারণ অধিকারীর একান্ত প্রয়োজন। চ'খ বুজিয়া যখন মনকে রূপে ডুবাইতে পারিতেছি না, তখন চ'খ খুলিয়া ভক্তি-গদগদচিত্তে কিছুকাল অঙ্কিত প্রতীক দর্শন করিয়া ভাবের আমেজ জমিয়া আসিলে আবার নয়ন নিমীলিত করিয়া ঐ রূপটীকেই ধ্যানলোকে জাগাইয়া

তুলিব,—এই উদ্দেশ্যেই প্রতীক সামনে রাখা। মুদ্রিত চক্ষে ধ্যান জমাইতে অক্ষম হইয়া যখন ঐ একটী রূপের মধু খোলা চ'খে পান করিবার জন্য নয়নোন্মীলন করিব, তখন যদি অনেকগুলি প্রতীক একসঙ্গে চোখে পড়ে, তাহা হইলে পুনরায় দৃষ্টি নিমীলন কালে এক সঙ্গে দশটা রূপে অভিনিবেশ চলিয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কা আছেই। দেববিগ্রহের আরতি করিয়া শঙ্খঘণ্টাদির নিনাদ-সহকৃত নিরঞ্জন সারিয়াই যাহারা ইতি করে, তাহাদের পক্ষে এই বিঘ্ন বিঘ্নই নহে। মোটরে যে চাপে নাই, বায়ুবেগ সে কি করিয়া অনুভব করিবে, কতটুকুই বা অনুভব করিবে ?

বহু প্রতীক স্থাপন

"উপাসনার আসনে বহুমূর্ত্তি রাখিবার রীতি বাংলাদেশে যত প্রবল, পশ্চিমে তত নহে, এমন কি বহু মন্দিরে একটীর বেশী বিগ্রহই নাই। কোথাও কোথাও শুধু নাম-ব্রহ্ম বিরাজমান। নামব্রহ্ম রূপব্রহ্মের উত্তেজক কারক রূপে রহেন, সাধক সাধনাকালে রূপকে অন্তর দিয়া জাগ্রত করেন, নাম-ব্রহ্মের অফুরন্ত সংসর্গ সাধকের মনে রূপাভিনিবেশ সৃষ্টি করে। মনে হইতে পারে, ইহারা জ্ঞানযোগী বা কর্ম্মী কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। উত্তর ভারতের সবচেয়ে ভক্তি-প্রবণ রামায়ৎ সম্প্রদায়-মধ্যে এই রীতি অত্যন্ত প্রচলিত এবং ইহাকে আমি সমগ্র অন্তর দিয়া অভিনন্দন করি।

"আশ্রমে আমি উপাসনার আসনে একমাত্র নাম-ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোনও প্রতীক স্থাপনের বিরুদ্ধে এক স্থায়ী রায় দিয়া রাখিয়াছি। ইহার মানে এই নহে যে, অন্য প্রতীক অবহেলার যোগ্য। পরন্তু ইহার মানে এই যে, এই আসনের সমক্ষে বসিয়া যাঁহারা সাধন করিবেন, নিমীলিত নয়নে আনন্দাস্বাদনের আমেজ কমিয়া গেলে উন্মীলিত নয়নে যেন তাঁরা একমাত্র তাঁহাদের পরমোপাস্য নামই দর্শন করেন।

"কৌলীন্য, ফলদায়িত্ব বা মাধুর্য্যরসবত্তার দিক দিয়া সব প্রতীককে আমি সমান জ্ঞান করি। কিন্তু সাধ্য-সাধন বিচারের দিক্ দিয়া অন্তর্বাহ্য ভেদ আছে। যার যাহা সাধ্য, তার তাহাই অন্তরঙ্গ, অপর সকল প্রতীক তার নিকট বাহ্য।

যার যাহা সাধন, তার তাহাই অন্তরঙ্গ, অপর সব তাহার বাহ্য। ইহার মীমাংসা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ীদের সহিত আপোষ করিয়া হয় না, ইহার মীমাংসা তোমার নিজের কাছে। আসনে বহু প্রতীক রক্ষা করিয়াও যদি নিষ্ঠার ত্রুটী না ঘটে, একটী প্রতীকে মনকে ডুবাইয়া দিবার বাধা না ঘটে, তবে তাহাতে আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু উপাসকের অবস্থা কতকটা পতিব্রতা নারীর ন্যায় জানিবে। বহু পুরুষের সহিত একই গৃহে রজনী যাপন করিয়া দীর্ঘকাল একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য রক্ষা করিয়া চলা কয়জন নারীর পক্ষে সম্ভব ? দীর্ঘকাল বহু প্রতীক সম্মুখে রাখিয়া ধ্যানোপাসনায় নিরত হইলে উপাসনার নিষ্ঠা রক্ষা অতি অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভব বলিয়া আমি জ্ঞান করি। সুতরাং সযত্নে বহু প্রতীক বর্জ্জন করিয়া চলাই কল্যাণেচ্ছু সাধকের একান্ত কর্ত্তব্য। প্রতীক ছাড়া যাহার কিছুতেই চলিবে না, সে একটী মাত্র প্রতীককেই অবলম্বন করিয়া চলুক। মনকে বহুচারী করিয়া কি লাভ ?

শ্বাসে জপ, করজপ ও মাল্যাদি ধারণ

"নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম জপিতে যখন অত্যন্ত অরুচি হইয়া যাইবে, তখন নিঃশ্বাসে ও প্রশ্বাসে নাম করিতে রুচি-বৃদ্ধির জন্য মালা দ্বারা জপ করা যাইতে পারে। মালা-জপকে শ্বাস-প্রশ্বাসে জপের চেয়ে নিকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকিলেও তাহা একেবারে ফলহীন নহে। শ্রম করিলে তার পারিশ্রমিক মিলিবেই। তবে, সুকৌশলীর অল্পশ্রমে অধিক ফল, অকৌশলীর বেশী শ্রমে অল্প ফল। তোমার পক্ষে বাবা মালাকে হেয় জ্ঞান না করিয়াও শ্বাসে প্রশ্বাসে বেশী শ্রদ্ধা রাখা উচিত।

"মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য, জ্বর-কফাদি রোগ বা শারীরিক অবসন্নতা বশতঃ কখনো কখনো শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপ কষ্টকর হইতে পারে। এইরূপ সময়ে মালা-জপই করিবে। শ্বাসে যেই নাম জপ কর, মালাতেও সেই নামই জপিবে। কাহারও রোগমুক্তি, পারলৌকিক কল্যাণ বা সান্ত্বনার উদ্দেশ্যে যদি সংখ্যা রাখিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জপ কখনো সকাম ভাবে করিতে চাহ, তবে তখন মালা জপ করিতে পার। রুদ্রাক্ষ, তুলসী প্রভৃতি মালার বিভিন্নতা সাম্প্রদায়িক

প্রশস্ততা মাত্র। অখণ্ডগণ যদি মাল্যাদি ধারণ করিতে চাহেন, তবে তাঁহারা যে কোনও মাল্য ধারণ বা জপ করিতে পারেন।

"কণ্ঠে মাল্যাদি ধারণের প্রকৃত উপযোগিতা এই যে, ঈশ্বরকে মনে আনার ইহারা সহায়ক। মালায় হাত লাগিলে বা তিলকে দৃষ্টি পড়িলে তাঁর কথা মনে হইবে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসই অখণ্ডকে নিয়ত পরমেশ্বরের কথা মনে করাইয়া দেয়, এজন্য অখণ্ডকে মালা-তিলকাদি ধারণ করিতে হয় না। তবে সাম্প্রদায়িক পরিচয় দিবার জন্যও মালা-তিলক ধারণের একটা রীতি দেখা যায়। এরূপ রীতিকে সাত্ত্বিকতা-বহির্ভূত মনে করি। নিজ সম্প্রদায়ের মানুষ চিনিয়া তার সাথে স্বকীয় ভাবের অনুযায়ী সদালাপ করিবার জন্য বা স্বসম্প্রদায়ের নিকট নিজ সাধন-মার্গের পরিচয় বিনা ক্লেশে দিয়া স্বীয় আস্বাদিত প্রেমরস একভাবের ভাবুকের নিকট পরিবেশন করিবার প্রয়োজনে মালা-তিলক ধারণ অনেকে সমর্থন করেন। কিন্তু ভিতরে প্রেমধন সঞ্চিত হইলে কি বাবা সাইন-বোর্ডের কোনও দরকার হয়? শাস্ত্রে মাল্য-তিলকাদি ধারণের যথেষ্ট প্রশংসা দেখা যায়, কিন্তু সাম্প্রদায়িকভাবে ঐক্যের বীর্য্যকে উদ্বোধিত করা উহার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। এজন্যই তুলসী-মাল্যধারী রুদ্রাক্ষধারীকে অপছন্দ করেন। অখণ্ডের দৃষ্টি সকল সাম্প্রদায়িক চিহ্নের প্রতি সমান শ্রদ্ধান্বিত জানিবে।

"তোমার যখন ঈশ্বর-চিন্তার সহায়ক হইবে, তখন তুমি স্বেচ্ছামত মাল্য-তিলকাদি ধারণ করিতে পার। নতুবা উহা কপটতা হইবে। মাল্য, তিলক, দীর্ঘকেশ বা জটাজুটে ধর্ম্ম নাই, আবার আছেও। কাহারো পক্ষে ইহারা নিয়ত সাধনের স্মারক, ইষ্টনিষ্ঠাবর্দ্ধক। এস্থলে ইহারা ধর্ম্মেরই অঙ্গ। কাহারো পক্ষে ইহারা বৃথা ভার মাত্র,—এই স্থলে সম্যক্ বর্জ্জনীয়।

নামজপ আধুনিক আবিষ্কার নহে

"—'প্রাচীন কালে মুনি-ঋষিগণ ন্যাস-প্রাণায়ামের দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্ত হইতেন' —এই ধারণা ভুল। ন্যাস-প্রাণায়াম নাম-সাধনার আনুকূল্য বিধান করিত মাত্র। বাল্মিকী কলিযুগের ব্যক্তি নন, বা তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পরবর্ত্তীও নহেন।

তিনি রামনাম জপিয়াই পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার ধ্যানে দেখিতে পাই, তিনি অক্ষসূত্র লইয়া পরমাত্মার নাম জপিতেছেন। গায়ত্রীর উপাসনা বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্যদের আবির্ভাবের বহু লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই উপাসনা-পদ্ধতিতে প্রাতঃর্গায়ত্রী ব্রহ্মাণীকে হংসাসনে উপবিষ্টা হইয়া নাম জপিতে দেখা যাইতেছে। সুতরাং নাম জপ মহাপ্রভুরই প্রবর্ত্তন, একথা সত্য নহে। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিরা নাম জপ করিতেন। তার এক মস্ত বড় প্রমাণ বৈদিক সন্ধ্যাবিধির মধ্যেই রহিয়াছে। বৈদিক সন্ধ্যার আপোমার্জ্জন, অঘমর্ষণ, প্রাণায়াম, শাপোদ্ধার, জপ ও জপ-সমর্পণ প্রভৃতি কতকগুলি অঙ্গ আছে। তন্মধ্যে যে ব্যক্তি অপর অঙ্গ করিতে অসমর্থ, তাহাকে একমাত্র জপটুকু করিতে উপদেশ দেওয়া আছে। মেঘনার পূর্ব্ব-পাড়ের ব্রাহ্মণগণ আজও বৈদিক ত্রিসন্ধ্যায় জপটুকুই করেন, বিক্রমপুর, কোটালিপাড়া, আর ভট্টপল্লীর ব্রাহ্মণেরা সকল অঙ্গ সহিত সন্ধ্যা করেন। পূর্ণিমা, অমাবস্যা প্রভৃতি কতিপয় তিথিতে সন্ধ্যা বাদ থাকে। সেই দিনও সকল অঙ্গ বাদ দিয়া শুধু গায়ত্রী জপের বিধান আছে। এতদ্ব্যতীত আরও প্রমাণ এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের অন্ততঃ দুই তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেও তান্ত্রিক সাধন-পথেও দেখা যায়,—জপাৎ সিদ্ধি, জপাৎ সিদ্ধি, জপাৎ সিদ্ধি ন সংশয়ঃ, ইহাই মূল কথা। অঙ্গন্যাস, করন্যাস, আসন-শুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, ভূতাপসারণ প্রভৃতির পরে সারাৎসার 'নাম জপ।' যে তান্ত্রিক সাধক এত সব ন্যাস, শুদ্ধি করিতে সময় পায় না, তার পক্ষে শুধু জপই শাস্ত্রোপদেশ। যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ দীক্ষাদাতা, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবে, বৈষ্ণবদের দীক্ষাদিও তন্ত্রোক্ত-বিধানে হইয়া আসিতেছে। তন্ত্রের এতই মান। এই তন্ত্র 'নামজপকে' একমাত্র অবলম্বনীয় বলিয়াছেন।

ন্যাস

"তৎপরে আরও একটা বিষয় দেখিতে হইবে, ন্যাস কাহাকে বলে। দৈহিক ও মানসিক ভেদে ন্যাস দ্বিবিধ। 'মানসিক ন্যাস' মানে 'নিজেকে তাঁর কার্য্যে

ন্যস্ত করা। তাঁর কার্য্যে ন্যস্ত করার মানসিক চিন্তাকে intensify করিবার জন্য দৈহিক প্রক্রিয়ার দরকার বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন। তাই তাঁহারা শরীরের এক এক অঙ্গে মনঃস্থির করিয়া, "ইহা তাঁহার কাজে লাগুক" এইরূপ ভাবিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই অঙ্গ স্পর্শ করিতেন। কোনও পৌরোহিত্য-গ্রন্থে ন্যাসের মন্ত্রগুলি দেখিও এবং শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিতের পূজাকালে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস দেখিও, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, ইহা সত্যই কঠিন কিনা এবং অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ কিনা। যাঁহারা বলেন ন্যাস কঠিন, বা ন্যাসে প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা আছে, তাঁহারা ন্যাস কি জানেন না এবং নিজ নিজ অজ্ঞতা দ্বারা অন্যকে প্রবঞ্চিত করিতে চাহেন মাত্র। সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের তিলক কাটিতে যতটুকু সময় লাগে, ন্যাস করিতে তার চেয়ে বেশী সময় লাগে না। করন্যাস করিতে অর্দ্ধ মিনিট আর অঙ্গন্যাস করিতে এক মিনিট সময় লাগে, এবং সর্ব্বাঙ্গে কৃষ্ণ-নামের তিলক কাটিবার পশ্চাতে যে মঙ্গলময় উদ্দেশ্য রহিয়াছে, করন্যাস ও অঙ্গ-ন্যাসের পশ্চাতেও তাহাই রহিয়াছে। অতএব তিলক-কাটিবার প্রথাকে বড় পাত্তা দিবার জন্য অঙ্গন্যাস ও করন্যাসের নামে বৃথা অপবাদ রটনা অযৌক্তিক মনে করি। অবশ্য, অখণ্ডেরা ন্যাস করেন না, কারণ, ন্যাসের যে সুফল, তাহা তাঁহারা 'পরিভ্রমণ' প্রক্রিয়ার দ্বারা বর্দ্ধিততররূপেই প্রাপ্ত হন।

কলিজীবের প্রাণায়াম

"তৎপরের বিষয় প্রাণায়াম। প্রাণায়াম এক প্রকারের নহে, বাহাত্তর হাজার প্রকারের। তন্মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে এক শতের অধিক প্রচলিতই নাই। বড় বড় যোগীরা ত্রিশ পঁয়ত্রিশটী জানেন, বাকীগুলি নিষ্প্রয়োজনীয় বোধে শিক্ষা করেন নাই বা চর্চ্চা করেন না। সকল প্রাণায়াম সুকর নহে, এমন কি সত্যযুগেও সবগুলি সহজ বিবেচিত হইত না। কিন্তু প্রাণায়ামেরও এমন কৌশল আছে, যাহা কঠিন নহে, যাহাতে ভুল হইতে পারে না, যাহা সহজেই শিখা যায়, যাহা স্বল্পায়ু জীবের পক্ষেও উপযোগী। তাহাই অজপা-সাধন বা শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপ। স্বাভাবিক শ্বাসে ও স্বাভাবিক প্রশ্বাসে নাম জপিতে জপিতে প্রয়োজন হইলে বায়ুর দৈর্ঘ্য আপনি হইবে বা বায়ুর স্থিরতা আপনি

আসিবে। যাঁহারা বলেন যে কলিযুগে প্রাণায়াম চলে না, তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, ভারতবর্ষের বিশ লক্ষ কবীরপন্থী, আট লক্ষ নানকপন্থী, পঞ্চাশ লক্ষ নাথপন্থী, প্রায় দুই ক্রোড় রামায়ৎ ও তুলসীরামী, এক লক্ষ দাদূপন্থী, পঞ্চাশ লক্ষ নাগাপন্থী, এবং প্রায় পাঁচ ছয় ক্রোড় অন্যান্য পন্থীরা শ্বাসে প্রশ্বাসে নামজপ আজও করিতেছেন। এই কলিযুগেই করিতেছেন। এমন কি, শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ যদি শ্রীগৌরাঙ্গের মতের বিরোধী হইত, তাহা হইলে নিত্যানন্দ অবধূত ও তৎপুত্র বীরভদ্র শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ উপদেশ করিতেন না এবং চৈতন্য-দেবের পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ সহজিয়া-মত নামে প্রচার করিয়া শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ করিতেন না। সহজায়তে, জন্মনা সহ জায়তে, —জন্মের সঙ্গেই জাত হয় বলিয়া শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম-সাধনের অপর এক নাম সহজ-সাধন। চণ্ডীদাস ও অপরাপর বৈষ্ণব মহাত্মার লেখায় যতস্থানে 'সহজ' কথা দেখিবে,—জানিবে শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম-সাধনের কথাই বলা হইতেছে। এই গূঢ়তত্ত্ব যে জানে না, সে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিলেও বৈষ্ণব-সাহিত্যের বা গূঢ় বৈষ্ণব-সাধনের কিছুই জানে না বলিয়া বুঝিবে। কর্ত্তাভজা, বাউল, আলোয়ালী, নেড়ানেড়ী প্রভৃতি যত বৈষ্ণব নামে খ্যাত সাধক-সম্প্রদায় আছে, সর্ব্বত্র সাধন হইতেছে শ্বাসে ও প্রশ্বাসে। উল্লিখিত পন্থীদের ব্যক্তিগত আচরণে হয়ত দোষ-ত্রুটী থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের আসল সাধনটুকু শ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া। এক শ্রেণীর গুরুদেবেরা বৎসর বৎসর পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষামন্ত্র বিতরণ করিতে আসিয়া থাকেন। মন্ত্রটী হইতেছে,—হংসঃ। এই মন্ত্রও শ্বাসে ও প্রশ্বাসেই জপিতে হয়। তন্ত্রগ্রন্থ দেখিলেই বুঝিবে।

"—'প্রাণায়াম' বলিতে বিদ্‌ঘুটে রকমের একটা জানোয়ার মনে করিতে হইবে, তাহা নহে। শ্বাস-প্রশ্বাসকে যে-কোনও রকমের একটা শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়া ফেলিলেই তাহা প্রাণায়াম হইল।

উচ্চকীর্ত্তন ও নামজপ

"মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ নাম-কীর্ত্তনের দ্বারা জীবের মুক্তি বিধান করিতে চাহিয়াছেন, ইহা সত্য। তিনি নিজেই ত্রিসত্য করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। কিন্তু নামই একমাত্র গতি বলিলে ইহা বুঝা যায় না যে, নামজপ বর্জ্জনীয় এবং উচ্চরব করিয়া নামকীর্ত্তনই একমাত্র করণীয়। যদি উচ্চকীর্ত্তনেই সব হইত, তবে বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারকারী কীর্ত্তনীয়া বাবাজী মহাশয়েরা আবার পৃথক্ নামজপে বসেন কেন? মৃদঙ্গ ও করতাল অক্ষত থাকিতে মালা-ঝোলার বোঝা বহন করেন কেন? ইহা হইতেই বুঝিতে পারিবে, কোন্ সাধন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অধিকতর অভিপ্রেত ছিল। বস্তুতঃ, নাম-কীর্ত্তন বস্তুটা ধর্ম্মপ্রচারের অঙ্গ-স্বরূপ। কীর্ত্তন বস্তুটা সাধনের সহায়ক, সাধনের রুচিবর্দ্ধক এবং অসাধককে হরিনামের প্রতি আকৃষ্ট করিবার অব্যর্থ ঔষধ। কিন্তু জপই সাধনের মুখ্য অঙ্গ। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষেরা কীর্ত্তনকে প্রচারের অঙ্গস্বরূপই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পরহিত তরে কর নাম সঙ্কীর্ত্তন,
আত্মহিত তরে জপ অন্তরঙ্গ ধন।

উচ্চকীর্ত্তন ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

"বিজয় গোস্বামী মহাশয় নাম-সাধনকেই জীবের উদ্ধারের একমাত্র উপায় বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাবা 'শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ' গ্রন্থ পড়িলেই দেখিতে পাইবে, শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ কথাটার উপরেই তাঁর সমস্ত জোর। চীৎকার করিয়া শ্বাসে-প্রশ্বাসে জপ চলে না! নামে আস্থাহীন অজ্ঞান জীবকে ভগবানের পানে টানিয়া আনিবার জন্য তিনি দোর্দ্দণ্ড বিক্রমে কীর্ত্তন করিয়াছেন, কখনো ভক্তরাজ হনুমানের ন্যায়, কখনো মহারুদ্র শিবের ন্যায়, কখনো ত্রিভঙ্গবঙ্কিম মুরারির ন্যায় মৃদঙ্গের তালে তালে নৃত্য করিয়া হরিনামের পাপহারী হুঙ্কারে মেদিনী কাঁপাইয়াছেন, কিন্তু আর্ত্ত জীব যখন তাঁর শরণাগত হইয়া পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়াছে, তখন দিয়াছেন উপদেশ নীরব সাধনার, গোপন জপের। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীকে বারংবার তিনি বাক্য-কথন কমাইতে উপদেশ দিয়াছেন, নিজে একবৎসর কালের জন্য একেবারে মৌনী হইয়া নিরন্তর নাম জপিয়াছেন, একবার কোনও কারণে মৌনচ্যুত হইয়া পড়িলে খড়মের আঘাত করিয়া নিজের

কপাল নিজে ফাটাইয়া রক্তপাত করিয়াছেন এবং শিষ্যমাত্রকেই শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম জপ করিতে বারংবার মিনতি করিয়াছেন। অসম্যগ্‌দর্শী সমালোচকের বৃথা বাচালতায় আসল কথা ভুলিও না বাপধন!

উচ্চকীর্ত্তন ও প্রভু জগদ্বন্ধু

"আধুনিক বাংলায় ফরিদপুরের শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু-সুন্দরের আবির্ভাব একটা নিতান্ত নগণ্য ঘটনা নহে। প্রভু জগদ্বন্ধুর অনুবর্ত্তীদিগের সংখ্যাল্পতা দ্বারা তাঁহার জীবনের মহিমার পরিমাপ করা ভ্রম হইবে। কোনও অলৌকিক অনুভূতি ব্যতীতও সাধারণ দৃষ্টিতে জগদ্বন্ধু-সুন্দরের দিকে যে-কেহ তাকাইয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে এবং তাঁহার চরণতলে মাথা নত করিয়াছে। কীর্ত্তন ইঁহার ব্রহ্মাস্ত্র ছিল। কীর্ত্তনের তরঙ্গে ইনি ফরিদপুরে প্রেমের বন্যা আনিলেন, কত পাপী পাপ ছাড়িল, কত তাপী তাপ ভুলিল, কত দুঃখী দুঃখ বিস্মৃত হইল। ফরিদপুরের সাঁওতালেরা নামের নেশায় বিভোর হইয়া মদ ছাড়িল, মানুষ হইল। বিলাতের 'আবগারী' নামক পত্রিকা হরিনামের এই মহিমা দেখিয়া ধন্য ধন্য রব করিয়া উঠিল। কিন্তু হঠাৎ এক দিন প্রভু জগদ্বন্ধু চুপ্‌ মারিলেন, একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর নীরব নিঝুম নামের সাধনায় ডুব দিয়া রহিলেন। কীর্ত্তনানন্দের বিপুল সমারোহ দেখিয়া যখন শত সহস্র ভক্তহৃদয় নদীয়া-নাগরের পুনরবতরণ অনুভব করিতেছিল, ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে তিনি নীরব তপস্যায় আত্ম-নিমজ্জন করিলেন কেন? কঠোর জ্ঞানী লোকনাথ ব্রহ্মচারী নন, দক্ষিণেশ্বরের মাতৃভক্ত রামকৃষ্ণ নন, গোরক্ষপুরের চিরগম্ভীর গম্ভীরনাথ নন, বাংলার ভক্ত নামে পরিচিত সমাজের নিকট যে সকল মহাত্মা জ্ঞানমার্গী, কর্ম্মমার্গী বা ততোধিক বিরক্তিব্যঞ্জক সংজ্ঞায় অভিহিত এমন কোনও ব্যক্তি নন, পরন্তু প্রেমভক্তির জীবন্ত-মূরতি-স্বরূপ কীর্ত্তনানন্দী জগদ্বন্ধু যখন উচ্চকীর্ত্তনে বিরত হইয়া নিঃশব্দ সাধনায় একদিন ডুব দিলেন, তখন কীর্ত্তনের স্থান, কাল, পাত্র ও প্রয়োজনীয়তার একটা মূল্য-নির্দ্ধারণ বাস্তবিকই খুব সহজ হইয়া পড়িল সন্দেহ নাই।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কি শুধুই বৈষ্ণব?

"মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আগে ব্রহ্মোপাসক ছিলেন, পরে বৈষ্ণব হইলেন, এ সকল কথা খুবই শ্রদ্ধেয় নহে। তিনি আগে যা ছিলেন, পরেও তাহাই হইয়াছেন। তাঁর মত ব্যক্তিকে যে-কোনও সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব ও শ্লাঘা বোধ করিবে, সুতরাং নিজের কোলে ঝোল টানিবার চেষ্টা ত' বৈষ্ণবদের পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সম্প্রদায় জানিতে হইলে, ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর খোঁজ করিতে হইবে। অথচ ব্রহ্মানন্দজীর খোঁজ পাওয়ারও কোনও পথ খোলা নাই। তাই তাঁহাকে শুধুই বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিবার সুযোগ হইতেছে। আমি তাঁহাকে শুধুই বৈষ্ণব বলিয়া মনে করি না, কারণ ঐরূপ মনে করিবার ঐতিহাসিক সঙ্গতির অভাব। আমাকে তোমরা কোন্ সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিবে? বৈষ্ণবের সাথে মিলিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করি বলিয়া আমি বৈষ্ণব, স্ত্রীলোক দেখিলে মাতৃ-নামের গান ধরি বলিয়া আমি শাক্ত, যে গৃহে কুলদেবতা শিবপার্ব্বতী বংশানুক্রমে অর্চ্চিত হইয়া আসিয়াছেন, সেই গৃহেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছি বলিয়া আমি তান্ত্রিক, নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তিকে প্রতীকরূপে ধরিয়া সাধন করি না বলিয়া আমি ব্রাহ্ম, এক সময়ে যীশু ও মহম্মদের উপদেশ পালন করিয়াছি বলিয়া আমি খৃষ্টান বা মুসলমান, এরূপ যুক্তি-বিস্তার অনুচিত হইবে। যে সাধন ও যে ধর্ম্ম বিজয়কৃষ্ণ পরবর্ত্তীকালে ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে বা পুরীধামে বসিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর আশ্রয় পাইবার পরে কলিকাতাস্থিত খোদ্ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তার অঙ্গরূপে অবস্থান করিয়া তিনি সেই ধর্ম্ম ও সেই সাধনই প্রচার করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণের যদি কখনো মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর আশ্রয় পাইবার পরেই ঘটিয়াছে। অথচ, তাঁহার জীবন-চরিত বলিতেছে যে, তিনি সদ্‌গুরুকৃপা পাইবার পরে অনেক দিন ব্রাহ্ম-সমাজের অন্তর্ভুক্ত রহিয়া সাধন-প্রচার করিয়াছেন, প্রথমতঃ কলিকাতায়, পরে ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্যরূপে নিজ-সাধন-লব্ধ অমৃত সর্ব্বজনে বিলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং

স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করেন নাই, তৎকালীন ব্রাহ্মদের দ্বারা উক্ত সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া বাধ্য হইয়াই নিজে পৃথক্ আশ্রম রচনা করিয়াছেন। আকাশ-গঙ্গা পাহাড়ে ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজী তাঁকে সাধন-দানের পরে তিনি কলিকাতায় গেরুয়া পরিধান করিয়া আসাতে এবং প্রার্থীদিগকে দীক্ষাদান করিতে আরম্ভ করায় ব্রাহ্ম-সমাজের স্বাধীনতা-বাদী ব্যক্তিরা তাঁহার বিরোধিতা করেন। কারণ, উগ্রপন্থী ব্রাহ্মেরা গৈরিক ও গুরু এই দুইটী জিনিষ পছন্দ করিতেন না। তখন অগত্যা বিজয়কৃষ্ণকে ব্রাহ্মদের সমাজ ত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু ঈশ্বরীয় প্রেমের যে আকর্ষণে ব্রাহ্মদের সমাজে ঢুকিয়াছিলেন, ব্রাহ্ম-প্রচারকরূপে পরমাত্মার যে তত্ত্ব তিনি দেশে দেশে দিকে দিকে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। সর্ব্বধর্ম্মে তাঁর সমান অনুরাগ ছিল। তিনি বৃন্দাবন-বাসকালে সকল ধর্ম্মাবলম্বীর চিহ্ন ধারণ করিতেন। এই জন্য শেষে বৃন্দাবনের মোহান্তেরা তাঁহাকে 'অবধূত' বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। অবধূত বলে তাঁকে, যিনি কোনও সম্প্রদায়ের নন, অথচ সর্ব্ব-সম্প্রদায়েরই আপন। অপরাপর সকল ধর্ম্মমতের হীনতা প্রতিপাদিত করিয়া যদি বিজয়কৃষ্ণ বৈষ্ণব-মতই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তবে তাঁর ললাটে ত্রিপুণ্ড্র, বক্ষে রুদ্রাক্ষ, শিরে জটা, বাহুতে শিব-বলয় শোভা পাইবার কারণ কি হে? বৈষ্ণব-মতকে হেয় করায় কোনো লভ্য নাই, আর হেয় করিতে চেষ্টা করিলেও বৈষ্ণব-মতের নিজস্ব মহিমাই তাকে সকল অপবাদের ঊর্দ্ধে রাখিতে সমর্থ, বৈষ্ণবদের সাধন-পন্থা নিতান্ত তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিবার মত খেলো বস্তু নহে। এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মত ব্যক্তিরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই নিজস্ব জিনিষ হইলে তাহাতে দোষের কিছু দেখি না। কিন্তু গোস্বামীজীর হরিনাম-কীর্ত্তনের রুচি যখন অন্য সম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতির নিকৃষ্টতা, অসারতা বা অযৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য অন্যায়ভাবে ব্যবহৃত হইবে, তখন তাঁহার জীবনের ইতিহাস পুনরালোচনা অবশ্যম্ভাবী। গোস্বামীজী একজন বৈষ্ণব ছিলেন, এই কথা বলিয়া ইতি দিলে আর কাহারো কিছু বলিবার থাকে না, কিন্তু তিনি নিরাকার ব্রহ্মবাদকে হেয় জ্ঞান করিয়া বৈষ্ণব হইলেন, এরূপ

বিবৃতি সত্যেরই যে বিরোধী। জীবোদ্ধারের প্রয়োজনেই তাঁহাকে বৈষ্ণবের নিকট বৈষ্ণব, শাক্তের নিকটে শাক্ত, শৈবের নিকটে শৈব, রামায়তের নিকটে রামোপাসক সাজিতে হইয়াছিল। আত্মোদ্ধারের প্রয়োজন হইলে তিনি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে থাকিয়াই, ব্রাহ্মসমাজের দার্শনিক তত্ত্ব মান্য করিয়াই জন্মকর্ম্ম সার্থক করিয়া যাইতে পারিতেন।—আজও এমন বহু মন্ত্রশিষ্য তাঁহার রহিয়া গিয়াছে, যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজেরই অন্তর্ভুক্ত, গোস্বামীর শিষ্য হইয়াও ঐ সমাজ পরিত্যাগ করা বা ঐ সমাজের দার্শনিক ভিত্তিকে পরিবর্ত্তিত করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নাই।

"কুম্ভ মেলাতে গোস্বামীজী বৈষ্ণবদের শিবিরের নিকট শিবির করিতেন, ইহা দ্বারাই তাঁকে একটা নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের গণ্ডীভুক্ত করার চেষ্টা অসঙ্গত। তিনি অদ্বৈতবংশ-সম্ভূত বলিয়া সহজেই বৈষ্ণবমাত্রের আদরের ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। তদুপরি কঠোর জ্ঞানচর্চ্চার স্থলে মধুর প্রেমচর্চ্চাই তাঁর মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। এজন্য সন্ন্যাসীর চেয়ে, ভাবুক বৈষ্ণবেরা তাঁর প্রতি অধিক আকর্ষণ অনুভব করিতেন। কোনও সাম্প্রদায়িক কারণ তাঁহাকে কুম্ভ মেলাতে বৈষ্ণবদের শিবিরের নিকটে শিবির সংস্থাপনে প্ররোচিত করিয়াছিল, এত ছোট তাঁহাকে মনে করিতে ইচ্ছা যায় না। ব্রহ্মানন্দ পরমহংস-জীকে বৈষ্ণব বলিয়া আজ পর্য্যন্ত কেহ অনুমান করেন নাই, সন্ন্যাসী হওয়াই খুব সম্ভব বলিয়া অনেকে মনে করেন। স্বয়ং মহাপ্রভু এবং আচার্য্য অদ্বৈত স্বপ্নযোগে গোস্বামীজীকে দুইবার দীক্ষাদান করেন, এ কথা প্রসিদ্ধ। ঐ দীক্ষাতেও গোস্বামীজী ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্মমত ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ পরমহংসজীর স্পর্শমাত্র যেন মানুষটীর রূপান্তর হইয়া গেল। গুরুবাদ-বিরোধী গোস্বামীজী ব্রহ্মানন্দকে গুরু করিলেন, গেরুয়া-বিরোধী গোস্বামীজী সন্ন্যাসীর বেশ গেরুয়া ধরিলেন। এই ঘটনা হইতে তাঁহাকে বৈষ্ণব গোস্বামীদের চাইতেও সন্ন্যাসীদের অধিক নিকটতর বলিয়া মনে হয়।

"বাংলার কয়েকটা বিরাট পুরুষ গোস্বামীজীর শিষ্য,—অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ও কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী। এই চারি-

জনের ধর্ম্মমত ও সাধন-পন্থা চারি প্রকার। ইহা হইতেই বুঝা যায়, গোস্বামীজী নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের গণ্ডীর মধ্যে ছিলেন না। গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে চারিজন একমতানুবর্ত্তীই হইতেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় শিষ্যদিগকে কি কি মন্ত্র দিতেন, তাহা আমি জানি, সুতরাং এই বিষয়ে আমার কথা প্রামাণ্য।

"বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর সহিত যখন শেষ জীবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেখা হয়, তখনকার আলাপ-আলোচনা অমৃতলাল গুপ্তের গ্রন্থে পাঠ করিলে এই বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারিবে।

অখণ্ডেরা কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত

"অখণ্ডেরা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি কোনও সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ নন। তাঁরা নাম করেন এবং নামের সাহায্যে নিজ নিজ ইষ্টের ভজনা করেন। নামই তাঁদের পরম অবলম্বন, নাম করিতে করিতে নামই তাঁদের বলিয়া দেয় কোন্ মুর্ত্তি ধ্যেয় এবং কে ইষ্ট ?

সমালোচনায় টলিও না

"পল্লীবাসী বৈষ্ণব নামে পরিচিত ভক্তদের সমালোচনায় বাবা নিজ সাধনে অবিশ্বাসী হইও না। তত্ত্ব জানিয়া যে নিন্দা করে, সে সামঞ্জস্যের পথও দেখাইয়া দেয়, তার নিন্দায় সাধন-নিষ্ঠা কমে না ; সুতরাং ঐ নিন্দাকে নিন্দা বলাই অনুচিত। তত্ত্ব না জানিয়া যে নিন্দা করে, সে সামঞ্জস্যের পথ ধরাইয়া দিতে পারে না, গুরুতে, ইষ্টে ও সাধনে কেবলি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়ের সৃষ্টি করে। অমৃত যদি পাইতে চাও, সমালোচনার প্রতি উদাসীন থাকিয়া বীরবিক্রমে সাধন করিয়া যাও। নিজেকে কোনও একটা দলভুক্ত বলিয়া যতক্ষণ পরিচয় না দিতেছ, ততক্ষণ প্রত্যেক দলই নিজ কোলে ঝোল টানিবার জন্য বিরুদ্ধ-ভাবে রসনা-তাড়ন করিবে। কিন্তু সাধক কি তাহাতে টলিবে ? সাধারণ বৈষ্ণবেরা এমন অনেক কাহিনী বলেন, যাহা ইতিহাস-সম্মত নয়। সেই সব কাহিনীর ভিত্তিতে যুক্তিজাল ছড়াইলেই তুমি স্বমত ও স্বপথ পরিত্যাগ করিয়া যাইবে ? বলা হইয়া থাকে, রূপ গোস্বামীর সহিত শ্রীবৃন্দাবনে মীরা বাঈএর সাক্ষাৎ ঘটিত এক গল্প। অথচ ইতিহাস বলিবে, মীরা বাঈএর যখন অন্তর্দ্ধান

হয়, তারও পাঁচ সাত বৎসর পরে রূপ গোস্বামীর হয় জন্ম। বলা হইয়া থাকে, রামানুজ স্বামীর সহিত তর্কে শঙ্করাচার্য্য পরাজিত হইয়াছিলেন। অথচ, ইতিহাস বলে, শঙ্করের জন্ম রামানুজের আবির্ভাবের শত দুই বৎসর আগে এবং শঙ্কর মাত্র বত্রিশ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। বলা হইয়া থাকে, আকবর বাদশাহ মীরা বাঈকে দেখিতে গিয়াছিলেন,—অথচ আকবরের পিতা হুমায়ূনেরই তখন বয়স আট নয় বৎসর মাত্র। * * * তোমাদের সাধন যে কি বস্তু তাহা অপরকে বলিতে যাওয়ার প্রয়োজন কি? বাহ্যতঃ সকলের সঙ্গে মিলিয়া প্রেমানন্দে কীর্ত্তনাদি কর, নিভৃতে নিজের গুরুদত্ত সাধন চালাও। বৈষ্ণবদের নিন্দা করিও না, নিন্দা মহাপাপ, কিন্তু তাহাদের কেহ তোমার সাধনকে নিন্দা করিলে উপেক্ষা কর এবং অধিকতর যত্নে নিভৃতে নিজ গুরুদত্ত সাধন চালাও। সাধনবস্তু বাহিরে প্রচার করিবে কেন? অন্যকে সমালোচনার সুযোগই বা দিবে কেন? তোমার সাধন 'শুষ্ক' কিনা, নিজে সাধন করিয়া দেখ। কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীকে দেখ। মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। সামান্য গ্রাম্যলোকের কথায় কেন বিচলিত হইবে?

ভারতে সম্প্রদায়-বিস্তারের গূঢ় রহস্য

"ভারতে কি ভাবে কি ভাবে এক একটা সম্প্রদায় বিস্তারিত হইয়াছে, জান বাবা? এক একজন মহাপুরুষ ঈশ্বর-দত্ত চাপরাশ লইয়া আসিয়াছেন, অমনি নির্ব্বিচারে মানুষ তাঁর শিষ্য হইয়াছে। যে শিষ্য হইয়াছে, সে নির্ব্বিচারে গুরুবাক্য পালন করিয়াছে, নিজের সমস্ত অতীত রুচি ও বিগতের সংস্কার একেবারে বিস্মৃত হইয়া। কিছুদিন আগে বাবা ভোলা গিরি দেশ মাতাইলেন, সম্প্রতি বাবা সন্তদাসের সেই অবস্থা। ভোলাগিরির শিষ্যেরা নির্ব্বিচারে শিবপূজা ধরিলেন, সন্তদাসের শিষ্যেরা, কৃষ্ণপূজা নহে, নির্ব্বিচারে বিষ্ণুপূজা ধরিতেছেন। এইভাবেই জগতে যখন যেমন প্রয়োজন, সদ্‌গুরুর আবির্ভাব হইতেছে এবং লোকে কৃপা পাইয়া তাঁর পথ ধরিতেছে। * * * এই পত্রখানা গ্রামের সকল অখণ্ড যুবকদের নিয়া পড়িও এবং আলোচনা

করিও। অপরাপর সম্প্রদায়ের প্রতি তোমাদের যেন শ্রদ্ধা না কমে। সকলকে ভালবাসিও। সকলের সহিত মিশিও। সকলকে প্রেম দিও। সকলের কাছে ভক্তি শিক্ষা করিও। কিন্তু যাই কর, নিজ সাধনধর্ম্মে অটল অচল থাকিয়া। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের ইষ্টনিষ্ঠা বর্দ্ধিত হোক্। ইতি আশীর্ব্বাদক—স্বরূপানন্দ।

রহিমপুর আশ্রম
৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

যথার্থ সন্তান

বিগত ৫।৬ দিন ধরিয়া শ্রীশ্রীবাবা আশ্রমের কৃষিকার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন। নানাদেশ হইতে বিবিধ শাকসব্জীর বীজ আনিয়া রোপণ করা হইতেছে। উদ্দেশ্য—পুনরায় বীজোৎপাদন করিয়া দরিদ্র কৃষকদিগকে বিনামূল্যে বিতরণ করা। মাটি কাটার ধুম চলিয়াছে। কোদাল দিয়া কাজ করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবার হস্তে একটা ফোস্কা পড়িয়াছে। গ্রামবাসী ভক্ত যুবক শ্রীমান্ যোগেন্দ্র সাহা জোর করিয়া শ্রীশ্রীবাবার হাত হইতে কোদালী কাড়িয়া লইয়া কাজ আরম্ভ করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—পুত্র চায় লোকে এরই জন্য। আমার আরব্ধ কর্ম্ম নিজ হাতে স্বেচ্ছায় যে তুলে নেয়, সেই আমার যথার্থ সন্তান, দিন রাত "বাবা" "বাবা" ব'লে যারা কাণ ঝালাপালা করে, তারা কেউ পুত্রও নয়, কন্যাও নয়।

যোগেন্দ্র খুব লজ্জিত হইলেন এবং প্রবল বিক্রম-সহকারে কোদাল চালাইতে লাগিলেন।

পরমহংসদের শারীরিক শ্রমের দরকার কি?

নবীপুর গ্রাম হইতে জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীবাবার এই কঠোর শারীরিক শ্রমচর্চ্চা দেখিতেছিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—পরমহংসদের শারীরিক শ্রমের দরকার কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—লোকহিতার্থে যখন যা দরকার, তখন তাই কর্ত্তে

হবে। রোগীর শিয়রে ব'সে পাখার বাতাস কর্লেই তার সম্যক্ সেবা করা হল না, সময়ে তার গু-ও ফেল্‌তে হয়।

গৃহীর প্রতি সন্ন্যাসীর দান, বাক্য নহে—সূক্ষ্ম চিন্তা

কিছুক্ষণ পরেই শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার পোদ্দার আসিয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন, শ্রীশ্রীবাবাকে একবার তাঁহার ভবনে পদধূলি দিতে হইবে। শ্রীশ্রীবাবা প্রার্থনা রাখিলেন।

অশ্বিনীবাবুর বাড়ীতে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবা চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিলেন। একজন প্রশ্ন করিল,—বাবা, কথা বল্‌ছেন না কেন? আমরা ত কথা শুনতেই অভিলাষী।

আরও কিয়ৎকাল মৌনী রহিয়া শ্রীশ্রীবাবা মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—গৃহীর ঘরে এসে তাকে কিছু দান ক'রে যাওয়া উচিত। সৎকথা যদি কেউ দান করেন, তবে ভালই। কিন্তু সৎকথা ব'লে যা' দান করা যায়, একাগ্রমনে সৎচিন্তা ক'রে তার চেয়ে বেশী দান করা সম্ভব। সাধু-সন্ত ঘরে এলে খুব কতকগুলি কথা বলার জন্য তাকে উৎপীড়ন ক'রো না। যার একটা কথা পাল্‌তে পারলে জীবন ধন্য হ'তে পারে, তার কাছ থেকে একশ'টা কথা আদায় করায় লাভ কি? তার চেয়ে বাবা চুপ্‌চাপ্ তিনি এক-আধ ঘণ্টা ব'সে তোমার ঘরে নামজপ ক'রে যান, যাতে স্থায়ী কল্যাণ হবে।

ধ্যানাবস্থায় বাণী

সান্ধ্য উপাসনার পরে আশ্রমী জনৈক ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,—জপ কত্তে বস্‌লে অনেক সময়ে বাণী শুনা যায়। এগুলি কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রথম সময়ে যে সব বাণী সাধকের কাণে আসে, প্রায়শই সেগুলি তার পূর্ব্ব-সংস্কারের রূপ। এতদিন মনের ভিতরে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে বাস কচ্ছিল, এখন ধ্যানকালীন মানসিক স্বচ্ছতার সুযোগ পেয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে। জলে ফিটকিরি দেবার আগে বুঝা যায় না যে, তার মধ্যে ময়লা কি পরিমাণ আছে। ধ্যানজপ অভ্যাস আরম্ভ করার আগেও তেমন ঠিক পাওয়া যায় না যে মনের মধ্যে ক্লেদপঙ্ক কি পরিমাণ রয়েছে। ফিটকিরি

প্রয়োগের পরেই জল থেকে আস্তে আস্তে তার মলটা পৃথক্ হ'তে থাকে, তখন জলের দিকে তাকালে ঘৃণায় বমনোদ্বেগ হ'তে চায়। ধ্যানজপের অভ্যাস আরম্ভ কল্লেও তেমনি মন থেকে তার পূর্ব্বসংস্কারগুলি, চিত্তমালিন্যগুলি আস্তে আস্তে পৃথক্ হ'তে আরম্ভ করে, তখন মনটার বীভৎসতা, রুচির জঘন্যতা নগ্নমূর্ত্তিতে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।

কৌতূহলী প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—তাহ'লে ত' ধ্যানজপ ছেড়ে দেওয়াই ঠিক্!

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—বটেই ত! ফিটকিরির ক্রিয়া জলের উপর যখন আরম্ভ হ'য়েছে, তখন জলের প্রচ্ছন্ন মলিনতা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে ব'লে তুমি তখন তখনি জলের কলসী আস্তাকুড়ে ফেলে দিতে চাও? বুদ্ধির ঢেঁকী আর কি! মনের প্রচ্ছন্ন পাপ যখন ধরা প'ড়ে গেল, তখনই ত আরো জোর্‌সে ধ্যানজপে লেগে পড়া উচিত। তাতে ক্রমে ময়লাগুলির শক্তি লোপ পায়, মন সম্পূর্ণ নির্ম্মল হয়। এই নির্ম্মল অবস্থাতে সাধক যত বাণী শুন্‌তে পায়, সব হয় অভ্রান্ত, নির্ভুল।

বিবাহের আধ্যাত্মিক অর্থ

আশ্রমের প্রতিবাসী একটী যুবক প্রায়ই রাত্রি হইলে নিরিবিলি বসিয়া শ্রীশ্রীবাবার সহিত আলাপ করেন। রাত্রের আহার সারিয়া তিনি আসেন, শ্রীশ্রীবাবার বিশ্রামের সময় হইলে চলিয়া যান। সম্প্রতি তাঁহার বিবাহের আলাপ চলিতেছে। বিবাহ করিবেন কি না করিবেন, তদ্বিষয়ে শ্রীশ্রীবাবার উপদেশ চাহিলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিয়ে কর্‌বি বৈকি! দুনিয়ার সবাই মিলে যদি সন্ন্যাসী হ'য়ে যায়, তবে সৃষ্টি রাখ্‌বে কারা?

প্রশ্নকর্ত্তা বিনয়ের সহিত বলিলেন যে শ্রীশ্রীবাবা নিতান্ত প্রচলিত একটা সাধারণ যুক্তি দিতেছেন, যে যুক্তিটাকে শ্রীশ্রীবাবাই শতবার শতস্থানে অকাট্য বাক্যবাণে খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—বিয়ে কর্‌বি, সৃষ্টি রাখ্‌বার জন্যও নয়, সৃষ্টিকে জগৎ থেকে তুলে দেবার জন্যও নয়, জীবের সাথে ভগবানের যে প্রেম,

সেই প্রেমকে সসীম বাহুবন্ধনের মধ্য দিয়ে স্পর্শ কর্ব্বার জন্য, সসীম ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়েই আস্বাদন কর্ব্বার জন্য। স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে, এ ভালবাসা সসীম, কিন্তু মন্দ জিনিষ এটা কিছু নয়। অসীম ভগবান্‌কে যে বস্তু দিলে জীবের পরমাশান্তি, ঠিক সেই বস্তুই সসীম একটা বিগ্রহে দিচ্ছ ব'লে শান্তিটা পূরাপূরি পাও না, সেই শান্তিটাকে পূরাপূরি পাবার জন্যই ত স্বামী বা স্ত্রীরূপে একটা বিগ্রহ অবলম্বন ক'রে চলার কৌশল আবিষ্কৃত হ'ল, জীব বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'ল।

বিবাহিত জীবনের সপ্ত দশা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অবশ্য বিবাহিত জীবনের সাতটা ভিন্ন ভিন্ন দশা আছে। প্রথম দশায় একে অপরের অপরিচিত, প্রতিদিন একটু একটু ক'রে পরিচয় হচ্ছে, একটু ক'রে প্রীতি বাড়্‌ছে, কিন্তু একের ভিতরে অপরকে ষোল আনা নিমজ্জিত ক'রে দেবার প্রেরণা আসে নাই, অথবা প্রেরণা এলেও সঙ্কোচের বাধা কাটে নাই, একজনের উপর আর একজন সম্যক নির্ভর কত্তে পাচ্ছে না, এবং উভয়েরই স্ত্রী বা স্বামী ব্যতীত অন্য ভালবাসার বস্তু আছে, তাদের টান, তাদের আকর্ষণকে তুচ্ছ ক'রে একজন অপর জনকে ভালবাস্‌তেও যেন অপ্রতিভ। এই অবস্থাটার নাম সশঙ্ক দশা। ক্রমে এই সঙ্কোচের ভাব কেটে গেল, উভয়ের ভাবের বিনিময় চল্‌তে লাগ্‌ল, একজনকে আর একজনের বড় মিঠে ব'লে বোধ হ'তে আরম্ভ কল্ল, কোনো কারণকে আশ্রয় ক'রে এই ভাল লাগা নয়, অকারণে একজনকে আর একজনের ভাল লাগে, একবার দেখ্‌লে বা একবার একটী কথা শুন্‌লে সে ভালোলাগার ভাবটা যেন মদের নেশার মত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মনকে ঝিমিয়ে রেখে দেয়, বিচার কত্তে ইচ্ছা করে না এই ভালো সত্যিই ভালো কিনা,—এই অবস্থার নাম মুহ্যমান দশা। তারপরে আসে উদ্দাম আকুলতা, না পেলে বাঁচ না, লোক-বাধায় কি আসে যায়, লোকনিন্দা চুলায় যাক্, তোমার প্রিয়কে নিয়ে তুমি থাক্‌বে, দিন রাত থাক্‌বে, প্রিয় বা প্রিয়া যদি বাহুপাশ ছে'ড়ে যেতে চায়, জোর ক'রে তাকে ধ'রে রাখ্‌বে, তোমার সুপ্ত সহস্র লালসা এখন জাগ্রত, উত্তেজিত,

তুমি ভোক্তারূপে অবিরাম সিংহ-গর্জ্জন ক'রে ক'রে বিবেকের বাণীকে তলিয়ে দিচ্ছ, আইন-কানুনের তুমি বশীভূত নও। এই অবস্থার নাম উন্মাদিত দশা। এর পরে এল উচ্ছৃঙ্খলতার ফল-চিন্তা, ক্ষণিক ভোগের পরে কি থাকে, ক্ষণিক সুখের স্থায়ী কোন্ ফল, ক্ষণিক তৃপ্তির কোথায় সার্থকতা,—তার হিসাব, তার নিকাশ, তা'র চুলচেরা বিচার অবিরাম চল্‌তে থাকে। এই অবস্থার নাম বিচারিত দশা। অন্তরে অন্তরে বিচার-বিতর্ক যখন একটা হদিস্ খুঁজে পেয়েছে, তখন আসে একটা বিতৃষ্ণা, বিদ্বেষ বা বিরক্তি, যা মুখে প্রকাশ কর না, কিন্তু কার্য্যতঃ তোমাকে তোমার প্রিয়জনের সংসর্গ থেকে অবিরাম দূরে রাখ্‌তে প্রয়াস পায়; তাকে মনে হয় সাপ, বাঘ বা ভল্লুকের মত হিংস্র, কুম্ভীর-বিবরের ন্যায় বিপজ্জনক বা বৃশ্চিক-দংশনের ন্যায় জ্বালাময়। এই অবস্থার নাম বিরক্ত দশা। এর পরে আসে আর একটা দশা, যখন এত বিরক্তির ফাঁকে ফাঁকেও পূর্ব্ব স্নেহ, পূর্ব্ব প্রেম, পূর্ব্ব ভালবাসা মাঝে মাঝে উঁকি মেরে তাকায়, কিন্তু তার এক অভিনব রূপ নিয়ে। আগের প্রেমভাবের স্মৃতিগুলি অন্তরে মধুময় হ'য়ে পুনরায় জেগে উঠ্‌তে চায়, কিন্তু এক নবতর শ্রী নিয়ে। যে প্রেম-পিপাসা আগে উন্মাদের মত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ক'রেছে, তা আবার ফিরে আস্‌তে চায়, কিন্তু হিতাহিত বুদ্ধিকে অভিভূত ক'রে নয়, শুভবুদ্ধিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ক'রে নয়, বিচারের শক্তিকে লুপ্ত ক'রে নয়। প্রেম আসে তার রামধনুর মত বিচিত্র পাখা মেলে, কিন্তু চন্দ্রকিরণের মত সে স্নিগ্ধ, বিদ্যুতের মত সে তীব্র নয়, তার দিকে তাকানো যায়, তার রূপ দে'খে তাকে চেনা যায়, তাকে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, বিপদের ভয় বা আতঙ্ক তাতে থাকে না, অতীতের উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য গভীর অনুতাপও কিছু হৃদয়টাতে খচ্ খচ্ ক'রে বাঁধে না। তবু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার একটা প্রচ্ছন্ন বা অজ্ঞাত চেতনা এ প্রেমাস্বাদন-লিপ্সার পেছনে যেন লুকিয়ে থাকে; এ অবস্থার নাম সংযত দশা। এই অবস্থা পর্য্যন্ত বিবাহিত পুরুষ ও নারী মানুষ, মানুষ-ভাবেই তাদের লীলা, মানুষের দোষগুণের তারা আধার, মানুষের ভ্রম-ভ্রান্তি তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়, অপূর্ণ মানুষের অপূর্ণতার

অপবাদের হাত তারা এড়াতে পারে না। কিন্তু এর পরে যে ভাব আসে, তাতে তারা মানুষী সৃষ্টির সকল লীলার অতীত জগতে বাস করে। তার নাম দিব্য দশা। এই দশায় নরনারীর মধ্যে প্রেম আছে, প্রেম-নিবেদন আছে, প্রেম-পিপাসা আছে, প্রেম-পিপাসার পরিতৃপ্তি আছে, কিন্তু নাই শুধু ইন্দ্রিয়-নিচয়ের অপেক্ষা, নাই কোনো পতন এবং নাই কোনো প্রচ্ছন্ন আত্মরক্ষণের চেষ্টা। বিশাল-সমুদ্র-বেষ্টিত প্রাণীহীন দ্বীপে যেমন অঙ্কুরের গাছ ক্রমেই বাড়ে, দৃষ্টি তার অসীম সমুদ্রের অফুরন্ত তরঙ্গায়িত নৃত্যলীলার পানে, অথচ গরু-ছাগলের ভয় নাই, হিংস্রক মানুষের কুঠারাঘাতের আতঙ্ক নাই। এই দিব্য দশা বিবাহিত জীবনের শ্রেষ্ঠ দশা এবং একে লাভ করার জন্যই ত' বিবাহিতের যত কিছু সাধন-ভজন-তপস্যা।

বৈষ্ণবদের পঞ্চ রস

যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার মুখে শুন্‌ছি বিবাহিতের সপ্তদশা, বৈষ্ণবদের মুখে শুনি তেমনি পঞ্চরসের কথা।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাতটা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা স্পষ্ট ক'রে বর্ণনা করেছি ব'লে যে দশা ঠিক সাতটাই হবে, তার কোনো মানে নেই। মূল স্বরগ্রাম সাতটা, কিন্তু তার মধ্যবর্ত্তী কোমল, অনুকোমল, অতি-কোমল প্রভৃতি কতগুলি বৈচিত্র্যের অবস্থাই না আছে। একটা অবস্থার সাথে অপর এক অবস্থার মিশ্রণের ফলেও কত কত অভিনব অবস্থার সৃষ্টি হ'তে পারে। যেমন নীল আর হরিদ্রাবর্ণ মিশিয়ে সবুজ, লাল আর কালো মিশিয়ে খয়েরি, লাল আর নীল মিশিয়ে পাটল, লাল আর শাদা মিশিয়ে গোলাপী ইত্যাদি। তোমার সাথে আমার মিলনের ফলে যদি একের বা উভয়ের আনন্দ সঞ্চার হয়, তবে মিলনের এই ভঙ্গীটাকে একটা রস ব'লে নাম দিতে পারি। একজনের মহিমা দে'খে আর একজন মিলে, আনন্দ পায়,—এই মিল্‌বার ঢংটীর নাম শান্ত-রস। একজনের সখিজনোচিত প্রীতিময় ব্যবহারে আকৃষ্ট হ'য়ে আর একজন তাঁর সাথে মিলে আনন্দ পায়,—মিল্‌বার এই ঢংটীর নাম সখ্য-রস। একজনের প্রতি মাতৃ-পিতৃ-ভাব বা সন্তান-ভাব নিয়ে

আর একজন তাঁর সঙ্গে মিলে আনন্দ পায়,—মিল্‌বার এই ঢংটীর নাম বাৎসল্য-রস। একজনের প্রতি প্রভুত্ব আরোপ ক'রে নিজে দীনাতিদীন সেবক হ'য়ে তাঁর পদতলে গিয়ে মিলে আর একজন আনন্দ পায়, মিলনের এই ঢংটীর নাম দাস্য-রস। একজন আর একজনকে প্রাণ-প্রিয়তম জীবন-বল্লভ জেনে তাঁর সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আনন্দ লাভ করে,—মিল্‌বার এই ঢংটীর নাম মাধুর্য্য-রস। সখ্য-রসের ভাবুক প্রেমিকের সাথে গলাগলি ধ'রে থাক্‌তে চায়, দাস্য-রসের ভাবুক উপাস্যের পদতলে গড়াগড়ি দিয়ে ধন্য হ'তে চায়, মাধুর্য্য-রসের ভাবুক প্রাণ-বল্লভকে হৃদয়ে তুলে নিতে চায়। এগুলি তাদের সাধারণ লক্ষণ। কিন্তু একজনের ভিতরে এক সময়ে কেবল একটা রসেরই বিকাশ হবে, মিশ্ররস কখনো আস্‌বে না, এরূপ মনে করা ভ্রম। পদসেবা কত্তে কত্তে দাসীর মনে এক সময়ে হঠাৎ মাধুর্য্য রসের ব্যাকুলতা জেগে উঠ্‌তে পারে, সে নিতান্তই দাসী ব'লে নিজেকে জেনেও কেঁদে কেঁদে বল্‌তে পারে, "প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ লাগি।" মাধুর্য্য রসের প্রেমময়ী হ্লাদিনী নায়িকার মনে হঠাৎ এক সময়ে প্রাণবল্লভের পদতলে মাথা লুটিয়ে দিয়ে কেঁদে কেঁদে বল্‌তে ইচ্ছা হ'তে পারে,—"জনমে জনমে আমি হব তোমার দাসী।" পাঁচটা রস ব'লে আলাদা করা হ'য়েছে তোমাদের বোঝবার সুবিধার জন্য। বাস্তবিক রস কখনো পাঁচটা নয়। রস একটা। তার বিকাশ লক্ষ লক্ষ রূপে, লক্ষ লক্ষ রকমে, লক্ষ লক্ষ ঢংয়ে। রসের যতগুলি বিকাশ, ততগুলিই প্রকার বল্‌তে হবে। তথাপি মোটামুটি বুঝ্‌বার সুবিধার জন্য বলা হ'য়েছে পঞ্চরস। যেমন, যত জীব তত রকমের আসন, তবু চৌষট্টি রকমের আসনকে পৃথক্ ক'রে প্রকৃষ্ট বলা হ'য়েছে। তেমনি, যত প্রেমিক তত রস, তবু রসে যার মন ডোবেনি তাকে রসলুব্ধ করার জন্য রসতত্ত্বালোচনা সুগম করার জন্য নম্বর দিয়ে বলা হ'য়েছে, পঞ্চ রস, আর, সাইনবোর্ড টানিয়ে বলা হ'য়েছে, উপনিষদের ঋষিরা শান্ত-রসিক, আর ব্রজগোপীরা মাধুর্য্য-রসিক। কিন্তু খুঁজে দেখ না বাবা এক শান্ত-রসেরই কত রকমের বৈচিত্র্য। চৌষট্টি হাজার গোপীর চৌষট্টি হাজার রকমের মাধুর্য্য-রস। রসো বৈ সঃ,—তিনি রস-স্বরূপ, রসেই পরমাত্মার পরিচয়, রসই তিনি,

তিনিই রস ; তিনি অমিত, রসও অমিত ; তিনি বিচিত্র, রসও বিচিত্র ; তিনি অসীম, রসও অসীম। তিনি অসীম, তাঁর সৃষ্টিরও সংখ্যার শেষ নাই, সৃষ্ট জীবের সাথে তাঁর প্রেম-সম্বন্ধও অশেষ, এই প্রেমসম্বন্ধের বিচিত্র লীলাও অশেষ। রসতত্ত্ব আর বল্‌ব কি বাবা,—এ ব'লে ক'য়ে বোঝান যায় না। যে চিনি খেয়েছে, সেই জানে মিষ্টি কাকে বলে। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে মিষ্টান্নের দোকানের দিকে শতবার অঙ্গুলী তাড়না ক'রে তোমাকে বুঝাতে গেলেও জিভে বস্তুর স্পর্শ না ঘটা পর্য্যন্ত রসতত্ত্ব বাক্যমাত্রেই সার।

রহিমপুর আশ্রম
৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

গতকল্য মুরাদনগর দুর্গারাম হাই ইংলিশ স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত ফটিক-চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীশ্রীবাবাকে বারংবার অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন, যেন আগামী দিন অবশ্যই তিনি স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভাতে যোগদান করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। অদ্য দ্বিপ্রহরের সময়েই বিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র শ্রীশ্রীবাবাকে নিয়া যাইবার জন্য আসিয়া বসিয়া আছেন। সভাস্থলে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে কতিপয় শিক্ষকের নেতৃত্বে ব্রতী বালকসঙ্ঘ শ্রীশ্রীবাবাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া নিলেন। বিশেষ করিয়া এইরূপ সম্বর্দ্ধনার কারণ শ্রীশ্রীবাবা কিছুই বুঝিলেন না। কিন্তু সভার কার্য্যারম্ভ হইলে দেখা গেল, সকলে শ্রীশ্রীবাবাকেই সভাপতির পদে বরণ করিলেন।

কার্য্য-তালিকানুযায়ী বার্ষিক বিবরণী-পাঠ, পুরস্কার-বিতরণ প্রভৃতি হইয়া গেলে শ্রীশ্রীবাবা সভাপতির অভিভাষণ প্রদান করিলেন। সমবেত জনমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

মনুষ্যত্বের ভিত্তিভূমি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ছাত্রগণ, লক্ষ্য তোমাদের হউক বিশাল, দৃষ্টি তোমাদের হউক উদার, চিত্ত তোমাদের হউক সর্ব্বালিঙ্গনকারী। উদারতাই মনুষ্যত্বের ভিত্তিভূমি, সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে মনুষ্যত্বের মহা-মহীরুহ প্রবর্দ্ধিত হ'তে পারে না, সে নিজেতে নিজেকে জড়িয়ে, গুল্মমাত্রে পর্য্যবসিত হ'য়ে যায়। উপলব্ধি

কর, ব্রহ্মসমুদ্রে নিমজ্জনই জীব-নদ-নদীর একমাত্র লক্ষ্য এবং মনে রাখ, সব নদীর ধারাই জলের, সব নদীর গতিই এক দিকে। দেশে দেশে যে সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষানল প্রধূমিত হ'য়েছে, হে ছাত্রবৃন্দ, তোমরা তোমাদের ভিতর থেকে সর্ব্বাগ্রে তার প্রতিবাদ কর এবং প্রতিষেধ বিধান কর। সকল ধর্ম্মের মহাত্মা ও ঋষিরাই ভগবানে আত্ম-নিমজ্জনের সাধনা ক'রে গিয়েছেন, এবং সত্যি সত্যি যারা ভগবানকে চায়, তাদের মধ্যে মানুষে মানুষে বিদ্বেষ-সৃষ্টির চেষ্টা বা উৎসাহ থাকৃতে পারে না। দুঃখের বিষয়, তোমরা অনেকেই সদ্‌গ্রন্থ পাঠ কর না এবং যারা কর, তারাও গ্রন্থলিখিত ইঙ্গিত সমূহকে মনুষ্যত্বের বিকাশ-সাধনে প্রয়োগ কত্তে চেষ্টা কর না। তোমরা তোমাদের এই সুগভীর ঔদাসীন্য দূর কর। কি ক'রে মানুষ হবে, সেই চিন্তাকেই জীবনের সব চেয়ে বড় চিন্তা ব'লে গ্রহণ কর, মনুষ্যত্বপথের সকল কণ্টককে দলন করাই জীবনের প্রথম কর্ত্তব্য ব'লে মনে কর। যতকাল পূর্ণ মনুষ্যত্ব না অর্জ্জন করবে, ততকাল বীরবিক্রমে কর নিজের চিত্তবৃত্তির পরিশোধন আর উন্নততম আদর্শের পূজা।

জগতের সকল সম্প্রদায় কি এক হইবে?

শ্রীশ্রীবাবা প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদানের পরে সভাভঙ্গ হইলে রহিমপুর আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে রহিমপুরবাসী যুবক-ভক্ত শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র পোদ্দার শ্রীশ্রীবাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা, জগতের সকল সম্প্রদায় কি কখনও এক হ'য়ে যাবে?

শ্রীশ্রীবাবা।—তোর কি মনে হয় রে?

দেবেন্দ্র।—আপনি ত বল্লেন, সকলে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ভুলে যাও। কিন্তু কেউ কেউ যে জগৎ থেকে সকল সম্প্রদায়কে তুলে দিতে চান, মাত্র একটী সম্প্রদায় রাখ্‌তে চান! এই ভাবে সকলকে একটী সম্প্রদায়ের ভিতরে নিয়ে ঢুকাবার চেষ্টা কি জগতে আরও ভেদ-বিসম্বাদ বাড়িয়ে দেবে না?

শ্রীশ্রীবাবা।—বাড়াবে বৈ কি? তুমি যদি একটী নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্তি বশতঃ তাকে রেখে আর সব সম্প্রদায়কে একেবারে ধ্বংশ ক'রে ফেল্‌তে যাও, তাহ'লে আর একজন ব্যক্তিও তার সম্প্রদায়কে রক্ষা ক'রে

জগতের অপর সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সম্প্রদায়টীকে ধ্বংশ ক'রে ফেল্‌তে চাইতে পারেন। এ অধিকার তাঁর আছে, এ প্রয়োজনও তাঁর হ'তে পারে। সুতরাং সবাই মিলে যদি শুধু পর-সম্প্রদায়কে চূর্ণ কর্ত্তেই লেগে যায়, জগতে শান্তি থাকৃতে পারে না। আর, অশান্তির ভিতর দিয়ে সকলের মিলনও কখনো সাধিত হ'তে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় জগতে থাকৃবেই, কিন্তু সাম্প্রদায়িক দেওয়ালগুলি আকাশস্পর্শী উঁচু না হ'য়ে কোমর-সমান নীচু হ'লে সকলেরই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য-রক্ষাও হয়, আবার পরস্পর পরস্পরকে দেখ্‌তে পারে, জান্‌তে পারে, ভাবের আদান-প্রদান কর্ত্তে পারে, সহযোগিতা কর্ত্তে পারে, একে অন্যের দ্বারা উপকৃত ও পরিপুষ্ট হ'তে পারে।

অনুদিন অনুক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাসে নামজপ

রাত্রিতে শ্রীশ্রীবাবা ময়মনসিংহ-শ্রীবরদী নিবাসী জনৈক ভক্তের নিকট এক পত্রে লিখিলেন,—

"বৎসরের প্রত্যেকটী দিনই জগন্মাতার পূজার দিন। পঞ্জিকা-নির্দ্দিষ্ট দিনগুলি শুধু প্রতিদিনকার অর্চ্চনা-নিষ্ঠা বর্দ্ধিত করিবারই জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রত্যেক দিনই তাঁহার কোলে নিজেকে সমর্পণ করিতে হইবে, তাঁর স্নেহ-পরশ লাভ করিতে হইবে। প্রেমময়ী মা তাঁর আদরের সন্তানকে বুকে না ধরিয়া কতদিন থাকিবেন, সন্তানকে কোলে তুলিয়া না নিয়া কি করিয়া তাঁর স্নেহময়ী নামের মর্য্যাদা রাখিবেন ?

"প্রত্যেকটী নিঃশ্বাস মাকে আনিয়া তোমার ভিতরে প্রতিষ্ঠিত করুক, প্রত্যেকটী প্রশ্বাস তোমাকে মায়ের কোলে নিয়া ফেলিয়া দিক্‌। অলক্ষিত থাকিয়া যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস জীবনরক্ষার ছলনায় শুধু আয়ু হরণই করিতেছে, জগজ্জননীর সহিত তোমার নিত্য-প্রেমলীলার সে বাহন হউক। নামের হুঙ্কার করিয়া প্রত্যেকটী প্রশ্বাস সন্তানকে মায়ের দিকে আগাইয়া দেউক, প্রত্যেকটী নিঃশ্বাস প্রেমভরা আকুল আহ্বানে স্নেহময়ী মায়ের হৃদয়ে প্রবল প্লাবন সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে সন্তানের দিকে আকৃষ্ট করুক।

"মা জগন্ময়ী, তাঁকে পাইবার পথ তাঁর নাম, নামকে অহর্নিশ প্রাণে

জাগাইয়া রাখিবার উপায় শ্বাস ও প্রশ্বাস। দিনান্তে যে নিমেষের তরে এই সুদুর্ল্লভ উপায়ে মায়ের পরমমঙ্গল মহানাম স্মরণ করে, মা নিজেই কৃপা করিয়া তাঁর সমগ্র জীবনকে ধীরে ধীরে নামময় করিয়া লন। মনের সহস্র-মুখিনী বাহ্য গতি দেখিয়া হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই বাছা, একটু করিয়া নিজেকে তাঁর কাছে দিতে চাহিলে তিনি নিজেই তোমাকে দশবাহু বিস্তার করিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন।"

রহিমপুর আশ্রম
৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

সময়ের মূল্য

অদ্য শ্রীশ্রীবাবার দুইটী প্রিয় সন্তান দ্বারভাঙ্গা যাইবেন। মুরাদ নগর হইতে গয়না নৌকায় নারায়ণগঞ্জ যাইতে হইবে। সন্ধ্যা সমাগত-প্রায়। কিন্তু একজন কিছুতেই আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিতেছেন না। শ্রীশ্রীবাবা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—জগতের অনেক যুদ্ধে দুই এক মিনিটের শৈথিল্যের জন্যই পরাজয় আসিয়াছে।

ধামঘর,
৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

বাহ্যানুষ্ঠানের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভিতরকে জাগান

অদ্য প্রাতেই আসিয়া শ্রীশ্রীবাবা এবং তাঁহার দুই প্রিয়তম শিষ্য নারায়ণগঞ্জ পৌঁছিয়াছেন। কিন্তু ময়মনসিং যাইবার ট্রেণ সন্ধ্যার আগে নাই বলিয়া বৃথা ষ্টেশনে সময় নষ্ট না করিয়া সকলে ঢাকেশ্বরী কটন মিলের নিকটবর্ত্তী ধামঘরে গমন করিলেন।

একটী প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বাইরের নাম ভিতরে প্রবেশ করুক, তারই জন্য উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন। বাইরের প্রয়াস মর্ম্মকে ভেদ করুক, প্রাণকে প্লাবিত করুক, তারই জন্য যত বাহ্যানুষ্ঠান। ভিতর যদি না জাগে, তবে বাইরের পূজা আর অর্চ্চনা, আরতি আর কীর্ত্তন কিছুতেই কিছু হয় না।

ময়মনসিংহ
১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

জননীর পূজা

মঙ্গলবার শ্রীশ্রীবাবার জন্মদিন। এই দিন শ্রীশ্রীবাবা তাঁর গর্ভধারিণী জননীর পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যান করেন। এই দিবস বাবা স্ত্রীলোকমাত্রের প্রতি একটু অধিক পরিমাণ সম্মানশীল থাকেন। প্রতিবেশিনী একটী মহিলা অদ্য প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীবাবার চরণ-বন্দনা করিতে আসিলে বাবা বলিলেন,—আজকে আমায় প্রণাম কর্ব্বি? তোরা যে আমার মায়ের সাথে অভিন্ন!

সাধক-পুরুষদের আত্মগোপন

অপরাহ্নে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের কতিপয় ছাত্র এবং আদালতের কয়েকটী যুবক-কর্ম্মচারী শ্রীশ্রীবাবার উপদেশ পাইবার জন্য সমবেত হইয়াছেন। সাধুদের আত্মগোপনের প্রসঙ্গ উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাধুরা অনেক সময়ে আত্মগোপন ক'রে থাকেন। কারণ, নিজেকে জাহির ক'রে ফেল্‌লে অনেক সময়ে অবনতি ঘটে।

জিজ্ঞাসু একজন প্রশ্ন করিলেন,—যিনি ভগবদ্দর্শী সিদ্ধ পুরুষ, তাঁর ত' আর পতনের ভয় নাই।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু হাঙ্গামার ভয় আছে। জীব-কল্যাণ যাঁদের ব্রত, কিছু আত্মপ্রকাশ তাঁদের কত্তে হয়ই। কিন্তু ভিড়ের মাঝে কাজ জমে না, জমে গোলমাল। অনেক সময়ে সাধক পুরুষেরা আত্মগোপন করেন, শিষ্য-পরীক্ষার জন্য।

আত্মগোপনের উপায় ও ফলাফল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেউ কেউ আত্মগোপন কর্‌বার জন্য নিজের চরিত্রকে প্রকৃত রূপের বিপরীত দেখান। যেমন, কোনও একজন সাধু লোকের ভিড়ে টিক্‌তে না পে'রে শেষে একদিন চুরি কর্লেন, ধরা পড়্‌লেন, অপমানিত হ'লেন, সেই থেকে লোকের ভিড়ও কমে গেল। কাশীতে পূর্ণানন্দ স্বামী

মাতাল লম্পটের ভূমিকা অভিনয় ক'রে দীক্ষাপ্রার্থীর ভিড় কমাতেন। কোনও কোনও মহাত্মাকে দুর্দ্দান্ত ক্রোধ প্রকাশ ক'রে লোক তাড়াতে দেখা যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, এ সব উপায় সদুপায় নয়। এসব উপায় অবলম্বনের দ্বারা সাধারণকে অন্তরূপে কুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হয়। লোকের উৎপাত থেকে আত্মরক্ষা করার দুইটী উপায় আমার খুব পছন্দ হয়। একটী হচ্ছে, সর্ব্বপ্রকার সাধুত্বের পরিচায়ক সাম্প্রদায়িক চিহ্ন বর্জ্জন করা এবং প্রয়োজনমত একেবারে মৌনী হ'য়ে যাওয়া।

"অখণ্ডে"র গুরু-দক্ষিণা

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—দীক্ষা গ্রহণের পর গুরুদক্ষিণা দেওয়ার প্রয়োজন কি? গুরুদক্ষিণা দিতে গেলে ত' একটা দান-প্রতিদানের ব্যাপার এসে গেল, একটা দোকানদারী গোছের হ'ল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমাদের কাছে আমার কিরূপ গুরুদক্ষিণার দাবী জানো? অকৃতদার বালক তোমরা, তোমাদের কাছে আমার প্রার্থনা নিজে ব্রহ্মচর্য্য পালন এবং অপরকে ব্রহ্মচর্য্য-বিষয়ে উৎসাহ দান। যাবৎকাল সংসার-প্রবিষ্ট না হচ্ছ, তাবৎকাল ইচ্ছাকৃত বীর্য্যক্ষয় একেবারে সম্যক্‌রূপে বন্ধ রাখ্‌তে হবে এবং অনিচ্ছাকৃত অজ্ঞাত বীর্য্যক্ষয় যাতে ক'মে যেতে পারে, তার জন্য ব্যায়াম, উপাসনা, সৎপ্রসঙ্গ, সচ্চিন্তা, সৎকথা ও সদ্‌বুদ্ধির সেবা কর্‌বে। সংসার-প্রবেশের পরেও যাতে বৃথা জৈব ব্যবহারের প্রাচুর্য্য না ঘট্‌তে পারে, তার জন্য চেষ্টিত হবে। সংসারীকে আপ্রাণ প্রয়াস পেতে হবে, যাতে তার সন্তান-সন্ততিগুলি বীর্য্যহীন, রুগ্ন, দুর্ব্বলচেতা হ'য়ে জন্মাতে না পারে। এতদ্ব্যতীত, জীবনের যে সময়ে যে অবস্থাতেই থাক না কেন, সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ সর্ব্বাবস্থাতেই সংযম ও সতীত্বের অনুকূল ভাব নরনারী সর্ব্বসাধারণের ভিতরে প্রচার কর্ত্তে চেষ্টা কর্ব্বে। এই হবে আমার সন্তানদের গুরুদক্ষিণা। আমার কোনও সংসার নেই যে পোষণ কর্ব্বার জন্য তোমাদের অর্থ দরকার হবে। আমার আশ্রম? সে আজ আছে ত' কাল হয়ত থাকৃবে না। স্থায়ী হবে ব'লে আমি কোনও আশ্রমের জন্য শ্রম কচ্ছি না।

থাকবে না জেনেই প্রাণান্ত শ্রম কচ্ছি। অর্থ আমাকে দিতে হবে না। আমি কাঙ্গাল তোমাদের চরিত্র-ধনের।

ব্রহ্মচর্য্য রক্ষণের উপায়

প্রশ্ন।—কিন্তু আমরা যদি সম্যক্‌রূপে ব্রহ্মচর্য্য পালন কত্তে না পারি?

শ্রীশ্রীবাবা—সাধ্যমত চেষ্টা ক'রে যাবে এবং চেষ্টা যাতে সফল হয় তার জন্য উপযুক্ত উপায় অবলম্বন কর্ব্বে। তারপরেও যদি ত্রুটী-বিচ্যুতি আসে, তবে সে দোষ তোমার নয়।

প্রশ্ন।—কি উপায় অবলম্বন কর্ব্ব বাবা?

শ্রীশ্রীবাবা।—ভগবানের নামে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টাই হচ্ছে সর্ব্বোপায়ের শ্রেষ্ঠ উপায়। নামের ভিতর নিজেকে ডুবাও, দেহ তার সহস্র চপলতা বিস্মৃত হবে। নামের রসে প্রাণকে মজাও, তোমার বিকৃত রুচির পরিবর্ত্তন ঘ'টে যাবে।

ময়মনসিংহ

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

স্নানের উপকারিতা

ব্রহ্মপুত্রতীরে অপরাহ্ন-ভ্রমণকালে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণের নিকট নানাবিধ উপদেশ দিতেছেন। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—মনে প্রবল অপবিত্র ভাবের উদয় হ'লে কি করা কর্ত্তব্য?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কর্ত্তব্য অনেকই আছে। কিন্তু শীতল জলে স্নানের দ্বারা মনকে বেশ সহজে আয়ত্ত করা যায়। স্নানে শরীরের স্নায়ুমণ্ডলী স্নিগ্ধ হয়, অতএব মনের অপবিত্রতার উত্তেজক শারীরিক কারণগুলিকে প্রশমিত করে। স্নানের পরে মন স্বভাবতই স্থির হ'তে চায়। এজন্যেই স্নানের পরে ধ্যানজপ প্রশস্ত।

কিসের ধ্যান করণীয়

প্রশ্ন উঠিল,—আমরা কিসের ধ্যান করব?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নামটী রাখ প্রাণে লাগিয়ে একেবারে অবিচ্ছেদ

ভাবে, প্রাণ গেলেও নামকে পরিবর্ত্তিত হ'তে দেবে না। তার পরে যেই রূপে মন যায়, সেই রূপই ধ্যান কর।

গুরুমূর্ত্তি ধ্যান

প্রশ্ন।—কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা এসবে আমার বিশ্বাস নেই।

শ্রীশ্রীবাবা।—কেন বিশ্বাস নেই?

প্রশ্নকর্ত্তা।—পুরাণে অনেক কাহিনী পাঠ করি, যার পরে আর এঁদের প্রতি ঈশ্বরবুদ্ধি আসে না, মানুষের মত মনে হয়। তার জন্যই ভগবানের জন্য ব্যাকুল চিত্ত আর ঐসব রূপের ভিতরে নিজেকে আটক ক'রে রাখ্‌তে চায় না।

শ্রীশ্রীবাবা।—তবে কোন্ রূপ ধ্যান কত্তে তোমার ভাল লাগে?

প্রশ্নকর্ত্তা।—মাঝে মাঝে গুরুমূর্ত্তিই ধ্যান কত্তে আনন্দ পাই। কালী কৃষ্ণ শিব দুর্গা কাউকে কখনো চখে দেখিনি, পটের ছবিগুলিও পরস্পর থেকে বিভিন্ন, এজন্য প্রত্যক্ষদৃষ্ট গুরুমূর্ত্তিই ধ্যান কত্তে ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গুরুও ত' মানুষই বটেন। এই দেখ্ আমার হাত, পা, চখ, নাক, কাণ সবই তোদের মত। তোদের মত আমার আহার নিদ্রা। তোদের মত আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মলবেগ, মূত্রবেগ। তোদের মত আমার স্বাস্থ্য, অস্বাস্থ্য, ভালমন্দ সবই আছে। তবে আমার মূর্ত্তি ধ্যান ক'রে কি লাভ হবে?

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—গুরুমূর্ত্তি ধ্যানের সময়ে গুরুর মানুষ-ভাবটাকে মন থেকে দূর ক'রে দিয়ে তার চিন্ময় পরমাত্মভাবটীর ধ্যান করি।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—উত্তম। তা হ'লে কালী, কৃষ্ণ, শিব, গণেশ এঁদের সম্পর্কেও মন থেকে মানুষ ভাবটাকে দূর ক'রে দিয়ে পরমাত্মভাব নিয়ে ধ্যান কর্লে কি হয় না?

প্রশ্নকর্ত্তা তাহা স্বীকার করিলেন। কিন্তু কহিলেন যে, কালী, কৃষ্ণ, শিব, গণেশ অপ্রত্যক্ষ দেবতা, গুরু সাক্ষাৎ দেবতা। এজন্য গুরুমূর্ত্তি ধ্যানেই জোর আসে বেশী।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোরা জানিস্, আমি আমার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমগুলিতে আমার মূর্ত্তি পূজা কত্তে নিষেধ করেছি?

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—কিন্তু ভক্তেরা যদি জোর ক'রে আপনার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ক'রে ফেলে, তখন আপনি কি কর্ব্বেন? সেই মূর্ত্তি কি আপনি টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পার্ব্বেন?

শ্রীশ্রীবাবা একটু চিন্তিতভাবে বলিলেন,—ফটো আমারই হোক আর তোমারই হোক, কোনও একটা প্রতীক যদি কোথাও ব্রহ্মানুভূতিলাভের সাহায্যার্থে পূজিত হয়, তবে তা' কখনই জোর ক'রে ফেলে দিতে পারি না। কিন্তু যাতে আমার প্রতিমূর্ত্তি কেউ পূজা না করে, এই অনুরোধ আমি ক'রে রাখ্ছি।

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন,—আপনার এই অনুরোধ ভক্তেরা রাখ্লে হয়!

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এ অনুরোধ রক্ষা করা কারো কারো পক্ষে যে কত কঠিন, তা' আমি বুঝি। তবু আমি চাই না যে, আমার মূর্ত্তির পূজা হোক্। গুরুর প্রত্যেকটী আচরণ যার চক্ষে অনিন্দনীয়, গুরুর প্রত্যেকটী অঙ্গভঙ্গী যার নিকটে দেবজনোচিত, গুরুর প্রত্যেকটী বাক্য যার বিচারে অভ্রান্ত বেদমন্ত্র, এমন ভক্তিমান সুপাত্রের পক্ষে গুরুধ্যানের চেয়ে উৎকৃষ্ট অবলম্বন আর কিছু হ'তে পারে না। কিন্তু তবু আমি চাই না যে, তোমরা কেউ আমার প্রতিমূর্ত্তির অর্চ্চনা কর।

গুরু ও শিষ্য একই বস্তু

প্রশ্নকর্ত্তা।—আমরা কেউ যদি জবরদস্তি ক'রে পুজো করি?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—আচ্ছা বেশ, ক'রো, কিন্তু ইড়িং বিড়িং কিড়িং মন্ত্রের আমদানী ক'রো না। পূজো করো, কিন্তু আমার প্রতিমূর্ত্তি অর্চ্চনার সময়ে এই জ্ঞানটী অন্তরে জাগিয়ে রেখো যে, তুমি আর আমি একই বস্তু, দুজনাতে ভেদ নেই, পার্থক্য নেই, দূরত্ব নেই। আমিই তোমার রূপ ধ'রে শিষ্য হ'য়েছি, তুমিই আমার রূপ ধ'রে গুরু হয়েছ। এই ভাবনাকে জোর দেবার জন্য আমার প্রতিমূর্ত্তির সঙ্গেই বা নীচেই সমায়তন একখানা আয়না

রে'খ। সেই আয়নাতে নিজের মুখ দেখ, আর প্রতিমূর্ত্তিতে আমার মুখ দেখ। উভয় মুখের ভিতরে পরম কারণ পরমাত্মাকে দেখ। তাঁর দিব্যস্মৃতি যাতে মন থেকে নিমেষে না দূরে স'রে যেতে পারে, তার জন্য ওঙ্কাররূপী নাদব্রহ্মকে আমার প্রতিমূর্ত্তি ও তোমার প্রতিবিম্ব উভয়ের উর্দ্ধে রেখো। ওঙ্কাররূপী পরম-ব্রহ্মের করুণাই তোমাকে আমাকে দূর থেকে নিকট ক'রেছে, আপনার আপন ক'রেছে, প্রাণের প্রাণ ক'রেছে। ওঙ্কারকে প্রচার ক'রে আমি হ'য়েছি ধন্য, ওঙ্কারকে গ্রহণ ক'রে তুমি হ'য়েচ কৃতার্থ। এই ওঙ্কারের সাধকরূপে, ধ্যাতারূপে, উপাসকরূপে, প্রচারকরূপে দর্পণে তোমার প্রতিবিম্ব আর পাশে বা উপরে আমার প্রতিমূর্ত্তি ওঙ্কারের নীচে থাকবে। তপস্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্ব্বত্র এক-তত্ত্বের অনুভূতি লাভ। জানো, তুমি আর আমি এক; জানো, আমি যার উপাসক আমি তার সাথে এক; জানো, তোমার উপাস্য আর আমার উপাস্য পরমাত্মা এক। এর জন্যই তোমার সব অধ্যবসায় উদ্যত হোক।

রূপের আকর্ষণী শক্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—রূপের আকর্ষণী শক্তি অদ্ভুত। তাই জীব যাকে দেখেনি, তাঁরও রূপ ধ্যান কত্তে সুখ পায়। তাঁর রূপ দর্শনের জন্য আঁখি কেঁদে মরে, প্রাণ ব্যাকুল হয়, সে জন্যেই জীব তাঁকে না দেখা পর্য্যন্ত জগতে যা' দেখে সুন্দর, যা' দেখে প্রাণ-মনোহর, তারই তুলনায় ভগবানের রূপ কল্পনা করে। যতকাল জীব ভগবানকে প্রত্যক্ষ না দেখবে, ততকাল তার রূপের কল্পনা থাকবেই। তিনি নিরাকার ব'লে গভীর দার্শনিক তত্ত্বের গবেষণার পরেই হঠাৎ তুমি দেখ্‌তে পাবে যে, তোমার মন কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট রূপকে, —সেটা অনির্ব্বচনীয়ও হ'তে পারে,—তাঁর রূপ ব'লে যেন নিজের অজ্ঞাত-সারে মেনে নিচ্ছে।

সাকারবাদীদিগকে তুচ্ছ করা উচিত নয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—রূপের ধ্যান প্রকৃত প্রস্তাবে মনকে এককেন্দ্রিক করারই জন্যে জানবে। এজন্যই প্রকৃত সাধকের কাছে কোনও রূপই তুচ্ছ নয়, কোনও রূপই অবজ্ঞার নয়। তবে, অপর দশজন লোকে একটা নির্দ্দিষ্ট রূপের ভিতরে

নিজেদের ডুবিয়ে দিচ্ছেন ব'লে তোমার পক্ষেও সেইটীই যে গ্রহণীয় হবে, তার কোনো মানে নেই। ভগবানের রূপ স্বয়ম্প্রকাশ।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোনও নির্দ্দিষ্ট রূপের প্রতি যখন অন্তরের শ্রদ্ধা বা চিত্তের রুচি টের পাওয়া যাবে না, তখন কি করা কর্ত্তব্য ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তখন কোনও নির্দ্দিষ্ট রূপের ধ্যান কত্তে মোটেই চেষ্টা করবে না। ভগবানের রূপ ত' স্বয়ম্প্রকাশ। তোমার যখন তাঁর রূপ দর্শন করার উপযুক্ততা আসবে, তখন নির্দ্দিষ্ট রূপের ভিতরে মনঃসন্নিবেশনের ফলেও তাঁকেই দেখ্‌বে, আর সকল নির্দ্দিষ্ট রূপকে বর্জ্জন ক'রে চির-প্রতীক্ষার সাধনা ক'রে গেলেও, তাঁকেই দেখ্‌বে। চরম ফল যখন এক, তখন রূপাভিনিবেশে যার রুচি বা সামর্থ্য নেই, তাকে অন্য পথ ধরতে হবে।

অরূপের মধ্যে রূপের প্রকাশ

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—কি পথ বাবা ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—চক্ষু মুদ্রিত ক'রে অবিরাম তাঁর পবিত্র নাম জপ ক'রে যাও, আর লক্ষ্য ক'রে যাও, তোমার চ'খের সামনে কখন কোন্ রূপের প্রকাশ হচ্ছে। অরূপ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তোমার প্রতীক্ষার শক্তিতেই ক্রমশঃ রূপ ফুটে উঠ্‌বে। বিচিত্র রূপ, বর্ণনা তা'র সম্ভব নয়। নানারূপ, বৈশিষ্ট্য তার অনন্ত। যত রূপই যখন ফুটুক, জানবে সবই তাঁরই রূপ, যাঁর পবিত্র নাম তুমি অবিরাম স্মরণ ক'রে যাচ্ছ।

সরূপের মাঝে রূপের সাধন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই ত' গেল অরূপের মাঝে রূপের সাধন। সরূপের মাঝেও রূপের সাধন আছে। এবার আর চ'খ বুজে নয়, এবার একেবারে চ'খ খুলে। অবিরাম নাম জ'পে যাও, আর, যা' কিছু দু'চ'খে পড়ে সবই ভগবানের রূপ ব'লে মনে কত্তে থাক। রূপ শুধু দেখে যাও, পুরুষের রূপ, নারীর রূপ, বালকের রূপ, বৃদ্ধের রূপ, মানুষের রূপ, পশুর রূপ, রেলগাড়ীর রূপ, গরুর রূপ, গরুর গাড়ীর রূপ, উড়ো জাহাজের রূপ, ডুবো জাহাজের রূপ,—দেখে যাও নিঃস্পৃহ উদাসীন সাক্ষীর মতন, নিজেকে কোনও দৃশ্যের সাথে

লিপ্ত না ক'রে, আসক্ত না ক'রে, আর অবিরাম নাম জ'পে যাও। অরূপই সাধ, বাবা, আর সরূপই সাধ, নামটী ছাড়্লে চল্‌বে না। কারণ, নামটী ছাড়ামাত্র ঈশ্বরীয় চিন্তা বন্ধ হ'য়ে যাবে, মূল উৎসের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হবে।

নাদ-সাধন

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—সরূপই হোক্ আর অপরূপই হোক্, কোনও রূপেই যদি মন না বসে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাধন কত্তে হ'লে রুচির উপরে একটু বলাৎকার কত্তেই হয়। মন সহজে বাগ না মান্‌লে জোর ক'রে তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয়। কিন্তু কোনো প্রকারেই যার মন রূপসাধনায় বস্‌বে না, তার জন্যও পথ আছে। সে পথ হচ্ছে অবিরাম নাদ-শ্রবণ। নাম ক'রে যাও, আর লক্ষ্য ক'রে যাও, নামের ধ্বনির পিছন থেকে কোন্ মহাধ্বনি সব কিছু ছাপিয়ে নিজেকে প্রকাশ কত্তে চাচ্ছে। মন যতই অরুচিগ্রস্ত হোক্, তবু নাম জপ্‌বে, এইটুকু হ'ল তোমার আয়োজন মাত্র। নামের পশ্চাৎ হ'তে কোন্ মহাধ্বনি নিজেকে প্রকাশিত কত্তে চাচ্ছে, তার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে প্রতীক্ষা করা হ'ল তোমার সাধনা। সেই ধ্বনিতে অনুভূতি আসার সঙ্গে সঙ্গে নিজের সম্পূর্ণ সত্তাকে সেই মহাধ্বনির সাথে অভেদ ব'লে তার কাছেই নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ ক'রে দেওয়া হচ্ছে তোমার আত্মমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করা।

স্থূল নাদ-সাধন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নাদসাধনের স্থূল রূপও একটা আছে। যথা কীর্ত্তন, স্তোত্রপাঠ। কীর্ত্তনাদির প্রথম উপযোগিতা এই যে, এতে মনে ঈশ্বর-সাধনে রুচি জন্মে। যার রুচি জ'ন্মে গেছে, তার পক্ষে কীর্ত্তন আর শাস্ত্র-পাঠ নিয়ে কাল কাটান আর সময় নষ্ট করা এক কথা। তার পক্ষে নিজ সাধনেই ডুবে যাওয়া উচিত। অর্থাৎ নামের নিভৃত সাধনায় তার নিমজ্জিত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু বাইরে তুমি যখন উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন কচ্ছ, তখন সেই কীর্ত্তনের পদাবলির প্রতি তাকিয়ে নয়, কীর্ত্তনের প্রেমহুঙ্কারগুলির মাঝ থেকে আমার পরম-প্রেমমধুর চিরদয়িতের অতি সুমধুর নামের ধ্বনি যে ফুটে ফুটে উঠ্‌ছে,

তার দিকে তাকিয়ে আমি নাদ-সাধন কত্তে পারি। যখন উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত ধ্বনিকে সহায় ক'রে আমি নিজের প্রাণের নিভৃত দেশে ভগবানের অমৃতময় নামকে অন্বেষণ করি, তখন আমি স্থূল নাদসাধক।

কোন্ কীর্ত্তন ধ্যানাবেশের উপযোগী

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু কীর্ত্তন মাত্রেই ধ্যানাবেশের উপযোগী নয়। রচনা-বন্ধনের ভাষা-চাপল্য অনেক কীর্ত্তনকে ধ্যানাবেশের বিরোধী করে। অতি উচ্চৈঃস্বরে অনুষ্ঠিত কীর্ত্তন অনেক সময়ে ধ্যানাবেশের বিরোধী। ভাষায়, রচনায়, ভাবে যা অনবদ্য, সুরে, মৃদুতায়, কোমলতায় যা হৃদয়গ্রাহী, সেই কীর্ত্তন সহজে ধ্যানাবেশের সহায়তা করে।

অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনের সুফল

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—উচ্চ-কীর্ত্তনে, কোলাহলময় কীর্ত্তনে, ধ্যানাবেশ না হ'য়ে শারীরিক ক্লান্তি ও অবসাদ আসাই অধিকতর স্বাভাবিক। শরীর যাতে ক্লান্ত হয় বা অবসন্ন হয়, তাকে ধ্যানাবেশের বিরোধী ব'লে মনে কত্তে হবে। কিন্তু একটীমাত্র নাম বা মন্ত্র বহু লোকে মিলে অহোরাত্র কীর্ত্তন করার একটা বিশেষ উপযোগিতা আছে। উচ্চ কীর্ত্তন ক্ষিপ্ত মনকে ক্রমশঃ নামের পথে আনে এবং একদিন অহোরাত্র যে নামটী কীর্ত্তিত হ'য়েছে, তার ধ্বনিকে কয়েকদিন পর্য্যন্ত অবিশ্রাম মনের ভিতরে জাগিয়ে রাখে। এইটী হ'ল তোমার দিকের লাভ। সর্ব্বসাধারণের দিকের লাভ এই যে, এই কীর্ত্তনের ফলে অপ্রেমিক শ্রোতা, অনিচ্ছুক শ্রোতা, পথচারী ব্যক্তি বা প্রতিবেশী, সকলে বাধ্য হ'য়ে হরিনাম শোনে এবং শুন্‌তে শুন্‌তে প্রেমিক হয়।

স্ত্রীর প্রধানতম কর্ত্তব্য

সন্ধ্যার পরে একটী তরুণী সধবা শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্ম-দর্শনে আসিলেন। বিবাহের পর হইতেই ইহার স্বামী বিপথচারী হওয়াতে ইনি অত্যন্ত মনঃক্লেশে কাটাইতেছিলেন; তখন ইহার মাতা ইহাকে শ্রীশ্রীবাবার নিকটে নিয়া আসেন এবং স্বামি কর্ত্তৃক অনাদৃতা এই মেয়েটীকে জীবনের একটা অবলম্বন প্রদান করিতে প্রার্থনা জানান। তখন শ্রীশ্রীবাবা মেয়েটীকে দীক্ষা দিয়াছিলেন।

নিজেকে কুমারী জ্ঞান করিয়া যুবতীটী একনিষ্ঠভাবে গুরুদত্ত নামের এতদিন সাধন করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি স্বামীর সুমতি হইয়াছে, স্ত্রীকে গৃহে নিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সব শুনে সুখী হ'লাম। যাও মা, স্বামীর ঘর কর, স্বামীকে ধর্ম্মপথে টেনে আন, স্বামীকে মানুষ হবার সাহায্য কর। ভগবানের যে পবিত্র নাম এতকাল জপেছ, তোমার স্পর্শের সাথে তার প্রভাব তোমার স্বামীতে বিতরণ কর। এইটীই হচ্ছে স্ত্রীর প্রধানতম কর্ত্তব্য।

পতি-পরিত্যক্তার পুনঃ পতিসোহাগে দ্বিধা

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—এ সংবাদে তোমার মা-বাবার প্রাণে আনন্দের সীমা নেই, কিন্তু তোমার মনে যে দুই দিক্ দিয়ে দুইটী দ্বিধা খোঁচাচ্ছে, তা আমি বুঝ্তে পারি। বিয়ে হবার পরেও নিজেকে কুমারী ব'লে জ্ঞান কত্তে অভ্যাস তুমি করেছ, আজ তোমার পক্ষে স্বামি-গৃহবাসের জৈব দিক্‌টা অত্যন্ত অরুচিপ্রদ। আবার চির-কৌমার্য্যের ব্রত নিয়ে তুমি বিবাহের আগে থেকেই আত্মগঠন কর্ব্বার চেষ্টা কখনো করনি, দশজন মেয়ে মানুষের মত সাধারণ চোখেই বিবাহটাকে তুমি দেখেছিলে এবং লোলুপ দৃষ্টিতেই তুমি স্বামি-গৃহের পানে তাকিয়ে ছুটেছিলে। মধ্যপথে অপ্রত্যাশিত নিদারুণ বাধা পেয়ে বিপদের দিনে ভগবানের কথা তোমার মনে পড়্ল, তুমি ভগবানকেই প্রাণের প্রাণ জ্ঞান ক'রে নিজেকে কুমারীর ন্যায় জ্ঞান কত্তে লাগ্লে। আজ তোমার সেই পূর্ব্বেকার প্রার্থনার বস্তু সহজলভ্য হ'য়ে তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে। যে স্বামী তোমার মুখপানে তাকায়নি, সে আজ তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হ'য়েছে, এ আকর্ষণও তোমার পক্ষে উপেক্ষার নয়। এই দুই দ্বিধা তোমাকে যুগপৎ পীড়িত কচ্ছে। আমি তা বুঝ্তে পারি।

স্বামিগৃহে রমণীর ভগবানের কাজ

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু মা, সব দ্বিধায় বিসর্জ্জন দিয়ে হাসিমুখে স্বামীর ঘরে যাও। তোমার পক্ষে স্বামিগৃহই প্রকৃষ্টতম কর্ম্মক্ষেত্র। ওখানে ব'সেই তোমাকে এবং তোমার মত আরও শত শত মেয়েকে নিজ

নিজ তপস্যার উদ্‌যাপন কত্তে হবে। স্বামীর সঙ্গ থেকে পৃথক্ ক'রে রেখে ভগবান যে-সব মেয়েদের দ্বারা তাঁর কাজ করিয়ে নেন, তাদের জন্য আবার পৃথক্ ঘটনানিচয় সৃষ্টি করেন। তোমাকে তিনি সাময়িকভাবে স্বামীর কাছ থেকে দূরে রেখে তোমার প্রাণের ভাণ্ডার পবিত্রতায় পূর্ণ ক'রে নিতে চেয়েছিলেন, যেন পরে তুমি স্বামীর সঙ্গে মেতে একেবারে ভগবানকে ভুলে না যাও। স্বামীর সাহচর্য্যের সাথে সাথে ভগবৎ-সাধনার তোমার প্রয়োজন আছে ব'লেই তোমার বিবাহের বিধানটুকু তিনি ক'রেছিলেন, আবার আজ তোমাকে সাদরে স্বামিগৃহে গৃহীতা হবার বন্দোবস্তও তিনি ক'রে দিলেন। জীবন-নাট্যের যে অঙ্কেই অভিনয় কর, সমগ্র নাটকখানা মা তাঁরই রচনা।

স্বামিগৃহে সুখী হইবার উপায়

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আজ তোমাকে সেই কয়েকটা কথা ব'লে দিব, যে সব কথা এতদিন তোমাকে কখনো বলিনি, বল্‌বার প্রয়োজনও অনুভব করিনি। স্বামিগৃহে গিয়ে সুখী হ'তে হয় কি ক'রে, তা আমি বল্‌ব। এতদিন কথায় আর পত্রে আমি তোমাকে গার্হস্থ্য সুখের কণামাত্র ইঙ্গিত প্রদান করিনি। তোমার অন্তরে আমি প্রাণপণে ত্যাগের বহ্নি জ্বালিয়েছি। নইলে পতি-বিরহের জ্বালা তোমার অসহনীয় হ'ত। কিন্তু আজ তুমি যাচ্ছ স্বামীর ঘর কত্তে, আজ তোমাকে গৃহস্থের মত কয়েকটা কথা বল্‌ব। আমি যদি সন্ন্যাসী না হ'য়ে গৃহী হ'তাম, আমার যদি ঔরসজাত কন্যা থাকৃত, তবে তাকে যে উপদেশগুলি দিতে হ'ত, আমি আমার ধর্ম্মকন্যাকে সেই উপদেশগুলি দিতে চাই। গৃহি-জীবনের প্রায় কোনও অংশই আমার অভিজ্ঞতায় নেই, কিন্তু নিজ কন্যার কল্যাণ অনভিজ্ঞ পিতাও বুঝ্‌তে পারে। আমার প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, স্বামীর সাথে এমন ভাবে চল্‌বে, যেন প্রতি পদে তার শ্রদ্ধা আকর্ষণ কত্তে পার। তোমার মনে, চরিত্রে, বা ব্যবহারে যেন কোথাও কোনও দুর্ব্বলতা না দেখা যায়। যে স্বামী নিজে পশুর মত ভোগ-লোলুপ, সেও নিজ স্ত্রীতে সম্ভ্রম ও শালীনতা পছন্দ করে। নিজের ভিতরে সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রদ্ধা পাবার যোগ্যতাকে রক্ষণ, বর্দ্ধন ও পোষণ কর। কোনও প্রকার অপ্রীতি

সৃষ্টি না ক'রে যতদিক্ দিয়ে পার নিজের মাধুর্য্যকে নিজের সৌন্দর্য্যকে শুদ্ধতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত কত্তে চেষ্টা কর। শ্রদ্ধার পাত্রকে লোকে সহজে ভালবাস্‌তে পারে। পদে পদে যার চরিত্রে নীচতা আর দুর্ব্বলতা, তাকে ভাল না বেসে স্বামীরা বরং কৃপার পাত্রী ব'লে মনে ক'রে থাকে।

ময়মনসিংহ
১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

দাসত্ব মধুময় হয় না

অপরাহ্নে ব্রহ্মপুত্র-তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে সমাগত উপদেশার্থীদিগকে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দেখ হে, চিরতা যেমন কোথাও মিষ্টি হয় না, দাসত্ব তেমন কুত্রাপি মধুময় হয় না। আবার কেমন মজা, দাসত্ব দুর্ব্বলকে কখনও পরিত্যাগ করে না। প্রতিভার কথা বল্‌বে? দীর্ঘকালের দাসত্ব সুতীক্ষ্ণ প্রতিভাকেও ম্লান করে।

ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব ও ভগবানের দাসত্ব

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—ইন্দ্রিয়ের দাসত্বই কদর্য্যতম দাসত্ব। আর, ভগবানের দাসত্বই যথার্থ প্রভুত্ব। ভগবৎ-সাধন আসক্তির বন্ধনকে অজ্ঞাতসারে শিথিল ক'রে দেয়। এজন্যই ভগবৎ-সাধন মৃত্যুর ভীষণতাকে নাশ করে।

মৃত্যুভয়ের কারণ

একজন যুবক প্রশ্ন করিলেন,—মৃত্যুভয়ের কারণ কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মৃত্যুভয়ের প্রথম কারণ হচ্ছে, প্রিয় বস্তু থেকে বিয়োগের আশঙ্কা, দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, ম'রে গেলে যে কি অবস্থাটা হবে, তা না-জানা-জনিত অনিশ্চয়তা।

মৃত্যুভয় নিবারণের উপায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধ্যান জমাও, ভগবানই তোমার প্রিয়তম বস্তু। যা' কিছু প্রিয়-বস্তু জগতে তোমার আছে, সবই ভগবানের ভিতরে রয়েছে। ধ্যান জমাও, ভগবানই জীবন, ভগবানই মৃত্যু, তাঁকে পাওয়ার জন্যই তোমার জীবন, মৃত্যুতেও তুমি তাঁকেই পাবে। দেখ্‌বে, মৃত্যুভয় আপনি পালিয়ে যাবে।

১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা ময়মনসিংহ হইতে চাঁদপুর যাইতেছেন। মধ্যাহ্নের পরে শ্রীশ্রীবাবা নারায়ণগঞ্জ ষ্টীমারে উঠিলেন এবং অবসর পাইয়া স্তূপীকৃত পত্রাদির উত্তর ষ্টীমারে বসিয়া লিখিতে লাগিলেন।

প্রতিকূল প্রতিবেশের প্রভাব অস্বীকার কর

হাওড়া জেলান্তর্গত জগৎবল্লভপুর নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রোত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"জনমত বা গণমন তোমার উপরে তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে চাহিবে, ইহা একান্তই স্বাভাবিক। চতুর্দ্দিকের চারিত্রিক প্রভাব তোমাকে নত করিতে চাহিবে, ইহা অতীব সুসম্ভব। সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে এই প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া চলা অতীব কঠিন। কিন্তু নিজেকে সাধারণ বলিয়া ভাবিতে যাইবে কেন? প্রত্যেক যুগের এক একটা বিশেষত্ব প্রায়শঃই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেই যুগে যত লোকের জন্ম ঘটে, প্রায় সকলেই সেই সকল নির্দ্দিষ্ট বিশেষত্বের চিহ্ন নিজ নিজ চরিত্রের মধ্যে স্বীকার করিয়া লয়। ইহা মানব-সমাজের প্রায় স্বভাবধর্ম্ম। কিন্তু যাহা সাধারণ মানবের পক্ষে স্বভাবধর্ম্ম, অসাধারণ ব্যক্তি তাহাকে সম্পূর্ণ উল্লঙ্ঘন করিয়া ভাবী যুগ ও ভাবী সমাজের অভ্রান্নত আদর্শকে নিজের চরিত্র-মধ্যে প্রস্ফুটিত করিয়া থাকেন। তুমি নিজেকে সেই অসাধারণ ব্যক্তিটী বলিয়া বিশ্বাস করিবার শক্তি অর্জ্জন কর। গড্ডলিকা-প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়া নিজের উপরে সমাজের বা পরিবেষ্টনের বা যুগের অপচিহ্নগুলি অঙ্কিত হইতে কেন তুমি দিবে? যে সবল মেরুদণ্ড থাকিলে, যে বিপুল সৎসাহসের অধিকারী হইলে মানুষ সমগ্র জগতের সম্মতির মুখেও বজ্রকণ্ঠে 'না' কথাটী উচ্চারণ করিতে পারে, সেই মেরুদণ্ডের সেই সৎসাহসের পরিচয় দিতে প্রয়াসী হও। বর্ত্তমান যুগ যদি পঙ্কিল হইয়া থাকে, তবে যুগের উর্দ্ধে থাক। বর্ত্তমান সমাজ যদি দূষিত হইয়া থাকে, তবে এই সমাজের অনিষ্টকারিণী শক্তির নাগালের সম্পূর্ণ বাহিরে নিজেকে রাখিতে সমর্থ হইয়া

কৃতিত্বের পরিচয় দাও। অনুকূল প্রতিবেশ জগতের বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে গড়িয়াছে, আবার জগতের বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি প্রতিকূল প্রতিবেশকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া বিপুল বিঘ্নের ভিতর দিয়াই নিজেদের অলোকসামান্য জীবনের জ্বলন্ত আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইহা স্মরণে রাখ।”

চরিত্র-রক্ষণ ও চরিত্র-সংস্কার

চব্বিশ-পরগণা জেলান্তর্গত মহেশতলা নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

“চরিত্র সম্পর্কে দুইটী ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। একদল বলিয়া থাকেন, চরিত্র-ধন অমূল্য রতন, একবার যদি ইহা নষ্ট হয়, তবে চিরতরে সবই গেল। এক খানা সাদা কাগজে এক দোয়াত কালি ঢালিয়া দিলে তারপরে যেমন বহু সাবান-জলের পরিমার্জ্জনেও সে আর আগের মত সাদা হয় না, নির্ম্মল নিষ্কলুষ চরিত্র একবার কলঙ্কিত হইলে আর তাহা তেমন নির্ম্মল হইতে পারে না। অপর দল বলিয়া থাকেন যে, বৃক্ষের যেমন রুগ্ন একটী শাখা কাটিয়া দিলে অন্য দিক্ দিয়া সে চেষ্টা করিয়া নবতর শাখা-প্রশাখার উদ্গম করিয়া অতীতের ক্ষয়ক্ষতি ও অভাবের পূরণ করিতে পারে, মানবেরও চরিত্র কোনও অংশে একবার কোনও কারণে দোষদুষ্ট হইলে, মূল প্রাণশক্তির যদি অভাব না ঘটে, তাহা হইলে, তাহার পূরণ সাধন করিয়া বিশুদ্ধি সম্পাদন করিতে পারে।

“এই উভয়বিধ মতামতেই যথেষ্ট শ্রদ্ধেয় তত্ত্ব রহিয়াছে, জানিও। যাহার চরিত্র-রূপ পুণ্য-কলেবর কুসঙ্গরূপ বিষ-ভুজঙ্গের দংশনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, তাহার পক্ষে এইরূপ সুতীক্ষ্ণ সাবধানতা, কঠোর সতর্কতা এবং সশঙ্ক বিশ্বাস নিয়াই চলা একান্ত প্রয়োজন, যেন এই বিষধরে একবার দংশন করিলে জগতের কোনও ওঝা বা বৈদ্যের চিকিৎসাতেই আর পরিত্রাণের উপায় নাই। রোগে ধরিলে ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ আনিয়া সেবন করতঃ রোগমুক্ত হইব, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কি অনেকে কুপথ্য ও কদাচার করে না? তাহার ফল এই হয় যে, অনেক সময়ে রোগ এমন ভয়ঙ্কর, দারুণ

ও অচিকিৎস্য পরিণতি প্রাপ্ত হয় যে, এম,-বি, এম,-ডি'র গোষ্ঠী বাটিয়া খাওয়াইলেও আর রোগ-নিরাময় হয় না। এই জন্যই দৈবক্রমে যাহার চরিত্র-সম্পদে ভাঙ্গন ধরে নাই, যাহার জীবনরূপ বাঁশের ঝাড়ে ঘুণ প্রবেশ করে নাই, তাহার অন্তরে এইরূপ আতঙ্কই পোষণ করা একান্ত হিতকর যে, এ জিনিষ একবার গেলে আর ত' ফিরিয়া পাইব না। ইহাতে কুসঙ্গ বর্জ্জনের উদ্যম বাড়িয়া যাইবে, পাপ এবং কলুষ-কালিমা হইতে দূরে থাকিবার প্রয়াস অনলস হইবে।

"কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যাহার চরিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এমন ব্যক্তিকে কি আশার রশ্মি দেখাইতে হইবে না? পাপপঙ্কে ডুবিয়া যাইয়াও যেমন করিয়া কত মানুষ পুনরায় দেবশ্লাঘ্য পবিত্র জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, জগতের কত তস্কর, কত দস্যু, কত মদ্যপ, কত লম্পট অমানুষ অধ্যবসায় প্রয়োগ করিয়া ভগবানের কৃপায় পরিশেষে লোকপূজ্য মহত্ত্ব অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কি তাহাকে উজ্জীবিত, উদ্বোধিত, উদ্দীপিত করিতে হইবে না? চরিত্রকে অক্ষত রাখিবার ব্যবস্থা সচ্চরিত্রের যেমন আবশ্যক, ভাগ্যক্রমে যে নিজ চরিত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারও চরিত্র-সংস্কারের সুব্যবস্থা তেমন আবশ্যক।"

অভাব-বোধ, প্রার্থনা ও প্রার্থনানুযায়ী জীবন-যাপন

খুলনা জেলান্তর্গত মহেশ্বরপাশা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"সুস্থির মনে বিচার করিয়া দেখ, তোমার প্রকৃত প্রয়োজন কি কি? বুঝিবার চেষ্টা কর যে, কি না হইলে তোমার জীবনের পূর্ণতা হয় না, কি না পাইলে মানুষের দেহ পাইয়াও তুমি মানুষ নহ, কিসের অভাব ঘটিলে মনুষ্য-সমাজে বাস করিয়াও তুমি মানুষ নামের যোগ্য নহ। বিচার করিয়া দেখ যে, ভগবদ্দত্ত গুণাবলির ভিতরে কোন্‌গুলির বিকাশ ঘটিলে তোমার জীবনের পূর্ণতা-সাধন সহজতর হয়। মনের সকল সন্তাপ, সকল পরিতাপ, সকল হতাশা, সকল নিরাশা ভুলিয়া গিয়া সরল সহজ অনাবিল মনে এভাবে

প্রত্যহ নিজের অন্তরে অবগাহন করিয়া নিজের প্রকৃত অভাব বুঝিবার চেষ্টা কর এবং মাত্র সেই অভাবগুলি দূর করিবার জন্য ভগবানের নিকটে প্রার্থনা জানাও। কি তোমার প্রয়োজন আর কি তোমার অপ্রয়োজনীয়, তাহা না জানিয়া, না বুঝিয়া একধার হইতে অভাবের তালিকা তাঁহাকে জানাইয়া তোমার কি লাভ হইবে? বাজারে হাজার রকমের জিনিষ থাকে, কিন্তু গ্রাহকের কি সকল জিনিষই প্রয়োজন হয়, না, সকল জিনিষ কিনিয়া কেহ ঘরে আনিতে পারে? কতগুলি জিনিষ মাত্র প্রয়োজন হয় এবং মাত্র সেই কয়টীই লোকে কিনিয়া আনিতে প্রয়াস পায়। নিজের প্রকৃত অভাব বুঝিয়া যখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, তখন সে প্রার্থনা সহজে পূর্ণও হইবে, আর, সেই প্রর্থনায় মনেরও বল বাড়িবে হৃদয়েরও উৎকর্ষ-বিধান হইবে। 'চাই' 'চাই' রবে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিতে পারিলেই তাহাকে প্রার্থনা বলে না। প্রকৃতই কিসের প্রয়োজন, তাহা সঠিকভাবে বুঝিতে পারাই প্রার্থনার প্রথম ও প্রধান কথা। নিজের অভাব যদি সত্য করিয়া নিজে বুঝিতে পার, তাহা হইলে মুখ ফুটিয়া ভগবানকে তাহা পূরণ করিতে কাতর মিনতি না জানাইলেও উহা প্রার্থনা বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। সুতরাং সে অভাব সেই দয়ার-সাগর অপার দয়ায় আস্তে আস্তে দূর করিয়া দেন। তোমার প্রকৃতই কিসের অভাব, তাহা সম্যক্ বুঝিয়া যদি প্রার্থনা কর, তাহা হইলে সেই প্রার্থনার অনুযায়ী ভাবে জীবনকে পরিচালনও তোমার পক্ষে সহজ হইবে। অনেকেই ত' ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে,—'হে প্রভো জ্ঞান দাও, বল দাও' কিন্তু যে ভাবে চলিলে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, বলের বিকাশ ঘটে, সেভাবে চলে না। তাহার কারণ কি ইহাই নহে যে, জ্ঞানের যে প্রকৃতই প্রয়োজন আছে, বলের যে প্রকৃতই অভাব রহিয়াছে, এ কথা সম্যক্ উপলব্ধি না করিয়াই তোতাপাখীর মুখস্থ বুলি মাত্র বলা হইয়াছে? অনেক ধার্ম্মিক পরিবারেই ভগবানের নিকটে প্রার্থনা-করা-রূপ অনুষ্ঠানটীকে সদাচার রূপে পরিগৃহীত হইতে দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃত প্রয়োজন-বোধের সহিত এই সকল প্রার্থনার সহযোগ না থাকার দরুণ প্রার্থনানুযায়ী জীবন যাপন করিবার প্রবল

যত্ন বা আবেগময়ী প্রবৃত্তি এই সকল প্রার্থনাকারীদের মধ্যে দেখা যায় না। প্রার্থনাই যদি করিলে, প্রার্থনার অনুযায়ী জীবন-যাত্রা পরিচালনের চেষ্টাও তোমাকে করিতে হইবে।"

কর্ত্তব্যের লঘুত্ব ও গুরুত্ব বিচার

মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত আজিমগঞ্জ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"যখন অন্য কোনও প্রকার কর্ত্তব্যের চাপ থাকিবে না, সেই সময়ে বসিয়া তুমি ভগবানের নাম জপ করিবে বলিয়া লিখিয়াছ। কিন্তু বাছা, মানব-জীবনে এমন মুহূর্ত্ত কোথায়, যেই মুহূর্ত্তটীর উপরে কোনও না কোনও কর্ত্তব্যের দাবী না রহিয়াছে? চতুর্দ্দিকের শত সহস্র প্রকারের কর্ত্তব্য গুরুগম্ভীর নাদে নিজ নিজ অধিকার জানাইয়া তোমার প্রত্যেকটী মুহূর্ত্তকে পাইবার জন্য প্রয়াসী। মানব-জীবনের কর্ত্তব্যের সংখ্যা এত অধিক এবং তাহাদের বৈচিত্র্য এইরূপ অপরিসীম যে নিজের জীবনের লক্ষ্যের দিকে তাকাইয়া ইহাদের মধ্যে ছোট-বড়'র বিচার অতি দ্রুত সারিয়া ফেলিতে হইবে এবং কোনওটীকে মুখ্য করিয়া অপরগুলিকে গৌণরূপে নিজ নিজ স্থান বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। ইহা যাহারা না পারে, তাহারা অনেক সময়ে অতি ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যে জীবন নিঃশেষিত করিয়া দিয়া সর্ব্ববৃহৎ কর্ত্তব্যকে অপালনের দ্বারা অসম্মান করে। কর্ত্তব্যবুদ্ধি যে এই সকল লোকের কম আছে, তাহা নহে। বরং জগতের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের অপেক্ষাও এই সকল লোকের কর্ত্তব্যজ্ঞান প্রখরতর। এই প্রখরতার দরুণই তাহারা আগন্তুক অতি ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যের পশ্চাতেও দীর্ঘ সময় ও কঠোর শ্রম প্রদান করিয়া ফেলে। কিছুকাল সর্ব্বকর্ত্তব্যে সম্পূর্ণ বিরত রহিয়া ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-পালন-ব্যাপারে একটা সুশৃঙ্খল পারম্পর্য্যে আসিতে গেলে যদি ইতিমধ্যে কোনও ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যে ত্রুটী ঘটিয়া যায়, ইহাই ইহাদের বিশেষ উদ্বেগের কারণ হইয়া থাকে। ফলে কি হয়, তাহা জান? হুড়মুড় করিয়া রেলগাড়ীতে উঠিতে গিয়া যেমন অনেকে ঠিক্ পাশেই একখানা খালি গাড়ী থাকিতেও মালপত্র সহ একটা যাত্রীতে-জাম্-করা

গাড়ীতে উঠিয়া সারাপথ দাঁড়াইয়া যায়, ঠিক্ তেমনি তাড়াহুড়া করিয়া আগন্তুক কর্ত্তব্য সমাধা করিতে যাইয়া শেষ পর্য্যন্ত বহু অসুবিধার মধ্য দিয়া অতি শ্রমের মধ্য দিয়া অল্পমাত্র কর্ত্তব্য সমাধা করতঃ মনকে যে কোনও একটা বৃথা স্তোক-ভাষণে সান্ত্বনা যোগাইতে হয়। জীবনের কর্ত্তব্য বুঝিয়া লইয়া যাহারা কাজে হাত দেয়, তাহারা কর্ত্তব্যপুঞ্জের মধ্যে লঘু-গুরু-ভেদে উচ্চনীচ স্থান নির্ণয় করিয়া কাজ করিতে পারে। ফলে, গুরুত্বেও বৃহৎ পরিমাণেও বৃহৎ কার্য্যসমূহ অল্প সময়ে সম্পাদন করিয়া যাইতে সমর্থ হয়। এই কথা স্মরণে রাখিয়া তুমি অন্য কর্ত্তব্যে উপেক্ষা করিয়া নামজপে অভিনিবিষ্ট হও। তোমার যাহা জীবন-লক্ষ্য বলিয়া বর্ণনা করিতেছ, তাহাতে সকল কর্ত্তব্য অপেক্ষা এই কর্ত্তব্যই বড়। বড় কর্ত্তব্যের জন্য ছোট কর্ত্তব্যকে উপেক্ষা করা যায়।"

অজপা-সাধন

ত্রিপুরা জেলান্তর্গত চান্দলা-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"শ্বাস এবং প্রশ্বাস মনঃসংযমের এক অতি দুরন্ত বিঘ্ন। কিন্তু এই বিঘ্নের মাঝ হইতেও সাধনের আনুকূল্য আদায় করা সম্ভব হইয়াছে। শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম জপ করিতে করিতে যোগীরা বিনা চেষ্টায় শ্বাস-প্রশ্বাসকে ধীরগামী ও স্বাভাবিক ভাবে রুদ্ধগতি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। শরীরকে কোনও প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় না ফেলিয়া, কোনও প্রকার রোগের উৎপত্তি না ঘটাইয়া, মনের উপরে কোনও আকস্মিক উৎপাত সৃষ্টি না করিয়া আপনা আপনি প্রাণবায়ুকে নিরুদ্ধ এবং মনের চঞ্চল তরঙ্গ সমূহকে স্থির ও চিত্ত-সংস্কারের অবিলতাকে দর্পণবৎ স্বচ্ছ করিতে এই উপায়েই যোগীরা সফলকাম হইয়াছেন। যে শ্বাস-প্রশ্বাস সাধকের একাগ্রতার পরম শত্রু, শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম জপিতে থাকিলে তাহারাই আবার একাগ্রতার সহায় হয়। ইহা যোগিরাজ পূর্ব্বাচার্য্য গণের এক অত্যদ্ভুত আবিষ্কার। তাঁহাদের এই পরমাশ্চর্য্য আবিষ্কারকে তাঁহারা অজপা-সাধন এই যোগরূঢ় সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। তোমার আর চেষ্টা করিয়া মালা সাধিতে হইল না, কর ফিরাইতে হইল না, যাহা হইবার

শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বভাব-ধর্ম্মেই হইতে থাকিল, এই জন্যই ইহার নাম অজপা-সাধন। যে সাধনায় নিজের চেষ্টায় জপ করিতে হয় না, আপনা-আপনি অবিরাম অবিশ্রাম নামজপের স্রোত বহিতে থাকে, তাহাই অজপা-সাধন।"

অনাহত নাদ সাধন

ঐ পত্রেই শ্রীশ্রীবাবা আরও লিখিলেন,—"কিন্তু অজপা-সাধন সাধনই মাত্র, সিদ্ধি নহে। It is a means to an end,—উচ্চতর লক্ষ্য লাভের জন্য ইহা একটী উৎকৃষ্ট সোপান মাত্র। পরমাত্মার অমৃতময় অখণ্ড নাম অবিরাম জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, বৃক্ষে, গুল্মে, লতায়, পথে, ঘাটে, প্রান্তরে, কূপে, তড়াগে, নদীতে, ভূধরে, কন্দরে, সাগরে সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছে। তোমার দেহ-মধ্যে, তোমার দেহের বাহিরে, তোমার শরীরের প্রতি মর্ম্মগ্রন্থিতে, চক্রে চক্রে অনুক্ষণ সেই নাদ স্ফুরিত হইতেছে। কাণ পাতিয়া উহা শ্রবণই মানবের পরম-সাধনা। উহাই যমুনা পুলিনের মোহন বাঁশরী, কুরু-রণাঙ্গণের অভয় পাঞ্চজন্য, প্রলয়কালীন মহাশিবের বিশাল-নির্ঘোষ, দেবর্ষি নারদের বীণার ঝঙ্কার, ব্রহ্মামুখোচ্চারিত মহাসৃষ্টির প্রথম প্রণব। শ্বাসের বিকার থামিলে সেই মহানাদে মন সহজে বসে। এই কারণেই অজপা-সাধনের এত সম্মান।"

স্ব স্ব সমাজের উন্নতিতে সমগ্র দেশের উন্নতি

ষ্টীমারে চাঁদপুর-পুরাণবাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরমোহন ঘোষের সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিল। শ্রীযুক্ত ঘোষ জানাইলেন যে, তিনি এবং তাঁহার বন্ধুরা যাদব-সমাজের উন্নতি-সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবা আহ্লাদ প্রকাশ করিতে করিতে বলিলেন,—সমাজ-সেবার তুইটী পথ। একটী হচ্ছে, দেশের ভিতরে যত সমাজ, যত গণ্ডী, যত সম্প্রদায় আছে, তাদের সবাইকে একযোগে আঁকড়ে ধ'রে, তার সেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া। অপরটী হচ্ছে, যে সমাজের বা সম্প্রদায়ের ভিতরে সেবকের নিজের আবির্ভাব ঘটেছে, তার উন্নতিকেই প্রধান লক্ষ্য ব'লে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী প্রাণপণ ত্যাগ ও অধ্যবসায় স্বীকার করা। পরবর্ত্তী পন্থাটী পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকলের পক্ষেই সহজসাধ্য, কারণ জন্মের সংস্কারকে অতিক্রম না ক'রে ওঠা

পর্য্যন্ত প্রথম পথটীতে পাদচারণ সহজ নয়। তজ্জন্য প্রত্যেকেরই উচিত, প্রথমেই নিজ নিজ সমাজের হিতসাধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। প্রত্যেকটা সম্প্রদায় যদি নিজ নিজ হিত সাধনকেই লক্ষ্য ক'রে যথাসাধ্য ত্যাগ স্বীকার করে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে, তাহ'লে এর ফলে সমগ্র দেশেরই যুগপৎ সার্ব্বাঙ্গিক উন্নতি সাধিত হ'য়ে যায়।

স্বজাতি-প্রীতি ও পরজাতি-বিদ্বেষ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতি কত্তে গিয়ে যারা পর-সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ প্রচার বা ঈর্ষ্যা পোষণ করে, তারা দেশের বা জগতের কোনও সেবাই করে না, বরং ক্ষতিই করে। স্বজাতিতে প্রীতি প্রয়োজন, কিন্তু পরজাতির প্রতি বিদ্বেষ থাকা নিষ্প্রয়োজন।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের উৎপত্তি কোথায়

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—স্বজাতি-প্রীতি থেকে বিদ্বেষের উৎপত্তি হয় না। বিদ্বেষের জন্ম হয় স্বজাতি-প্রীতির ভাণ থেকে। যারা নিজের সমাজকে ভালবাসে কম, কিন্তু লোক-প্রতিষ্ঠার জন্যই হউক বা কোনও পার্থিব সুবিধার জন্যই হউক, কিম্বা সর্ব্বকার্য্যে কপটতার নিত্য-অভ্যাস থেকেই হউক, ভালবাসাটাকে একটু বেশী ক'রে প্রকাশ ক'রে দেখাতে চায়, তারাই প্রধানত অপর সম্প্রদায়ের প্রতি নিরর্থক বিদ্বেষ প্রচার করে এবং অকারণ ঈর্ষ্যা পোষণ করে।

ভাব-প্রবণতা ও ধীরবুদ্ধি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এজন্যই সমাজ-সেবার কাজে এমন লোকই চাই, ভাবপ্রবণতার যারা দাস নয়, ভাবপ্রবণতা যাদের দাস। রঙ্গীণ আশার মোহন স্বপ্ন দেখ্‌বার ক্ষমতা কর্ম্মীর চ'খে থাকা চাই, কিন্তু সেই স্বপ্নই তার চালক হবে না. স্বপ্নকে সে নিজে চালাবে, গড়্‌বে, ভাঙ্গ্‌বে, বদ্‌লাবে। অনুভূতির প্রবল ক্ষমতা চাই সত্য, কিন্তু প্রবল হৃদয়াবেগ কাউকে প্রবল চরিত্র প্রদান করে না, প্রবল চরিত্রই হৃদয়াবেগকে প্রবল সার্থকতা দিতে পারে। হৃদয়াবেগ অন্ধের মত চলে, আস্ফালন তার প্রচুর, কিন্তু অধঃপতন পদে পদে।

হৃদয় দেবে ত্যাগের শক্তি, প্রাণদানের ক্ষমতা, স্বার্থকে তুচ্ছ ক'রে পরার্থকে "প্রাণের বন্ধু" ব'লে আলিঙ্গন ক'রে ধরবার যোগ্যতা,—কিন্তু ধীর, স্থির, প্রশান্ত, অনুদ্বিগ্ন যে মস্তিষ্ক, সে দেবে দেখিয়ে যে এই অদ্ভুত আবেগ কোন্ পন্থায়, কোন কৌশলে পূর্ণ সার্থকতায় মণ্ডিত হবে। তবে হবে একজনের মঙ্গলে সকলের মঙ্গল, এক সমাজের কল্যাণে সকল সমাজের কল্যাণ।

সাধকের একনিষ্ঠার আবশ্যকতা

রাত্রি আট ঘটিকায় ষ্টীমার চাঁদপুর পৌঁছিল। শ্রীশ্রীবাবার একান্ত ভক্ত শ্রীযুক্ত মাখন লাল চক্রবর্ত্তী ষ্টেশনে শ্রীশ্রীবাবাকে নিবার জন্য আসিয়াছেন। কথায় কথায় তিনি বলিলেন যে, অযোধ্যার জনৈক বিখ্যাত মহাত্মা সম্প্রতি চাঁদপুরে আসিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত মাখন তাঁহার নিকট হইতে সাধন-ভজন সম্পর্কে উপদেশাদি গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গোস্বামী তুলসীদাস ব'লেছেন,—সকলের কাছে যাবে, সকলের কাছে বস্‌বে, সকলের কথা শুন্‌বে, সকলের মতেই সায় দেবে, কিন্তু নিজের মত পরিত্যাগ কর্ব্বে না। আবার, আচার্য্য রামানুজ ব'লেছেন,—অন্য দেবতার মন্দিরে যাবে না, অন্য দেবতার বিগ্রহ দেখ্‌বে না, অন্য দেবতার নাম শুন্‌বে না, অন্য দেবতার প্রসাদ নেবে না। এ দুটো কথা কি এক রকম ব'লে মনে হয় রে?

শ্রীযুক্ত মাখন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উচ্চহাস্য হাসিয়া বলিলেন,—এক কি ক'রে হবে? এ যে diametrically opposite (সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা)!

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—না, বিরুদ্ধ কথা নয়। কথা দুটো বল্‌বার ভঙ্গী আলাদা এবং কথা দুটো বলা হ'য়েছে দুই প্রকারের সাধককে। কিন্তু দুটো কথারই মর্ম্ম হচ্ছে, নিজের গৃহীত সাধনের প্রতি নিষ্ঠাহীন হয়ো না, এক কণা নিষ্ঠাহীনতাও যদি আসে, তবে তাও মার্জ্জনার যোগ্য নয়। দুজন আচার্য্যের উপদেশই এই দাঁড়াচ্ছে যে, নিজের পথে নিজের মতে অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস যেন কিছুতেই না জন্মাতে পারে, তার দিকে খেয়াল রাখো! বাবা গম্ভীর-নাথের একজন শিষ্য অন্য কোনও মহাপুরুষের কাছে খুব যাতায়াত কচ্ছিলেন।

গম্ভীরনাথ একদিন একথা শুনে তাঁকে বল্লেন,—উস্‌কা পাস্ তুমারা কুছ লেনা দেনা হ্যায় ?—ও'র কাছে কি তোমার কোনও দেনা পাওনা আছে ? শিষ্য গুরুর উপদেশের মর্ম্ম বুঝ্‌লেন এবং দশ জায়গায় যাওয়া বন্ধ কর্‌লেন। এ উপদেশেরও মর্ম্ম এই যে,—সাবধান, নানা মুনির নানা মতে প'ড়ে শেষটায় ধনেপ্রাণে মারা পড়ো না। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রশংসা শুনে একজন গেলেন তাঁকে দেখ্‌তে। সব কথা শুনেই ত ব্রহ্মচারী বাবা চোস্ত ভাষায় গালাগালি স্থরু কর্ল্লেন। ভক্তটী প্রাণ নিয়ে প্রস্থান কর্ল্ল। পরবর্ত্তী কোনও সময়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে এরূপ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বাবা লোকনাথ বল্লেন,—যে সব ভক্তেরা সকল সান্‌কীই চাট্‌তে চায়, তাদের ত' তাড়া করাই উচিত। অর্থাৎ, সাধকের পক্ষে একনিষ্ঠা অত্যন্ত আবশ্যকীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ও বারদীর ব্রহ্মচারীর কাছে গিয়েছিলেন এবং অরুচিপ্রদ কথা শুনে দুঃখিত চিত্তে ফিরে এসেছিলেন। অবশ্য, এই ঘটনা নিয়ে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির পরিপোষক অনেক কথা কোনো কোনো অসতর্ক গ্রন্থকার আলোচনা ক'রে লোকনাথকে নাগ-মশায়ের চেয়ে ছোট সাধু ব'লে প্রমাণ করার একটা ব্যর্থ চেষ্টা ক'রেছেন, যার উপরে আমি বিশেষ কোনো মূল্যই আরোপ করি না। কিন্তু এই ঘটনার পরেই নাগমহাশয়ের মনে হ'ল যে নানাস্থানে সাধু দেখ্‌তে যাবার প্রয়োজন নেই, এক পথে চল্‌তে পার্‌লেই জীবন ধন্য হবে। অর্থাৎ নাগমহাশয় একনিষ্ঠার মূল্য বুঝ্‌লেন।

মহাত্মা দর্শনের বিধি

শ্রীযুক্ত মাখন যেন লজ্জিত ও কুন্ঠিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীবাবা প্রসন্ন হাস্যে তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া বলিতে লাগিলেন,—আমি বলছি না যে, তুমি মহাত্মাদের কাছে যেও না। যাবে, শতবার যাবে, সহস্রবার যাবে, কিন্তু শতশত উপদেশ পাওয়া তোমার দরকার নয়, তোমার দরকার সাধন-রুচি বৃদ্ধি পাওয়ার। মহাপুরুষদের দেখ, আর যাঁর জন্য তাঁরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছেন, সেই ভগবানকে ভাবো। হট্টগোল কর্ব্বার জন্য নয়, লুচি-মণ্ডা প্রসাদ পাবার

জন্য নয়, পরন্তু মহাপুরুষকে দেখে তোমার যেন অন্তরে, মহতের যে মহৎ শ্রীভগবান্, তাঁর কথা অনুক্ষণ স্মরণে জাগে, তার জন্য যাও। কুম্ভ মেলায় লক্ষ সাধুর সমাবেশ হয়। সাধ্য হবে তোমার সকলের কাছ থেকে উপদেশ নেবার? দেখে নাও চ'খ ভ'রে তাঁদের প্রেমসুন্দর মূরতি, আর জাগিয়ে নাও প্রাণভরে তাঁদেরই মতন নিজের ভিতরে প্রেম। বাক্যালাপের হট্টগোলে যেও না। দেব-দ্বিজ-তীর্থ ও মহাত্মা দর্শনে যারা কথার বহর বাড়ায়, তারা নিজেদের ক্ষতি করে। সম্পদ বাড়াবে ভাবের, চর্চ্চা কর্ব্বে অন্তরের নিঃশব্দ শক্তির।

চাঁদপুর

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

সমাজের উপরে সতীত্বের প্রভাব

অদ্য প্রাতে চাঁদপুরের জনৈক জনহিতৈষী উকিল শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্ম দর্শন করিলেন। সমাজ ও পরিবার সম্বন্ধে নানা কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সমাজই বলুন আর পরিবারই বলুন, সব-কিছুর স্থায়িত্ব ও শান্তি নির্ভর কচ্ছে নারীর সতীত্বের উপরে। যে সমাজে নারীর সতীত্ব নাই, সেই সমাজে নিত্য নূতন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। যে পরিবারে নারীর সতীত্ব রক্ষায় যত্ন কম, সে পরিবারে নিত্য দ্রোহ, নিত্য কলহ হবেই হবে। এই জন্যই আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরা নারীর সতীত্বের উপরে এত জোর দিয়েছিলেন।

সতীত্ব-সম্পর্কিত আর্য্যসিদ্ধান্ত বহুশতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অবশ্য সতীত্ব সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত ধারণায় এসে পৌছুতে প্রাচীন ঋষিদেরও যথেষ্ট সময় লেগেছিল। একদিনেই তাঁরা এই মীমাংসায় এসে পৌছুতে পারেন নি। সম্পূর্ণ অবারিত উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার যুগ থেকে, একপতি-পরায়ণতার আদর্শ যুগে পৌছুতে তাদের কত লক্ষ বৎসর লেগেছিল, কেউ হিসাব ক'রে তা' বল্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু সতীত্বের প্রয়োজনীয়তার যে স্থির সিদ্ধান্ত, তা' শত সহস্র বর্ষেরই ত' অভিজ্ঞতার ফল।

অনুন্নত সমাজে সতীত্বের আদরের প্রয়োজন অনুভূত হয় না, উন্নত সমাজেই হয়। মানবের ভিতরের বহুপরায়ণ পশুর ভাবকে বহু শতাব্দীর সংশোধনের মধ্য দিয়েই একপরায়ণ সতীত্ব-মর্য্যাদায় এনে পৌঁছিয়েছে। অতএব, এত দিনের অভিজ্ঞতার ফলকে আর্টের খাতিরে, সাহিত্যিকতার দোহাই দিয়ে, কাব্য ফলাবার জন্যে বা পাশ্চাত্য জাতিদের সমকক্ষতার নাম ক'রে জলাঞ্জলি দেওয়া যায় না।

সতীত্বহীন সমাজে কলহ অধিক

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—আপনি ত' উকিল, কত রকমের মামলা-মোকদ্দমা চালাচ্ছেন, কত সংসারের কত কদর্য্য সংবাদ নথিভুক্ত ক'রে রাখ্‌ছেন। আপনিই একথা সকলের চেয়ে বেশী বুঝ্‌বেন যে, নারীর অসতীত্বকে অবলম্বন ক'রেই অধিকাংশ ফৌজদারী মামলার উদ্ভব। একটা পরিবারের মধ্যে একটী নারী অসতী হ'লে তা' থেকে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, পিতৃবিচ্ছেদ, পরিবার-বিচ্ছেদ উপস্থিত হয় এবং সেই ঘটনাকেই প্রচ্ছন্ন ক'রে রেখে অন্যভাবে অসংখ্য ফৌজদারী মামলার উৎপত্তি হয়। এগুলি সমাজের অতি কদর্য্য কাহিনী, কিন্তু সমাজ-ব্যাধির আলোচনার সময়ে এ সব অস্বীকার করার উপায় নেই। যে সমাজের ভিতরে নারীর সতীত্ব মর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য তীব্র, সে সমাজের ভিতরে ফৌজদারী মামলা কম। অবশ্য, শিক্ষা ও অশিক্ষার তারতম্য এর একটা প্রধান কারণ বটে, কিন্তু মনে রাখ্‌তে হবে যে, নারীর সতীত্ব-সম্ভ্রমের শিক্ষাটাই সকল শিক্ষার প্রধান শিক্ষা।

নারীর ন্যায় পুরুষেরও সতীত্বের আদর্শ গ্রহণীয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—অবশ্য এখন পর্য্যন্ত এক-তরফা সতীত্বই মাত্র প্রতিষ্ঠিত হবার অবকাশ পেয়েছে, নারী ও পুরুষ উভয়ের দিক থেকে একনিষ্ঠা যেন আদর্শ হিসাবেও ঠিক্ ঠিক্ দাঁড়াতে পারেনি। এখনও পুরুষ জাতি অনায়াসে বিবাহ ক'রে বা না ক'রে বহু-নারী-বল্লভ হয়, কিন্তু নারীর একপতি-পরায়ণতাকে আদর্শ ব'লে গণনা করা হচ্ছে। এর জন্য নারীদিগকেও বহুপরায়ণতার ছাড়পত্র প্রদান কত্তে হবে, তা নয়। পুরুষেরা লম্পট ব'লেই

নারীরাও লম্পট হবার অধিকার দাবী কর্ব্বে, এটা নারীজাতির উন্নতির পরিচায়ক নয়। বরঞ্চ নারীরা লাম্পট্যকে তাদের আদর্শের বাইরে অবহেলে ঠেলে রেখে দিয়েছে এবং দিতে পেরেছে ব'লেই পুরুষদের জীবনের আদর্শ থেকেও তাকে বিদায় ক'রে দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে। বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় ভারতীয় আর্য্য-সমাজ নারীর সতীত্বকে জগতের অশেষ কল্যাণকর ব্রত ব'লে স্বীকার করেছিলেন; কিন্তু তথাপি সমাজের শ্রেষ্ঠ উন্নতি লাভের বাকী ছিল। সেই বাকীটুকু আমাদের পূরণ কত্তে হবে, পুরুষের ভিতরেও একপরায়ণতার আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে।

ভারতীয় পরিবারে দাম্পত্য-সম্বন্ধের আদর্শ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভারতীয় পরিবারে সেই সঙ্কল্প প্রতিষ্ঠিত হোক্, যে সঙ্কল্পের বলে নারীও বল্‌বে,—"আমি বহুপুরুষে আসক্তা হব না", পুরুষও বল্‌বে, "আমি বহুরমণীতে প্রলুব্ধ হব না"। নিজ পতিতে বা নিজ পত্নীতে একনিষ্ঠ থাক্‌বার সঙ্গত বা অসঙ্গত বাধা যতই থাকুক না কেন, ভারতের নারী ও পুরুষ সমস্বরে একথাই বল্‌তে শিখুক, একথারই মর্য্যাদা রক্ষা কত্তে সমর্থ হোক, —"আমৃত্যু আমি একজনকে নিয়েই জীবন কাটাব, দুজনের দিকে তাকাব না।" স্বামীর ভোগ-পিপাসা সম্পূর্ণরূপে মিটাতে অসমর্থ হ'লেও স্বামী তার স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য রমণীতে দৃষ্টি দেবে না, স্ত্রীর ভোগলিপ্সার পূর্ণ তৃপ্তি দান কত্তে অসমর্থ হ'লেও স্ত্রী তার স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষের আকাঙ্ক্ষা কর্ব্বে না,— এই সামর্থ্যই ভারতীয় নরনারীর জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক্। অন্ধ হোক্, খঞ্জ হোক্, রুগ্ন হোক্, দুর্ব্বল হোক্, বন্ধ্যা বা ক্লীব হোক্, স্বামীর বা স্ত্রীর ভাগ্যে বিধাতা যে দুর্ভাগ্যই লিখে রে'খে থাকুন, একজন আর একজনকে কোনও অবস্থাতেই পরিত্যাগ কর্ব্বে না, কোনও অবস্থাতেই একের প্রতি অপরে অবিশ্বাসী বা অবিশ্বাসিনী হবে না। পিতা দুরারোগ্য রোগে রুগ্ন হ'লে কি পুত্র তার সঙ্গে সম্বন্ধচ্ছেদ কত্তে পারে? পিতার মৃত্যু ঘট্‌লে কি পুত্র অন্য ব্যক্তিকে নিজ পিতা ব'লে পরিচয় দেয়? স্বামী বা পত্নী রুগ্ন বা মৃত হ'লেই বা তার সঙ্গে সম্বন্ধচ্ছেদ কেন হবে? যে দেশে পাথা জালালেই পুত্র পিতার

সহিত পৃথক হ'য়ে যায়, পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবার প্রয়োজন হয় না, ধনী সম্পন্ন পুত্রের অর্থহীন বৃদ্ধ পিতা হয়ত অনাথালয়ে বা আতুরাশ্রমে গিয়ে জীবনের শেষ কয়টা দিন গুণ্‌তে বসে, যে দেশে বয়স্ক পুত্রের মাতা উপার্জ্জনশীল পুত্র জীবিত থাকৃতেও নিজের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্যই বৃদ্ধ বয়সে নূতন স্বামী গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর খুঁজে পায় না, সেই দেশের লোকদের দাম্পত্য-সম্বন্ধের অস্থিরতার উপরে ভিত্তি ক'রে কখনও ভারতীয় জীবনের দাম্পত্য সম্বন্ধ নির্ণয় করার চেষ্টা সঙ্গত হ'তে পারে না।

দাম্পত্য-জীবনেও ত্যাগের শক্তিকেই পূজা করিতে হইবে

সর্ব্বশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এ প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক যে, বিবাহের পরে যদি দেখা যায় যে, নরনারীর সম্বন্ধ একেবারে সহনের অতীত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তখন ত অন্য নারী বা অন্য পুরুষের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে উপায় নেই। এ প্রশ্ন খুব অসঙ্গত প্রশ্নও নয়। কিন্তু এ প্রশ্নের উদ্ভবই হয় তখন, যখন ত্যাগের শক্তি মানুষের ক'মে যায়, ভোগের লোভ অত্যন্ত বেড়ে যায়। এরূপ বিপদে ঠেকৃলে দুচারজন নরনারী কোন্ পন্থার আশ্রয় নেবে, আপদ্ধর্ম্ম হিসাবে তার একটা ব্যবস্থা থাকাও প্রয়োজন। কিন্তু একটা দেশ বা জাতির ত' তা কখনো আদর্শ হ'তে পারে না! ভোগের জন্যই যারা বিয়ে করে, ভোগে বাধা হ'লেও তারা আর বিবাহকে অস্বীকার কর্ব্বে না, এইটাই হবে উন্নত সমাজের লক্ষণ। যার কাছে যা পাওয়ার আশা ছিল, তার কাছে তা পাওয়া যায়নি ব'লেই যদি ত্যাগ কত্তে হয়, তবে পরে যাকে গ্রহণ কর্ব্বে, তার কাছেই যে সব আশা তোমার পূরণ হবে, তারই বা নিশ্চয়তা কি? অনেকের ত' শত বার শত জনের সঙ্গে জোড়াতালি দিয়েও মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না, হতাশাই শুধু চয়ন কত্তে হয়! সুতরাং এস্থলে নিজের সুখেচ্ছাকে ত্যাগ কর্ব্বার শক্তি অর্জ্জনই হবে প্রকৃত শান্তির পথ। যেখানে যে সুখ চেয়েছিলে, সেখানে তা' পাওয়া গেল না, বেশ, এ সুখের লোভ তোমার কমিয়ে নাও। দাম্পত্য-জীবনের সম্বন্ধকে বজায় রাখ্‌তে গিয়ে যে বেদনা তুমি পেয়েছ, জীবের সেবায়, জগতের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রে সেই

বেদনাকে ভুলে যাও। ব্যর্থতাহীন জীবন কি জগতে কোথাও আছে? কোনও না কোনও বিরাট দুঃখ চিত্তে বহন ক'রে বেড়াচ্ছেন জগতের প্রত্যেকে। দুঃখহীন মানব নাই, দুঃখহীনা মানবী নাই। প্রত্যেকের নিকটেই নিজ নিজ দুঃখ তুলনাতীত, সীমাহীন, অসহনীয়। সবাই দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা কচ্ছে, কিন্তু কেউ তা পে'রে উঠ্‌ছে না। একমাত্র দুঃখাতীত তিনি, যিনি ভোগকে অসত্য জেনে ত্যাগকে করেছেন লক্ষ্য, দুঃখকে অবশ্যম্ভাবী জেনে তাকে করেছেন বরণ।

অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত রাসবিহারী সরকারের নেতৃত্বে পুরাণ-বাজার—শ্রীরামদীর যুবকবৃন্দ শ্রীশ্রীবাবাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া নিবার জন্য আসিলেন। শ্রীযুক্ত হরমোহন ঘোষ যাদব-সভার প্রাঙ্গণে একটী বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যথাকালে শ্রীশ্রীবাবা সভাস্থলে গমন করিলেন এবং ওজস্বিনী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মই ভারতের জাতীয় প্রতিভা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধর্ম্মই ভারতের জাতীয় প্রতিভা। সত্য বটে, ভারতবর্ষ ধর্ম্মপ্রচারের জন্য অসি হস্তে পররাজ্য আক্রমণ করে নাই, অথবা ভারতের স্বাধীন সম্রাট্‌বর্গ প্রত্যেকেই ধর্ম্মপ্রচারের জন্য রাজকীয় ধনভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে দেন নাই, তথাপি একথা স্বীকার কত্তে আমি বাধ্য যে, ধর্ম্মই ভারতের জাতীয় প্রতিভা। হর্ষবর্দ্ধন আর সমুদ্রগুপ্তকে নয়, চৈতন্য আর বুদ্ধকেই ভারতবর্ষ প্রাণের প্রাণ ব'লে জ্ঞান ক'রেছে। শঙ্কর, নানক, কবীর ভারতবর্ষের প্রাণকে হরণ করেছেন। দিগ্বিজয়ী সম্রাট নয়, ধর্ম্মার্থে রাজ্যত্যাগী জাতিই ভারতের পূজার বস্তু। আজও দুইটী কৃষক একত্র বস্‌লে ভগবানের কথাই বলে, আজও ভিক্ষুক তার ভিক্ষামুষ্টি সংগ্রহের জন্য ভগবানেরই নাম গান করে, আজও দেশহিতকামী যুবক দেশের কাজে জীবনোৎসর্গের শক্তি পাবার জন্য, গীতা পড়ে, চণ্ডী পড়ে, মৃত্যুরূপে ভগবানকে আরাধনা করে। যত বই বাজারে বেরোয়, আজও তার অধিকাংশ ধর্ম্মকে নিয়ে, যত ছবি লোকে ক্রয় করে,

তার অধিকাংশের বিষয়-বস্তু ধৰ্ম্ম ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতে বিবাহ করে লোকে ধৰ্ম্মার্থে, পুত্রোৎপাদন করে ধৰ্ম্মার্থে, কন্যাদান করে ধৰ্ম্মার্থে,—লৌকিক প্রয়োজনের দাবীকেও ধৰ্ম্মের ভিতর দিয়ে ভারতের লোক মিটাবার চেষ্টা করে। এই জন্যেই বল্‌তে হবে, ধৰ্ম্মই ভারতের জাতীয় প্রতিভা।

ভারতের নিসর্গ-শোভার সহিত আধ্যাত্মিকতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অবশ্য, কোনও জাতিরই যে কোনও-একটা নির্দ্দিষ্ট প্রতিভা নাই, একথাও অনেকে ব'লে থাকেন। অন্য দেশের সম্পর্কে সে কথা সত্য হ'তেও বা পারে, কিন্তু ভারতের পক্ষে সে কথা নিরর্থক। ভারতের জাহ্নবীতীরে যে অভ্রান্ত বেদধ্বনি একদিন উদ্‌গীরিত হয়েছিল, সমগ্র ভারতকে তারই অনুকরণে কোটি কল্পকাল পূর্ণ থাক্‌তে হবে। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ, নাস্তিকের ভোগবাদ, প্রত্যক্ষবাদীর প্রমাণপ্রিয়তা কোনও কিছুই ভারতের আধ্যাত্মিকতার খর্ব্বতা সাধন কত্তে পার্ব্বে না। একথা নিশ্চিত জেনো। হিমালয়ের শৃঙ্গমালা, গঙ্গা-যমুনার বারিধারা, নৰ্ম্মদা-কাবেরীর তরঙ্গহিল্লোল, কন্যাকুমারীর সাগর-গর্জ্জন, কামরূপের নিসর্গ-শোভা ভারতের প্রাণে যৌনপ্রেম আর যৌনক্ষুধার তাড়নাকে কখনও ইন্ধন দেবে না, দেবে সত্যস্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, প্রেমস্বরূপ শ্রীভগবানের ধ্যানের প্রেরণা। আল্পস্‌-আন্দিজ দেখে যার সৌন্দর্য্য-পিপাসা মেটেনি, সে আস্‌বে এই ভারতে সুন্দরতরকে দেখ্‌তে, আর বদরিকাশ্রমের পথে পাদচারণা কত্তে কত্তে পরমপ্রেমসুন্দরতমের মোহন স্পর্শকে নিজের অন্তরে অনুভব ক'রে যাবে। সীন্‌-ড্যানিউব-টেম্‌স্‌-আমাজনের জলে বাণিজ্যতরী আর আর্থিক উন্নতি ছাড়া আর কিছু যে দেখেনি, সে আস্‌বে এই ভারতে জাহ্নবী-সলিলের বীচি-ভঙ্গিমায় নিত্যসুন্দরের মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ কত্তে। ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রকৃতির প্রভুকে স্মরণ করিয়ে দেবেই দেবে। তারই জন্য বল্‌ছি, ধৰ্ম্মই ভারতের জাতীয় প্রতিভা।

ভারতের আধ্যাত্মিকতা অবিনশ্বর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বল্‌তে পার, তীর্থ নাম ক'রে পাণ্ডাদের যে সব মঠ-মন্দিরাদি র'য়েছে, তাই থেকেই ভারতের মনে ধৰ্ম্মের কুসংস্কার চিরস্থির

হ'য়ে আছে। আমি বল্‌ছি, তা নয়। কলের কামান দিয়ে সব তীর্থ আর সব মন্দির ধ্বংশ ক'রে দাও, আগুন দিয়ে ভারতের সব ধর্ম্মগ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলে দাও, ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে ভারতের সব সাধু-সন্ত-মহাত্মাদের ধর্ম্মপ্রচারক, আর ধর্ম্মযাজকদের হত্যা কর, তারপরেও দেখ্‌বে আবার ভারতে প্রাচীন বেদমন্ত্রই বিধ্বনিত হচ্ছে, প্রণবই গৃহে গৃহে, কণ্ঠে কণ্ঠে, হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রাণে প্রাণে উচ্চারিত হচ্ছে। ধর্ম্মের নামে যে সব ভণ্ডামি দেশকে আচ্ছন্ন ক'রেছে, তা' ধ্বংশ হ'তে বাধ্য, কিন্তু ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে কোনও প্রকারেই ধ্বংশ করা যাবে না।

লাকসাম

১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

অদ্য প্রাতেই শ্রীশ্রীবাবা লাকসাম আগমন করিয়াছেন।

অনাসক্ত হইবার উপায়

অপরাহ্নে বহু প্রবীন ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা শ্রীশ্রীবাবার শ্রীপাদপদ্মদর্শনে শুভাগমন করিয়াছেন। একজন প্রশ্ন করিলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিজেকে অনাসক্ত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে, নিজেকে অবিরাম পরমাত্মার পায়ে সমর্পণ কর্ব্বার চেষ্টা করা। যে কাজই কর, তাঁর জন্যে কর, তাঁর আদেশে কর, তাঁকে সেবা দিতে গিয়ে কর। তাঁর জন্য যে কাজ, তাতে ভালমন্দ নেই, শুভাশুভ নেই, নিন্দা বা প্রশংসার কিছু নেই, তাঁর কাজ সব বিচার-বিবেচনার ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত। তাঁর আদেশ জেনে যে গুলি চালায়, সে হিংসক নয়, তাঁর আদেশ জেনে যে ইন্দ্রিয়-সেবা করে, সে লম্পট নয়,—তাঁর আদেশকেই প্রধান ক'রে আর সব-কিছুকে অপ্রধান জেনে চলাই হচ্ছে অনাসক্ত হবার শ্রেষ্ঠ উপায়। গৃহীকে এইভাবেই পুত্রোৎপাদন কত্তে হবে, সৈনিককে এইভাবেই দেশরক্ষার জন্য লড়াই কত্তে হবে, বিচারককে এইভাবেই অপরাধীর প্রতি দণ্ডবিধান কত্তে হবে, শিক্ষককে এইভাবেই ছাত্র-শাসন কত্তে হবে। অস্ত্র-চিকিৎসক যখন রোগীর শরীরে ছুরি চালায়, তখন আঘাত করাটায় তার লক্ষ্য থাকে না, লক্ষ্য থাকে রোগ নিরাময়ে, সুতরাং প্রয়োজনের অতিরিক্ত আঘাত

সে করে না, প্রয়োজনের চেয়ে কম ক'রেও ক্ষান্ত হয় না। তেমনি ভালমন্দ প্রত্যেক কাজে ঈশ্বরের সেবাকেই প্রধান জেনে তার জন্য যে অবস্থার লোকের পক্ষে যেরূপ কার্য্য কর্ত্তব্য হবে সে তা অকুণ্ঠিত চিত্তে ক'রে যাবে, এই হচ্ছে অনাসক্ত হ'বার প্রধান উপায়। গৃহীর পক্ষে পুত্রোৎপাদন অধিকাংশ স্থলে কর্ত্তব্য, অথচ পুত্রোৎপাদনে ইন্দ্রিয়চর্চ্চা অবশ্যম্ভাবী—এমত অবস্থায় ভগবৎ-প্রীতিকে প্রধান ক'রে ইন্দ্রিয়ের চর্চ্চাকে গৌণ ব্যাপার ক'রে ভগবৎ-প্রীতির জন্য সে যা করা দরকার স্বচ্ছন্দে কর্‌বে, অননুতপ্ত হ'য়ে কর্‌বে। সৈনিকের পক্ষে দেশরক্ষা করাই প্রধান কর্ত্তব্য, অথচ দেশরক্ষার ব্যাপারে আততায়ি-দলন বা শত্রুহত্যা একান্তই অবশ্যম্ভাবী, এমত অবস্থায় ভগবৎ-প্রীতিকে প্রধান ক'রে যুদ্ধবিদ্যাকে গৌণ ক'রে ভগবানের প্রীতির জন্য যা' করা আবশ্যক, সে তা নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে কর্‌বে। জগৎকে অলীক ব'লে যতক্ষণ না সত্যি সত্যি অনুভূতি হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিজ নিজ আশ্রমোচিত কর্ত্তব্যও লোককে কত্তে হবে, আবার তার মাঝে ঈশ্বর সমর্পণের ভিতর দিয়ে অনাসক্তভাবও বজায় রাখ্‌তে হবে। অন্নবস্ত্রের যতদিন প্রয়োজন থাক্‌বে, ততদিন কৃষিবিদ্যার চর্চ্চারও প্রয়োজনীয়তা থাক্‌বেই, যে বিদ্যার চর্চ্চা আছে ব'লেই জগতে ভূমির সীমানা নিয়ে আবার লড়াইও চল্‌তে বাধ্য। পুত্রলাভের প্রয়োজন যতকাল থাক্‌বে, ততকাল পুত্রলাভানুকূল ইন্দ্রিয়চর্চ্চা থাক্‌বেই, যে চর্চ্চা একটু করলে মানুষের মন চিরকালই আরও একটু কত্তে লিপ্সু হ'তে চাইবেই। রাষ্ট্রের যতকাল প্রয়োজন থাক্‌বে, ততকাল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সৈনিক থাক্‌বেই, যাদের যুদ্ধবিদ্যার চর্চ্চা আত্মরক্ষার মৌলিক প্রয়োজনকে বারবার লঙ্ঘন ক'রে পররাষ্ট্র-লোলুপতায় পরিণত হ'তে চেষ্টা কর্ব্বে। আকার থাক্‌লেই তার বিকার আছে। এই অবস্থায় এ সব বিকারের প্রধান ঔষধ হচ্ছে, অনাসক্ত হ'য়ে কাজ করা, কর্ত্তব্যবোধে মাত্র কাজ করা, কাজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চিত্তপ্রবৃত্তিকে উচ্ছৃঙ্খল হ'তে না দেওয়া, চিত্তবৃত্তি-গুলিকে হাতের মুঠোর ভিতরে পূরে রেখে দরকারমত মাত্র তাদের ব্যবহার করা, বুলডগ্‌কে যেমন শিকারীরা দরকার মত ব্যবহার করে, অপর সময়ে

শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে রাখে।—এই যে অনাসক্ত কর্ত্তব্যপালন, তার উৎস হচ্ছে ভগবানের জন্য নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দেওয়ার ধ্যান জমান।

আত্মসমর্পণের উপায়

জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করিলেন,—তাঁর পায়ে আত্মসমর্পণের উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—প্রথমতঃ নিজেকে তাঁর পবিত্র নামের পায়ে সমর্পণ করার অভ্যাস কর। নিজের সমগ্র অস্তিত্বকে তাঁর নামের ভিতরে ডুবিয়ে দাও, দেহমনপ্রাণ নামময় হ'য়ে যাক্, তখনই পরমাত্মায় বিশ্বাস আস্‌বে, আর বিশ্বাস এলেই আত্মসমর্পণ সহজ হ'য়ে যাবে। শতবার নিজেকে নামের কোলে সঁপ্‌তে চেষ্টা কর, সহস্রবার কর, কোটি কোটি বিফলতার মাঝেও চেষ্টাই ক'রে যাও, নামের সেবা কত্তে কত্তে ভগবানে বিশ্বাস জেগে উঠ্‌বে,—The Holy name will inspire you with a firm belief in Him. No surrender is possible in the absence of true belief in Him. First acquire faith and surrender will follow faith of its own accord. (নামই বিশ্বাসকে প্রবুদ্ধ ক'রে তুল্‌বে। প্রকৃত বিশ্বাস ছাড়া আত্মসমর্পণ হ'তে পারে না। আগে বিশ্বাসকে অর্জ্জন কর, আত্মসমর্পণ বিশ্বাসের পদানুসরণ কর্ব্বে)।

অবিরাম নাম করিবার কৌশল

প্রশ্ন।—অবিরাম নাম কি ক'রে কত্তে হয়?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হৃৎস্পন্দনের সাথে সাথে, শ্বাস-বায়ুর গমনাগমনের সাথে সাথে, পদচালনার ধ্বনির সাথে সাথে, নাম ক'রে যাবে। যখন যে ধ্বনিটার দিকে মন যাবে, তখন তারই সাথে নামকে যুক্ত ক'রে নেবে। গাড়ী চেপে কোথাও যাচ্ছ, হৃৎস্পন্দন, শ্বাস বা পায়ের কোনো শব্দে মনকে লাগান যাচ্ছে না, গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দের সাথেই অবিশ্রাম গুচ্ছে গুচ্ছে নামের প্রবাহ চলুক। প্রস্রবণের তীরে ব'সে জলধারার অবিচ্ছেদ নির্ঘোষের সাথে মিলিয়ে স্তবকে স্তবকে নামের ফুল ফুট্‌তে থাকুক।

১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

মনকে ব্রহ্মচেতনায় ডুবাইবার উপায়

প্রাতে সাত ঘটিকায় কুমিল্লা যাইবেন বলিয়া শ্রীশ্রীবাবা লাকসাম ষ্টেশনে আসিয়াছেন। গাড়ী প্রস্তুতই আছে, গাড়ীতে উঠিয়া তিনি কম্বল বিছাইয়াছেন। এই সময়ে স্থানীয় একটী যুবক উপদেশ চাহিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বাইরে কাজ ক'রে যাও ডাকগাড়ীর মত দ্রুতবেগে, কিন্তু ভিতরে অনুক্ষণ ডুবে থাক ব্রহ্মচেতনায়।

যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—তার উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমার শরীরের প্রত্যেকটী আকুঞ্চন ও প্রসারণের সঙ্গে অবিরাম ভগবানের অমৃতময় নাম স্মরণের চেষ্টাই তার উপায়। হাত বাড়াচ্ছ, স্মরণ কর, পবিত্র ওঙ্কার; পা গুটাচ্ছ, স্মরণ কর পবিত্র ওঙ্কার, শ্বাস টান্‌ছ, স্মরণ কর ওঙ্কার, প্রশ্বাস ছাড়ছ, স্মরণ কর—ওঙ্কার, প্রতি কর্ম্মের মাঝখানে প্রতিষ্ঠা কর ভগবানের সত্যময় নামকে। নাম কত্তে কত্তেই মন ব্রহ্মচেতনায় ডুবে যাবে।

লাকসাম ষ্টেশনের জলের-কলের মুখ হইতে তখন ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া অবিরাম জল পড়িতেছিল এবং তাহাতে একটা শব্দ হইতেছিল। শ্রীশ্রীবাবা সেই শব্দের দিকে উপদেশপ্রার্থী যুবকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বলিলেন,—ঐ যে বাবা জলধারা বর্ষিত হচ্ছে, মনটা দিয়ে দাও ঐখানে। ঐ জল ব্রহ্মনাম উচ্চারণ কচ্ছে; অবিরাম স্রোতে সেই নামের ঝঙ্কারকে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে বায়ু-মণ্ডলের স্পন্দনের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। দাও তোমার মনকে লাগিয়ে ওর সঙ্গে। নিজের বেগে যে পবিত্র নাম সে গান ক'রে যাচ্ছে, বিনা শক্তিক্ষয়ে একাগ্র শ্রবণে তা তুমি শুন্‌তে থাক, গুচ্ছে গুচ্ছে ওরই সাথে তোমার অন্তর অমৃতময় নাম জপ কত্তে থাকুক, ভোল তুমি জগৎকে, জগৎ ভুলুক তোমাকে, নিজেকে ডুবাও নামে, নাম ডুবুক তোমাতে, এইভাবে ব্রহ্মচৈতন্যের ভিতরে নিজের স্বরূপ খুঁজে পাবে।

সকল ধ্বনিই তাঁর নাম

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—গিরি-নির্ঝরের অবিশ্রান্ত জল-কল্লোল তোমার অন্তর-দেবতারই মধুময় নামের পবন-হিল্লোল। মলয়ানিলকম্পিত শুষ্ক-বৃক্ষ-পত্রের অবিশ্রাম মর্ম্মরধ্বনি, তোমারই পরম-দৈবতের সুধামাখা নামের সঙ্গীত-ধ্বনি। মধুপিয়াসী ভ্রমরের অবিশ্রান্ত মধুর গুঞ্জন, তোমারই ইষ্টদেবতার সুধামাখা নামের কীর্ত্তন। এই ভাব নিয়ে নামকে খুঁজে বেড়াও সর্ব্বত্র, নাম-সব-কিছুর ভিতর দিয়ে আবার ফিরে তোমারই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ কর্ব্বে,—তুমি ব্রহ্মচেতনায় সঞ্জীবিত হবে।

অপরের সম্মানে ঈর্ষ্যা করিও না

এই সময়ে কুমিল্লাগামী জনৈক শিক্ষিত ভদ্রলোক একটা অপ্রীতিকর কথার উত্থাপন করিলেন। রহিমপুর আশ্রমের উৎসবের সময়ে অভ্যাগতদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য প্রায় এক মাইলব্যাপী বিশাল শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। সমাগত অতিথিদের মধ্যে কুমিল্লার জনৈক প্রসিদ্ধ উকিল সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। এই প্রসঙ্গ তুলিয়া ভদ্রলোক বলিলেন,—একজন উকিলকে এত সম্মান-দান কেন?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বাবা হে, পরের সম্মান দেখে কেন অন্তরে এত জ্বালা অনুভব কচ্ছ, আমায় বল্‌তে পার? একজন উকিল এত সম্মানিত হ'য়েছেন দেখে তোমার এত ব্যথা, তোমারই গুরুস্থানীয় কোনও সন্ন্যাসী আবার কুমিল্লায় এলে দলবলে বহুলোক যখন তাঁকে সম্বর্দ্ধনা কত্তে যাবেন, তখন আর এক দল লোকের তাতে জ্বালা হবে। তখন তাদের জ্বালা মিটাবে কি করে? যেখানেই যিনি সম্মানিত হউন, অন্তরের আনন্দ দিয়ে তাঁর সম্বর্দ্ধনা কর। মনে মনে প্রার্থনা কর, জগতে যেন সবাই সম্মানিত হয়, একটী প্রাণীও যেন অসম্মানে না থাকে। কে সম্মান পাবার যোগ্য, আর কে অযোগ্য, এ সব বিচার ভু'লে গিয়ে, যখন যার সাথে দেখা হৌক, তাকেই সম্মান প্রদান কর্ব্বার অভ্যাস কর। একটী ক্ষুদ্র শিশু কিম্বা একটা নিরেট মূর্খ, সবাই তোমার নিকট সম্মান যেন পেতে পারে, তেমন চরিত্রটী গঠন কর।

একটা দুশ্চরিত্র লম্পট বা একটা অস্পৃশ্য মেথরও যেন তোমার নিকট এসে তার নিজের একটা মর্য্যাদা আছে ব'লে অনুভব ক'রে যেতে পারে, এমনতর সম্মান তাকে দিয়ে দিতে শিক্ষা কর। কাউকে ঈর্ষ্যা ক'রে কখনো তুমি বড় হ'তে পার্ব্বে না, বড় যদি হ'তে হয়, তবে নির্ব্বিচারে সকলকে সম্মানিত ক'রে, আনন্দের সহিত সকলের সম্মাননাকে উপভোগ ক'রে, সকলের সম্মান-লাভে সহযোগ ক'রে তবে বড় হ'তে হবে।

পল্লী-সেবার আদর্শ

কুমিল্লা রামমালা ছাত্রাবাসের জনৈক সহকারী অধ্যক্ষ এই ট্রেণেই কুমিল্লা যাইতেছেন। তিনি ভক্তিভরে শ্রীশ্রীবাবার চরণধূলি লইয়া পল্লী-সেবা সম্বন্ধে কতিপয় মূল্যবান্ প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পল্লীসেবার শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল, পল্লীর মধ্যে পবিত্র চিন্তার প্রসার-সাধন। নির্ম্মল, সুপরিচ্ছন্ন চিন্তা, যে চিন্তায় ঘোলাটে কিছু নেই, আবিলতা নেই, কুজ্ঝটিকা বা প্রহেলিকা নেই, সরল সহজ সাবলীল স্বচ্ছন্দ-গতিতে প্রবাহিত জীব-কল্যাণমূলক স্বাধীন ও নির্ব্বিরোধ চিন্তা। কয়টা পল্লীর এঁদো পুকুরের পানা আমি নিজ হাতে সাফ ক'রে দেখেছি, কত পল্লীর রাস্তা আমি কোদাল মে'রে মাটি কেটে তৈরী ক'রেছি, কিন্তু তাতে পল্লীর প্রাণকে আঘাত করা হয়নি. দু'দিনের জন্য কয়টা অলস লোকের মাছ ধ'রে খাবার বা পথ চল্‌বার একটুকু সুবিধামাত্র হ'য়েছে। ভাবের তরঙ্গ সৃষ্টি করা চাই, নিত্য নব নব চিন্তারত্ন ঘরে ঘরে পরিবেশন করা চাই, ভাব-সমুদ্রের অতল তলদেশ মন্থন ক'রে মণিখণ্ড সব সংগ্রহ ক'রে দরিদ্রের ছাদহীন কুটীরের কোণে এনে রাখা চাই,—কারণ ভাবই ভবিষ্যতের জন্ম দেবে। অবশ্য, মুখে ত' ভাব প্রচার কত্তে হবেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় প্রয়োজন হচ্ছে, অন্তর দিয়ে অন্তরে অন্তরে ভাব-জলধির তুমুল আলোড়ন উপস্থিত করা। নিঃস্বার্থ যাঁর চিত্ত, আর সংযত যাঁর মন, একটা গ্রামের ভিতরে ব'সে থেকে যদি তিনি মুখের কথাটীও না কন, তবু তাঁর শুদ্ধ চিন্তা সকলের অশুদ্ধ জড়তার অবসান-পথ রচনা কত্তে সমর্থ হয়।

গুরুশিষ্যের মধ্যে জাতিভেদ নাই

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবা কুমিল্লার জনৈক জলানাচরণীয়-জাতিভুক্ত ভক্তের গৃহে অবস্থান ও আহারাদি করিলেন। ভক্ত নিজ হস্তে রন্ধনাদি করিয়া দিলেন। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার হস্তে প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করিতেছেন দেখিয়া ভক্ত আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমি যদি তোর জাতের ঘরে জন্মগ্রহণ কত্তাম, তা হ'লে কি তুই আমাকে গুরু ব'লে মান্‌তিস্ না ?

শিষ্য বলিলেন,—আপনি চণ্ডাল হইলেও আমার গুরু, মুচি হইলেও আমার গুরু, মেথর হইলেও আমার গুরু, ইহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলিয়া যদি লোক কাহাকেও মনে করে, তবে তাহা হইলেও আমার গুরু।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া কহিলেন,—তা হ'লে তুইও সর্ব্বাবস্থায়ই আমার শিষ্য। গুরুশিষ্যের মধ্যে আবার জাতিভেদ কিরে ? *

ব্রাহ্মণের লক্ষণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি ? শ্রদ্ধা আর পবিত্রতা। এদুটী যার আছে, সে গণিকার ছেলে হ'লেও ব্রাহ্মণ। এদুটী যার নেই, সে নিকষ-কুলীনের ছেলে হ'লেও ব্রাহ্মণ নয়।

মটরযোগে অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা রহিমপুর পৌছিলেন এবং পৌছিবার অব্যবহিত পরেই কোদাল লইয়া মাঠের কাজ আরম্ভ করিলেন।

রহিমপুর আশ্রম

১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন

ভুট্টাক্ষেত্রের পরিচর্য্যা চলিতেছে। গ্রামের উৎসাহী যুবক যোগেন্দ্র,

---

* যদিও শ্রীশ্রীবাবা জাতিভেদ মানিতেন না, তথাপি পরবর্ত্তী সময়ে তিনি এই নিয়ম কঠোরতার সহিত মানিয়া চলিতেন যে, তাঁহার আশ্রমীর ব্রহ্মচারীর হস্তে ব্যতীত অপরের হস্তে খাইতেন না। এইরূপ শৃঙ্খলার বিশেষ প্রয়োজন স্বাস্থ্য, সময়ানুবর্ত্তিতা, কার্য্যানুকূল্য, সুরুচি-রক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে একান্ত আবশ্যকীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

দেবেন্দ্র, মনোমোহন, ব্রজেন্দ্র, উমাকান্ত, রমণী প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত। কথায়-কথায় উঠিল, সাহেবেরা ভুট্টা ভালবাসে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাহেবেরা কি ভালবাসে আর না বাসে, সেইটা তোমাদের বিচারের বিষয় নয়। কোন্‌টা গ্রহণে তোমাদের কল্যাণ আর বর্জ্জনে অকল্যাণ, সেইটাই তোমাদের বিচারের বিষয় হোক্। পাশ্চাত্যেরা অনেক কিছু করে, যা' তাদের হয়ত শোভা পায়, কিন্তু তোমাদের অনিষ্টকর। তোমাদের অনেক কিছু আছে, যা' ক'রে যাচ্ছ প্রথার দাসত্বমূলে, কিন্তু পরিবর্জ্জন না কল্লে তোমাদের কল্যাণ নেই। কিসে তোমার মঙ্গল ও অমঙ্গল, তার নির্ভুল নির্ণয়ের উপরে এসে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলন স্থাপিত হোক্। সুতরাং এ ব্যাপারে সর্ব্বাগ্রে চাই চিন্তার স্বাধীনতা, আর চিন্তার সাহসিকতা।

চিন্তার স্বাধীনতা কাহাকে বলে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যা' কিছু ভারতীয়, তাকে নিন্দা করাকেই অনেকে সাহসিকতার লক্ষণ বা চিন্তার স্বাধীনতা ব'লে মনে ক'রে থাকেন। যা'-কিছু অভারতীয়, তাতেই দোষোদ্‌ঘাটন-চেষ্টাকে অনেকে সত্যপ্রিয়তা ব'লে জ্ঞান ক'রে থাকেন। কিন্তু সেটা মস্ত ভুল। ভাল জিনিষকে খুঁজে বের করার চেষ্টাতেই হয় সাহসিকতার পরিচয়, আর ভাল জিনিষকে খুঁজতে হ'লে চতুর্দ্দিকের ভাল-মন্দ আবেষ্টনের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার শক্তিকে বলা চলে চিন্তার স্বাধীনতা।

পাশ্চাত্যের উন্নতির কারণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিভাবে পাশ্চাত্যেরা পা ফাঁক ক'রে সিগারেটের ধূম উদ্গীরণ করেন, তার উপরে পাশ্চাত্যের উন্নতি নির্ভর করেনি। তাঁদের অবিরাম কর্ম্মশীলতাই তাঁদের উন্নতির প্রধানতম কারণ। মর কি বাঁচ, এগিয়ে যাও,—এই কথাকেই তাঁরা মূলমন্ত্র ক'রেছেন। তাঁদের এই অতুলনীয় কর্ম্মশীলতার জন্যই তাঁরা জগতে দিগ্বিজয়ী, তাঁরা জগতে পূজিত। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা, লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষ-সিংহেরই অঙ্কশায়িনী।

ভারতের বিশেষত্ব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আর, ভারতের বিশেষত্ব হ'চ্ছে, সর্ব্বকর্ম্মে তার ঈশ্বর-চেতনা। উত্থানে বা পতনে, নিদ্রায় বা জাগরণে, কর্ম্মে বা অকর্ম্মে ভারত ভগবানকে সঙ্গে রাখ্‌তে চেষ্টা করেছেন। ভগবানকে ছাড়া ভারতের মাঠের অশিক্ষিত কৃষকও গান গায় না, ভগবানকে ভুলে নদীর মাঝি নৌকা খোলে না, ভগবানকে ভুলে যাত্রী যাত্রা করে না, ভগবানকে ভুলে কুলী ঘাড়ে মাল তোলে না। এই ঈশ্বর-চেতনাই ভারতের ভারতীয়ত্ব।

সমন্বয়ের সূত্র

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পাশ্চাত্যের এই অদম্য কর্ম্মশীলতা আর ভারতের এই অপূর্ব্ব ঈশ্বরপ্রাণতা এই দুইটীকে একত্র গ্রথিত করাই হচ্ছে, প্রাচ্য পাশ্চাত্যে সর্ব্বশুভপ্রদ শ্রেষ্ঠ সমন্বয়।

সন্ন্যাসের সুখ

কতিপয় যুবক সায়ংকালে শ্রীশ্রীবাবার সহিত একত্র উপাসনায় বসিলেন।

উপাসনান্তে জনৈক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমাদের অধিকাংশের জন্যই গার্হস্থ্যাশ্রম আত্মবিকাশের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। কেউ কেউ আবার সন্ন্যাস-সংস্কারের চেয়ে বৃহত্তর বা পবিত্রতর কোনও সংস্কারকে অনুভব কত্তে সমর্থ হবে না। তাদের কাছে সন্ন্যাসই ব্রহ্মপদ। তাদের কাছে সন্ন্যাসের সুখের তুলনায় স্বর্গবাসসুখ তুচ্ছাতিতুচ্ছ। তোমাদের জন্য গার্হস্থ্যের উপদেশ আমি যখন খুব কলকণ্ঠে প্রদান করি, তাদের জন্য অখণ্ড সন্ন্যাসকে আমি তখন অন্তরের অন্তরে সমর্থন করি। প্রকৃত সন্ন্যাসীর সুখের কাছে পৃথিবীর সাম্রাজ্য-জয়ী গৃহীর সুখও তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

রহিমপুর আশ্রম
২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

অন্তর্মুখ মন লইয়া বহির্মুখ কর্ম্ম

প্রচণ্ড উদ্যমে আশ্রমের কাজ চলিতেছে। রহিমপুর ও নবীপুরের প্রায় সকল যুবকেরাই নিজ নিজ সাধ্যমত কোদাল চালাইতেছেন বা মাটির ঝুড়ি বহন করিতে-ছেন। মাঝে মাঝে একটু একটু বাল-সুলভ উৎসাহ-জনিত গোলযোগ হইতেছে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বাইরে কর্‌বি কাজ জড় বস্তু নিয়ে, ইট কাঠ পাথরের, ঝোড়া কোদাল মাটির, কাগজ কলম পেন্সিলের,—ভিতরে কর্‌বি কাজ চিন্ময়-চৈতন্য-স্বরূপের, আনন্দময় প্রেম-স্বরূপের, জ্ঞানময় জ্যোতি-স্বরূপের। বাইরের কর্ম্ম যেন ভিতরের মনকে ভগবান থেকে বিচ্যুত ক'রে নিয়ে আস্‌তে না পারে। ভগবানের নামই তোমার জীবন হউক, এই নাম ছেড়ে দিলে যে তোমার জীবন ছেড়ে দেওয়া হ'ল, এ প্রত্যয় তোমার দৃঢ় হউক।

একথা বলিতে বলিতেই কর্ম্মিদের কলকোলাহল থামিল এবং প্রত্যেকে নিঃশব্দে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

প্রতি কর্ম্মে নামের সেবা

তখন শ্রীশ্রীবাবা, যাঁহারা কোদাল চালাইতেছিলেন, তাঁহাদের নিকটে যাইয়া বলিলেন,—এক এক কোদাল মাটী কাট্‌বি আর এক একবার তাঁর নাম জপ কর্‌বি। এই কোদালটাকেই ক'রে নে তোর জপের মালা।

যাহারা মাটী ফেলিতেছিলেন, শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—পায়ের ধাপে ধাপে কর্‌তে থাক নাম জপ,—ঝুড়ি ফেল্‌বার সময় স্মরণ কর প্রাণময়, প্রেমময় ভগবানের নামকে।

২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

নামই অমৃত

অদ্য প্রাতে আট ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীবাবা মোচাগড়া যাইবার পথে নবিপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন পোদ্দারের রুগ্না পুত্রবধূকে দেখিতে অনুরুদ্ধ হইলেন। মেয়েটির মৃত্যুকাল সন্নিকট হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞান রহিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তবে আর ভাব্‌না কিরে বেটি? জ্ঞানই যখন র'য়েছে, তখন অবিরাম ভগবানের নাম স্মরণ কর্। নামও যিনি, নামীও তিনিই। নামকে স্মরণ কর্‌লেই ভগবানকে স্মরণ করা হয়।

মেয়েটি ক্ষীণকণ্ঠে অস্পষ্টভাবে যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, তিনি দীক্ষিতা নহেন। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভয় কি? বৈতরণীর পারের কড়ি আমি তোকে দিয়ে দিচ্ছি।

ইঙ্গিতমাত্র গৃহমধ্যবর্ত্তী সকলে বাহিরে চলিয়া গেলেন,—শ্রীশ্রীবাবা মেয়েটিকে অখণ্ড-নাম শুনাইলেন।

শুশ্রূষাকারীরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই লক্ষ্য করিলেন, রোগক্লিষ্টা মরণ-পথবর্ত্তিনী কিশোরীর মুখমণ্ডলে শান্তি এবং নির্ভরের এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ-স্থিরতা বিরাজ করিতেছে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বৃথা প্রশ্ন করিয়া ইহাকে আর তোমরা বহির্ম্মুখ করিও না, ইহাকে ইহার প্রিয়তম নামে ডুবিয়া থাকিতে দাও। নামই অমৃত, মৃত্যু-জয় ইহাতেই হইবে। ডাক্তারের ঔষধ মৃত্যু-জয় করিতে পারিবে না।

রহিমপুর,

২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

শিষ্যের আত্মসমর্পণে গুরুর গুরুত্ব

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন সাহার বাড়ীতে কীর্ত্তনানন্দে যোগ দিবার জন্য শ্রীশ্রীবাবা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা আসিতেই যেন আনন্দের স্রোতে জোয়ার বহিল।

কীর্ত্তনের স্থান হইতে একটু দূরে একটু নিভৃত স্থানে সকলে শ্রীশ্রীবাবার বসিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং নানা ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—গুরু-নির্ণয় হয় কিসে? নির্ণয় হয়, শিষ্যের আত্ম-সমর্পণে। যেখানে শিষ্য গুরুর কাছে নিজেকে সমর্পণ ক'রে দিতে পার্লে না, সেখানে কোনো গুরু বাস্তবিক পক্ষে মানাই হয় নি। গুরু মন্ত্র দিলেন কি না, তা দিয়ে শিষ্যের শিষ্যত্ব নির্ণয় হয় না। শিষ্য গুরুর ভালমন্দ সব আদেশ পাল্‌তে প্রস্তুত কি না, এ দিয়েই শিষ্যের শিষ্যত্ব আর গুরুর গুরুত্ব।

রহিমপুর আশ্রম,

২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

ভগবান্ পবিত্রতাস্বরূপ

প্রচণ্ড উদ্যমে গ্রামের যুবকেরা আশ্রমের কাজ করিতেছেন। কাজ করিবার কালে সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নাম স্মরণ করা শ্রীশ্রীবাবার এক বিশেষ শিক্ষা।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবানের নাম কাম-দমনের সহায় কেন জানিস? যেহেতু ভগবান পবিত্রতাস্বরূপ, তাঁর নাম স্মরণে পবিত্রতার ধ্যান করা হয়।

রহিমপুর আশ্রম
২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

ব্রহ্মবীজ সব ক্ষেত্রেই বপন চলে

গ্রামের যুবকেরা আশ্রমের কাজ করিতেছেন, সেই সময় শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এক এক বীজ বপনের জন্য এক এক প্রকার ক্ষেত্র-নির্ণয় প্রয়োজন হয়। যেমন বীজ, তেমন ক্ষেত্র। কিন্তু বট-বীজ নরম মাটিতে আর কঠিন কঙ্করে সব জায়গায়ই সমভাবে অঙ্কুরিত হয়। তার পক্ষে অনুর্ব্বর মৃত্তিকাও পরিত্যজ্য নয়। অখণ্ড ব্রহ্মনামও তদ্রূপ। পাত্রাপাত্রের বিচার নিষ্প্রয়োজন। যে মত বা যে রুচির প্রতিই তুমি পক্ষপাতী হও না, অখণ্ড ব্রহ্মবীজ তোমার সকল সময়েই মঙ্গল কর্ব্বে।

যুগধর্ম্মের দাবী

কার্য্যাবসানে কয়েকটী যুবক শ্রীশ্রীবাবার সমক্ষে বসিয়া কিয়ৎকাল নিজ নিজ প্রাপ্ত প্রণালী অনুযায়ী ভগবদুপাসনা অর্থাৎ নামজপ করিলেন এবং তৎপরে শ্রীশ্রীবাবার শ্রীমুখনিঃসৃত কিছু উপদেশবাক্য শ্রবণের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে আজ পবিত্রতম বেদসার প্রণবমন্ত্রের চর্চ্চার অধিকার প্রসারিত হউক। তোমরা নিজেদের জীবনে এই অখণ্ড মহামন্ত্রের সাধনা ক'রে জ্যোতির্ম্ময় হও, জগতের শ্রদ্ধা, বিস্ময় আকর্ষণ কর। তোমাদের দৃষ্টান্ত কোটি কোটি মানব-মানবীকে এই মহামন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট কর্ব্বে। ওঙ্কার-মন্ত্রের নির্ব্বিরোধ নিরঙ্কুশ প্রসার আজ যুগধর্ম্মেরও দাবী। যে মহামন্ত্র থেকে কোটি কোটি নরনারী বঞ্চিত, আজ তাদের এই জন্য মহামন্ত্রের প্রবেশ-দুয়ার খুলে দিতে হবে। সবাইকে এই মহামন্ত্রের সাধনায় অনুপ্রাণিত কর্ত্তে হবে। কিন্তু বাবা আগে তোমরা নিজেরা হও সাধক। তবে জগৎ তোমাদের পন্থার প্রতি বিশ্বাসী হবে।

গুরুগিরির প্রসার বাঞ্ছনীয় নহে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমার কাছ থেকে এসে মন্ত্র নিয়ে যেতে লোককে প্ররোচিত ক'রো না। তাদের প্রাণের ভিতরে অবিরাম অখণ্ড মহানাম ধ্বনিত হচ্ছে। তাদের অন্তরে বিরাজ করেন জ্ঞান-স্বরূপ সদ্‌গুরু। তাঁর কাছ থেকেই সবাই দীক্ষা নিক্। মানুষ-গুরুর কাছে মন্ত্র না নিলেও মন্ত্রজপ নিষ্ফলে যায় না। এই বিশ্বাস সকলের মনে জাগিয়ে দাও। নিজের অন্তরের বিপুল আবেগ নিয়ে মানুষ নিজের ভিতরের প্রভুকে খুঁজুক, আর নিজের কাছ থেকে নিজে মন্ত্র নিয়ে নিজে নিজের শিষ্য হোক্, নিজের চেতনার আলোকে নিজের পথ দেখুক, নিজের উপলব্ধির সস্নেহ আকর্ষণে জোরসে নিজের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হোক্। মানুষকে গুরু ব'লে মনে ক'রে বিড়ম্বনার পর বিড়ম্বনা আহরণের প্রয়োজন কি? "ওঁ সদ্‌গুরু" ব'লে সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা জগদ্‌বিধাতা পরমপ্রভুকেই সে অবিরাম ডাকুক। এই যে স্বাধীন তেজস্বিতা, যা ধর্ম্মজীবন থেকে লোপ পেয়েছে বলেই ক্যাঙ্গলামোর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে, সেই সজীব তেজস্বিতাকে আজ ভারতের প্রান্তে প্রান্তে স্ফুরিত ক'রে তোলাই হবে তোমাদের জীবনের আমৃত্যু একনিষ্ঠ সাধনার পরমামৃতময় সুফল।

যুগধর্ম্ম কাহাকে বলে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যুগধর্ম্ম কাকে বলে জান? যুগধর্ম্ম আপদ্ধর্ম্মের জ্যেঠতুত ভাই। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে প্রচলিত মত ও প্রচলিত প্রথা লঙ্ঘন ক'রে যখন একজনকে চল্‌তে হয়, তখন সেটি আপদ্ধর্ম্ম। আর যখন সেই প্রথাকে লঙ্ঘন ক'রে চলার প্রয়োজন পড়ে একটা সমগ্র দেশের বা সমগ্র জাতির, তখন সেটি যুগধর্ম্ম। লোকনাথ ব্রহ্মচারী কয়েকজন অব্রাহ্মণ-সন্তানকে ব্রহ্মগায়ত্রী ও ওঁকার-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ কয়েকজন অন্ত্যজকে উপনয়ন দিয়ে ব্রহ্মমন্ত্রে অধিকার প্রদান করেছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর ধীবরদিগকে ব্রাহ্মণত্বে অধিকার দিয়েছিলেন। এগুলি ব্যক্তিবিশেষে এবং স্থানবিশেষে মাত্র ব্যবস্থা। সুতরাং এগুলি হ'ল সব আপদ্ধর্ম্ম হিসাবে। কিন্তু ব্যক্তি এবং

স্থান বিচার না ক'রে সকল ব্যক্তির জন্য এবং সকল স্থানের জন্য এই মহামৃতের অধিকার প্রসারিত ক'রে দেওয়ার দাবীই হচ্ছে যুগধর্ম্মের দাবী।

সনাতন ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু ধর্ম্ম-সনাতন, শাশ্বত ও নিত্য। যাহা সনাতন সত্য, তাহাই ধর্ম্ম। শাশ্বত সত্যে অবিচল নিষ্ঠাই প্রকৃত ধর্ম্মনিষ্ঠা। যে সকল আচার-ব্যবহার শাশ্বত সত্যে জীবকে নিষ্ঠাশীল করে, সেই সকল আচার-ব্যবহার গৌণভাবেই মাত্র ধর্ম্ম এবং গৌণভাবে তারা শাশ্বত সত্যে জীবের অন্তরকে লগ্ন করার চেষ্টা করে ব'লে তারাই ধর্ম্ম ব'লে সমাজে গৃহীত ও পূজিত। এই সব আচার-ব্যবহারের মধ্যে যখন proportion and equilibriumএর (সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের) অভাব ঘটে, তখন আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন সার্ব্বজনন ভাবেই প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। এরই নাম যুগধর্ম্ম। কিন্তু এই সব পরিবর্ত্তন দ্বারা পরম সত্যের সঙ্গে যোগ স্থাপনের সুগমতা বিধানই প্রকৃত উদ্দেশ্য। সুতরাং শত আচার-ব্যবহারের বিবর্ত্তনের মাঝেও যে পরমসত্য, পরমধর্ম্ম, জীবের একমাত্র লক্ষ্য এবং প্রাপ্তি, সেই সনাতন ধর্ম্মই একমাত্র ধর্ম্ম এবং প্রকৃত ধর্ম্ম। ওঙ্কার মহামন্ত্রই সর্ব্ব-মন্ত্রের অন্তর বা প্রাণ, এজন্য ওঙ্কার-মন্ত্রেই সর্ব্বজীবের স্বাভাবিক এবং গূঢ়তর অধিকার। ইহা সনাতন ধর্ম্মেরই দাবী। নানাভাবে এই মহামন্ত্রের অনুশীলন সর্ব্ব-সাধারণের কাছ থেকে দূরে গেছে। তাতে ধর্ম্মজীবনে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের অভাব ঘটেছে। সেই জন্যেই ওঙ্কার-মহামন্ত্রের সুপ্রসার-সাধন আজ যুগধর্ম্মেরও দাবী। এ দাবী তপস্বী সাধক, ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ব্যক্তিরাই পূরণ কর্ত্তে সমর্থ হবেন।

রহিমপুর আশ্রম
২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

কুমারী-দীক্ষার সুফল

গ্রামবাসী জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীবাবার বিশ্রাম সময়ে শ্রীশ্রীবাবাকে পাখার বাতাস করিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে কুমারী মেয়েদের দীক্ষার কথা উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মেয়েদের কুমারী অবস্থায় মহামন্ত্রে দীক্ষা পাওয়া খুব ভাল। তাতে তারা জীবনটাকে ভবিষ্যতের জন্য শক্ত ক'রে গ'ড়ে তোল্‌বার সুযোগ পায়। বিবাহের পরে জীবন গড়ার চেষ্টা স্ত্রী-পুরুষ সকলের পক্ষেই বিড়ম্বনা, বিশেষতঃ মেয়েদের পক্ষে। কেননা, বিবাহের পরে ইচ্ছায় হোক্ আর অনিচ্ছায় হোক্, তারা স্বামীটীর ব্যক্তিগত রুচি-প্রকৃতির অনুবর্ত্তন কত্তে বাধ্য হয় এবং সে সময়ে নিজ জীবন গঠনের জন্য প্রয়োজন মত দৃঢ়তা অবলম্বন কত্তে গেলে অনেক সময়ে সাংসারিক অশান্তি সৃষ্টি হয়। সকলের স্বামী এক রকম থাকে না, সকল স্বামীকে মেয়েরা বাগেও আনতে পারে না। সুতরাং বিয়ের আগেই ভগবৎ-সাধন ক'রে নিজের দেহ-মন-প্রাণকে ভগবানের পায়ে অঞ্জলি দেবার অভ্যাস মেয়েদের আয়ত্ত ক'রে রাখা দরকার।

কন্যাদায়-সমস্যা ও কুমারী-দীক্ষা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বর্ত্তমান কন্যাদায়-সমস্যা কুমারীর দীক্ষাকে আরও বেশী আবশ্যকীয় ক'রে তুলেছে। উপযুক্ত বয়সে মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না, ঘরে বসিয়ে মূর্খ মেয়েকে রাখা বিপজ্জনক, সুতরাং মেয়েদিগকে ধর্ম্মহীন নীতিবোধহীন আধুনিক শিক্ষা দিতে হচ্ছে। তার ফলে মেয়েদের জীবনে এমন অনেক চিন্তাধারার আঘাত হচ্ছে, এমন অনেক নূতন প্রলোভনের সৃষ্টি হচ্ছে, যার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে অপরাজিতা থাকা কষ্টকর। তারই জন্য তাদের মানসিক শক্তিকে নৈতিক সংগ্রামে অটল অচল রাখবার জন্যে—দীক্ষা দিয়ে দেওয়া দরকার। দীক্ষা যদি সুদীক্ষা হয়, দীক্ষা যদি উপযুক্ত জায়গা থেকে পাওয়া যায়, তাহ'লে, আমার ধারণা এই যে, কুমারদের চেয়ে কুমারীদের জীবনের উপরে তার সুপ্রভাব গভীরতর ভাবে হয়ে থাকে।

কিরূপ ব্যক্তি কুমারীকে দীক্ষাদানের যোগ্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কুমারীজীবনেই দীক্ষাগ্রহণ দরকার বটে, কিন্তু যে-কোনও ব্যক্তিই কুমারী মেয়েকে দীক্ষা দেবার উপযুক্ত হ'তে পারেন না। সর্ব্ব-সাধারণকে দীক্ষা দেবার উপযুক্ততা অনেক গুরুই আহরণ ক'রে থাকেন

কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই যে কুমারী মেয়েকে দীক্ষা দেবারও উপযুক্ত হ'বেন, এরূপ মনে করা অসঙ্গত। যার নিজের জীবনের কোনও আচরণের দ্বারা কুমারীর জীবনে কোনও প্রকার চঞ্চলতা সংক্রামিত হবে না, এমন ব্যক্তিই কুমারীকে দীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত গুরু। যাঁরা বাক্যের চপলতা, পরিহাস, রসিকতা প্রভৃতি নিয়ে কুমারীর জীবনের উপরে চপল প্রভাব সৃষ্টি কর্ব্বেন না, তাঁরাই কুমারীকে দীক্ষা দিতে পারেন। দীক্ষার পরে দীক্ষিতার মনটা যেন অসহায় শিশুর মত নির্ভরপরায়ণ হ'য়ে যায়। দীক্ষাদাতা তখন যেরূপ বলেন বা চান, দীক্ষিতা তখন নিজের অজ্ঞাতসারে সেরূপ হ'য়ে যেতে আরম্ভ করে। অনেক সময়ে চেষ্টা ক'রেও সে সেই দিক্ থেকে নিজেকে সাম্‌লে আন্‌তে পারে না। ফলে, যে সকল দীক্ষাদাতার ভিতরে কুমারীকে চুম্বন করা, আলিঙ্গন করা, কুমারীদের নিয়ে জড়াজড়ি করা, তাদের গালে হাত দেওয়া, বুকে হাত দেওয়া, প্রয়োজনে নিষ্প্রয়োজনে আদর-সোহাগ করার রোগ আছে, তাদের কাছে দীক্ষা নিয়ে কুমারীর সর্ব্বনাশের পথই মাত্র পরিষ্কার করা হয়। সুতরাং আদর্শজীবন-যাপনকারী ব্যক্তির সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্য্যন্ত একটা যাকে তাকে দিয়ে কুমারীকে দীক্ষা দেওয়ান অনুচিত।

দীক্ষাদাতার জীবন ত্যাগসুন্দর হওয়া চাই

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দীক্ষাদাতা বল্‌তেই আদর্শজীবন যাপনকারীর দিকে দীক্ষাপ্রার্থীর লক্ষ্য পড়া উচিত। সংযমব্রত যে পালন কর্ব্বে, তার পক্ষে আদর্শ হচ্ছেন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, ভোগবুদ্ধি-পরিবর্জ্জনকারী নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষ। জনক রাজর্ষির দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়ে সকলেরই সংযমব্রতের দৃঢ়তা বর্দ্ধিত হয় না, বরং পরিমিত ভোগ এবং সংযত ইন্দ্রিয়-চর্চ্চার সম্পর্কে একটা প্রশ্রয়ের ভাবই কারো কারো আসে। কিন্তু সর্ব্বত্যাগী, ইন্দ্রিয়-সেবা মাত্রেরই প্রতি বীতরাগ, পূর্ণ আত্মজয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত তেজস্বী সন্ন্যাসীদের কথা ভাব্‌তে গিয়ে তার শিরায় শিরায় ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্কল্প তপ্ত রক্ত-স্রোতের মত প্রবাহিত হয়। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মত তেজস্বী মূর্ত্তির চিন্তা, শঙ্করাচার্য্যের মত সর্ব্বত্যাগসুন্দর দীপ্ত মূর্ত্তির চিন্তায়, প্রভু জগদ্বন্ধুর মত সংযম-

ব্রহ্মচর্য্য-সুরভিত স্নিগ্ধ মূর্ত্তির চিন্তা বাল্যকাল থেকেই অবিরাম যাদের মেরুদণ্ডে মজ্জাসংযোগ করে, তাদের মূর্ত্তিই হয় আলাদা। রাজর্ষি জনকের দিকে দৃষ্টি দিয়ে যারা জীবন গড়ে, অনেকেই তারা ধার্ম্মিকই হয়, কিন্তু পরীক্ষিত সংযমের দোহাই দিয়ে অনেক সময়ে অজ্ঞাতসারে তারা বিষ্ঠারই দাগ সর্ব্বাঙ্গে সাদরে ম্রক্ষিত করে। তারই জন্য আমার ধারণা, দীক্ষিতের বা দীক্ষিতার চ'খের সামনে যাতে ত্যাগ ব্রহ্মচর্য্য সংযমের নি-খাদ স্বর্ণময় জ্বলন্ত আদর্শ দেদীপ্যমান হ'য়ে বিরাজ করে, তজ্জন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীরাই হবেন ত্যাগেচ্ছু, সংযমেচ্ছু, চরিত্র গঠনেচ্ছু যুবক-যুবতীদের দীক্ষাদাতা ও দীক্ষাদাত্রী।

কুমারীকে কিভাবে সংযম-সদাচারের শিক্ষা দিতে হইবে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দীক্ষাদাতা তাঁর দীক্ষিতা কুমারী-শিষ্যাকে দীক্ষার দ্বারাই প্রধানতঃ নিজ জীবনাদর্শে অর্থাৎ সংযমে ও ব্রহ্মচর্য্যে অনুপ্রাণিত ক'রে থাকেন। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁর মৌখিক উপদেশেরও প্রয়োজন আছে, অধিক না হউক, অন্ততঃ ইঙ্গিতে। কুমারীর দেহ যে দেব-মন্দিরের ন্যায় পবিত্র, এই দেহের অলঙ্ঘনীয়ত্ব যে বজায় রাখ্‌তে হবে, শালীনতাকে যে কোনও প্রকারেই পঙ্গু করা চল্‌বে না, এই দেহকে যে পবিত্র তীর্থ-ভূমির ন্যায় সর্ব্বপাপপ্রমুক্ত রাখা চাই-ই, এই বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া একান্ত আবশ্যক হবে। ছেলেদের মধ্যে যে ভাবে ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ বিতরণ করা হয়, তার চেয়ে অনেক শোভন ভাবে, অনেক সন্তর্পণে, অনেক ধীরতা সহকারে ব্রহ্মচর্য্যের জ্ঞান, সংযমের আবশ্যকতা-বোধ, সংযমের স্বরূপ-নির্ণায়ক বিচার-শক্তি, আত্মবিশ্লেষণের নৈপুণ্য উদ্বোধিত ক'রে তুল্‌তে হবে। একজন স্কুল-মাষ্টারের উপদেশের যে প্রভাব, দীক্ষাদাতার বা দীক্ষাদাত্রীর উপদেশের প্রভাব তার শতগুণ। তাই এই দায়িত্ব দীক্ষাদাতাকেই নিতে হবে।

দীক্ষাদাতা কি কুমারীকে সন্ন্যাস বা গার্হস্থ্যের দিকে প্রণোদিত করিবেন ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু তাই ব'লে কোনও কুমারীর ঘাড়ের উপরে

চিরকৌমার্য্যের সঙ্কল্পকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক। কোনও কুমারীকে গার্হস্থ্যের প্রণোদনাও যেমন গুরু দেবেন না, সন্ন্যাসের প্রেরণাও তেমন দেবেন না। তিনি বল্‌বেন, পবিত্র হও, পবিত্র থাক, জগৎকে তোমার উপস্থিতি দ্বারা পবিত্র কর, পবিত্রতা-বৃদ্ধির তুমি সহায়িকা হও। কে কুমারীই আমৃত্যু থেকে যাবে, কে বিয়ে ক'রে গৃহিণী হবে, সেই চিন্তা গুরুর নয়। এই বিষয়ে তিনি থাক্‌বেন একেবারে অপক্ষপাত। কিন্তু একটা গৃহস্থ-ঘরের দায়িত্ব নিয়ে থাকতে হ'লে যে-সব শিক্ষা একটী মেয়ের প্রয়োজন, সেই সকল শিক্ষা চিরকুমারী বা ভবিষ্য-গৃহিণী নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মেয়েরই পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে পাওয়া প্রয়োজন।

বৈধব্য ও সন্ন্যাস প্রায় একই কথা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আর, মেয়েদের পক্ষে গার্হস্থ্য জীবন গ্রহণটাই সাধারণ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। যে মাতৃস্নেহ নিয়ে ওরা জন্মায়, তাতে ওদের কেন্দ্র ক'রেই সমাজ তথা গৃহ গঠিত হয়। এই জন্যই বলা হয়,—গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। আবার বিবাহ থাক্‌লেই কখনো কখনো বৈধব্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সতীত্বের সমাদরকারী সমাজে বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ (স্থল-বিশেষে অনুমোদিত হ'লেও) আদর্শ নয়। অথচ এই আদর্শকে পরিপূর্ণ মর্য্যাদা দানের জন্য সর্ব্বসুখ পরিত্যাগে প্রস্তুত বিধবার অভাব সমাজে নেই। সুতরাং বৈধব্যকে একটা অবস্থা না ব'লে পুরুষের সন্ন্যাসের ন্যায় স্ত্রীলোকের একটা আশ্রম ব'লে মনে করা যেতে পারে। বৈধব্য আশ্রম যেন সন্ন্যাসাশ্রমেরই সমগামী ও প্রতিপূরক আশ্রম। ভোগসুখের সঙ্গে কোনো আপোষ নেই, পরিমিত ইন্দ্রিয়সেবার কোনও দোহাই নেই, পরীক্ষিত সংযমের বাহাদুরী নেই, সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়সেবার সঙ্গে সম্পর্ক-বিরহিত পবিত্র এই বৈধব্যাশ্রম প্রকৃত প্রস্তাবে সন্ন্যাসাশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। তফাৎ শুধু এইটুকু যে, সন্ন্যাসগ্রহণ কত্তে বিরজা-হোম ঘটিত একটা সংস্কারের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, আর বৈধব্যাশ্রম স্বামীর মৃত্যুমাত্র আপনি প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায়। বিধবার এই পবিত্র জীবনাদর্শ সমাজ মধ্যে পূজিত হ'য়ে আস্‌ছে ব'লেই দলে দলে

চিরকুমারীদের আবির্ভাব প্রয়োজন হচ্ছে না। কিন্তু দেখো, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ যদি সার্ব্বজনীনভাবে সচল হয়, তখন নারীর জীবনের পবিত্রতার দৃষ্টান্তকে বজায় রাখ্‌বার জন্য বাধ্য হ'য়ে দলে দলে চিরকুমারীদের আবির্ভাব ঘট্‌বে। কারণ, নারীর জীবনে এই পবিত্রতার অনুশীলনের প্রয়োজন দেশের মঙ্গলেরই জন্য।

আজিকার বালিকার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অতীব বৃহৎ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যখনি আমি কোনও বালিকাকে দেখি, তখন তাকে যেন একটা সুমহৎ ভবিষ্যতের উৎস ব'লে অনুভব করি। যেন ভবিষ্যতের কোনও মহামহীরুহ এই ক্ষুদ্র বীজাঙ্কুরের ভিতর থেকে প্রকাশ পাবে। শুধু একটী বীরপুত্র বা একটী বীরকন্যাই এদের কাছে আমার প্রত্যাশা, তা নয়। আমার আশা, গঙ্গোত্রীর গঙ্গাধারা যেন সুনির্ম্মল প্রবাহে দু'কূল প্লাবিত ক'রে সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী সমুদ্রে গিয়ে মিশ্‌তে পারে, আর পুরুষানুক্রমিকভাবে মানবজাতি এই পবিত্র সলিল আস্বাদন ক'রে ধন্য হয়। আজ্‌কের একটুকু ঐ বালিকার ভিতর কাল্‌কের বিশাল বিবর্ত্তন, দেশব্যাপী আলোড়ন, জগদ্‌গ্রাসী খাণ্ডব-বনের প্রচণ্ড দাহন হয়ত লুকিয়ে আছে। এই বালিকা হয়ত লিটিসিয়া বা রেণুকা। এই বালিকার জঠর থেকে হয়ত নেপোলিয়ন বে'র হ'য়ে দিগ্বিজয় কর্ব্বেন, হয়ত পরশুরাম বে'র হ'য়ে একবিংশ বার পৃথিবীকে অত্যাচারমুক্ত কর্ব্বেন। কি নীতিতে, কি ধর্ম্মে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে, কি কর্ম্মে, কি চিন্তায়, কি আদর্শে, কি আচরণে, হয়ত এই মেয়েটার গর্ভজাত একটা সন্তানই এসে জগদ্ধিতায় এক মহাবিপ্লবের সৃষ্টি কর্ব্বেন, হয়ত বুদ্ধ এর গর্ভে আবির্ভূত হ'য়ে প্রেমধর্ম্মের বিপুল প্লাবনে হিংসাকে ভাসিয়ে দিয়ে যাবেন, হয়ত শঙ্কর এর গর্ভে এসে সন্তানরূপে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে বেদান্তনির্ঘোষে শূন্যবাদীর বৃথা বাগ্‌জাল ছিন্ন ক'রে আসমুদ্র হিমাচলে ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বেন। কুসুম-কোমলা ঐ সুকুমারী বালিকার মাঝে আমি যেন জগজ্জননীর মহিষাসুর-মর্দ্দিনী, রক্তবীজ-সংহারিণী মূর্ত্তির অস্ফুট অস্তিত্ব দেখ্‌তে পাই।

আমি যুবকদিগকেও ভালবাসি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমি যুবকদিগকেও ভালবাসি। একটা যুগের পুরুষেরা, একটা যুগের সমগ্র জাতি যে স্বপ্নকে সার্থকতা দিতে পারেনি, যে স্বপ্নকে সফল কর্ব্বার উপযুক্ত সাহসকে সঞ্চয় কত্তে সমর্থ হয়নি, যুবকেরা হচ্ছে সেই স্বপ্নের জাগ্রত জ্বলন্ত চলন্মূর্ত্তি। একটা মহৎ স্বপ্নকে সত্য ক'রে তুল্‌তে যে সাহসের দরকার, যে সৌন্দর্য্যের প্রয়োজন, যে নিষ্ঠার আবশ্যকতা, যুবকেরাই তার বিগ্রহ। তাই আমি যুবকদের ভালবাসি।

যুবক চিরকালই কুমার থাকিবে না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু যুবক চিরকালই কুমার থাক্‌বে না। অধিকাংশকে গার্হস্থ্যে প্রবেশ কত্তে হবে এবং তাতে দেশ ও জগতের কল্যাণ হবে। সেই সময়ে তামসিক মনোবৃত্তিসম্পন্না স্ত্রীর সংসর্গে যাতে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সচেতনতা হ্রাস না পায়, তার জন্যই কুমারীদের সৎশিক্ষা বিবাহের পূর্ব্বেই প্রয়োজন; যেন, যে কুমারীকেই সে বিবাহ করুক, তার দ্বারাই সে লাভবান্ হয়, বলবান্ হয়।

২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

অদ্য সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীশ্রীবাবা মোচাগড়া আশ্রমে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা আসিলেই মোচাগড়ায় আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া যায়, দলে দলে যুবকেরা আশ্রমের কাজে লাগিয়া যান এবং গ্রামবাসী নরনারীরা বয়োনির্ব্বিশেষে শ্রীশ্রীবাবাকে ঘিরিয়া বসেন, তাঁর মধুময় উপদেশ শুনিবার জন্য।

অলৌকিক শক্তি নহে, বিনয়ই সাধুত্বের বড় সম্পদ

দ্বিপ্রহরে হোম্‌না অঞ্চল হইতে একজন সাধু আসিলেন। তাঁহার কিছু কিছু পরচিত্ত-জ্ঞান (thought reading) ও ভবিষ্যৎ বলিবার শক্তি আছে বলিয়া লোকমুখে প্রচার আছে। কিন্তু সাধুটী অত্যন্ত বিনয়ী। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আপনার অলৌকিক শক্তি আছে শুনেছি। কিন্তু আপনার বিনয় আমি স্বচক্ষে দর্শন কচ্ছি। ভিতরে বাইরে যার অকৃত্রিম বিনয়, তিনিই সাধু নিঃসন্দেহ। আপনাকে দেখে আমার অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে।

গুরু-পরীক্ষার আবশ্যকতা

কথায় কথায় গুরু-নির্ব্বাচন-প্রসঙ্গ উঠিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যাকে তাকে গুরু করা ঠিক্ নয়, বরং এরূপ ব্যাপারকে নির্ব্বুদ্ধিতার ফল বলা যেতে পারে। শিষ্য জানে না যে, তথাকথিত গুরু তার জীবনের বিকাশে সহায়ক হবে, না, শত্রু হবে। কিন্তু মাথা কেটে তার পায়ে দিয়ে দিল এবং পরে অনুতাপ কর্ব্বার সুযোগ নিল। অনুতাপটা পরে না ক'রে, আগেই বরং প্রতীক্ষা ক'রে গুরুনির্ণয় ঠিক্ ছিল। হুজুগে কখনও এত বড় ব্যাপারের চূড়ান্ত মীমাংসা কত্তে যাওয়া ঠিক্ নয়। অনেক গুরুদেবেরা কৌশল ক'রে, জোর ক'রে, ফন্দী ফিকির ক'রে লোককে শিষ্য করেন, শিষ্যের জীবনের লক্ষ্যের দিকে না তাকিয়ে নিজের গরজে তার গুরু হন, শিষ্যের কাছে আগে নিজের প্রকৃত পরিচয়টা সম্পূর্ণরূপে বিস্তার না ক'রেই নিজের গুরুত্বকে দীক্ষা দ্বারা পাকা ক'রে নেন এবং পরে যখন শিষ্য নিজের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যের সঙ্গে গুরুদেবের জীবনকে বা উপদেশকে আদর্শের দিক্ থেকে মিলাতে না পে'রে হা-হুতাশ কত্তে আরম্ভ করে, অন্তর্জ্জালায় জ্বলে-পুড়ে ছট্‌ফট্ কত্তে থাকে, তখন ভালমানুষটী সাজেন। শত শত জীবনে আজ এই ঘটনা ঘট্‌ছে। তারই জন্য প্রত্যেক দীক্ষার্থীর উপযুক্ত কাল গুরু-পরীক্ষা করা দরকার। দীক্ষার ব্যাপারে "ওঠ্ ছুঁড়ী তোর বিয়ে"—নীতি অত্যন্ত বিপজ্জনক। দীক্ষা বরং দু'দশ বৎসর না হ'ল, তবু তাড়া-হুড়া কত্তে গিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করা ঠিক্ নয়। কন্যার বিবাহে যেমন পাত্র-নির্ব্বাচন একটা অতি গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার, দীক্ষা-গ্রহণেও তেমন দায়িত্ব রয়েছে। যাকে তাকে বিবাহ কর্ল্লে যেমন অনেক সময় বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা করা অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে থাকে, যাকে তাকে গুরুত্বে বরণও তদ্রূপ।

শিষ্যের আত্ম-পরীক্ষার আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শুধু-গুরু-পরীক্ষারই প্রয়োজন, তা নয়। শিষ্যেরও আত্ম-পরীক্ষার প্রয়োজন। দীক্ষা নিলেই শিষ্য হয় না, অবিচারিত চিত্তে ধর্ম্মসাধন-বিষয়ে গুরুর আদেশ পালনের জন্য সুগভীর সঙ্কল্প ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা

চাই। এ দৃঢ়তা কি তোমার আছে? এইটুকু পরীক্ষা কত্তে হয়। গুরু যে উপদেশ দেবেন, তা নিঃসঙ্কোচে পালনের কি তোমার তীব্র ইচ্ছা জেগেছে? অনেক শিষ্যেরই এরূপ তীব্র ইচ্ছা জাগে না, অথচ দীক্ষা গ্রহণ ক'রে একটা ছেলেখেলা করে। কিন্তু এই ব্যাপারেও শিষ্যের দায়িত্বের চেয়ে গুরুর দায়িত্বই অত্যধিক। অজ্ঞান ব'লেই জ্ঞানলাভের লোভে লোকে শিষ্য হয়, অতএব তার আচরণে ভ্রম-ত্রুটী ত' থাক্‌বেই। কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় কারো গুরুপদবী গ্রহণের অধিকার নেই। সুতরাং শিষ্যের মঙ্গলামঙ্গল ভাল ক'রে না বুঝে যে ব্যক্তি শিষ্যকে আগেই মন্ত্র দিয়ে দীক্ষা দিয়ে ফেলেন, তিনি অনেক সময়ে শিষ্যের অনিষ্ট সাধন করেন। এক কণা কুণ্ঠা বা শঙ্কা যে শিষ্যের মনে আছে, তাকে দীক্ষা দেওয়া অধিকাংশ স্থলে পাপ।

মন্ত্র-চৈতন্য

সাধুজী খুব উৎসাহের সহিত শ্রীশ্রীবাবার কথাগুলি সমর্থন করিতে লাগিলেন এবং কথা ক্রমশঃ মন্ত্রসাধনের নিগূঢ় বিষয় সমূহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সাধুজী মন্ত্র-চৈতন্য সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেউ কেউ মনে করেন, শারীরিক প্রক্রিয়া-বিশেষের সঙ্গে ইষ্টনামকে যুক্ত করাই মন্ত্র-চৈতন্য। যথা, মুদ্রাবিশেষ বা শ্বাস-প্রশ্বাস। মন্ত্র-স্মরণ মাত্র মন্ত্রের যে প্রাণস্বরূপ অবিশ্রান্ত অখণ্ড নাদ, তাকে শ্রবণ করাই প্রকৃত মন্ত্র-চৈতন্য। অবিরাম নামের সেবা কত্তে কত্তেই তা হয়। সর্ব্ব-সংশয়-বিরহিত হ'য়ে নাম কত্তে কত্তে নামের প্রাণ আপনি সাধকের কাছে ধরা দেয়। শ্বাস-প্রশ্বাসকে নামের প্রাণ বলা ভুল। শ্বাস-প্রশ্বাস স্তব্ধ হ'য়ে গেলেও যে অনাহত মহাধ্বনি নামের ভিতরে নিজের শক্তিতে বিরাজ করেন, তাই হচ্ছেন মন্ত্রের প্রাণ, তাই হচ্ছেন মন্ত্রের চেতনা।

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা মোচাগড়া আশ্রম হইতে রহিমপুর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অদ্য বৃহস্পতিবার। অতএব সকলকে লইয়া শ্রীশ্রীবাবা সমবেত কীর্ত্তনোপাসনাদি করিলেন এবং উপাসনান্তে কিছু উপদেশ প্রদান করিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় সাধক ননীলাল কুণ্ডের কথা উঠিল।

বাল-তপস্বী ননীলাল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমরা প্রাক্তন শুভকর্ম্মের মঙ্গলময় ফল নিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছ। তাই তোমাদের সৎপ্রসঙ্গে রুচি, সৎনামে রুচি, সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরে অনুরাগ। আবার এজন্মে যে সব সৎ-চর্চ্চা কর্ব্বে, তার শুভফল তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে পরজন্ম পর্য্যন্ত যাবে। কণামাত্র সৎকার্য্য কর্লে'ও তার সুফল তোমাদিগকে কখনও পরিত্যাগ কর্ব্বেনা। তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আমি দেখেছি আমার বাল্যকালে স্বর্গীয় ননীলাল কুণ্ডের ভিতর। ননীলালের সঙ্গে তার চেয়ে দুই তিন বৎসরের বড় একটী ব্রাহ্মণ সন্তানের গভীর প্রেম ছিল। এক বন্ধু অপর বন্ধুর বিচ্ছেদ সহ্য কত্তে পাত্তেন না। বন্ধুটী একদিন তাঁর বিদ্যালয়ের একজন ধার্ম্মিক শিক্ষকের নিকট উপদেশ পেলেন যে, এক লক্ষ-বার ভগবানের নাম জপ করলে সিদ্ধিলাভ হয়। সিদ্ধিলাভ যে কি বস্তু, সেই বিষয়ে বন্ধুটীর কোনও ধারণাই ছিল না, তবু এই কথা শুনে তাঁর নামজপে খুব রোখ্ গেল। প্রথমে তিনি সরস্বতী নাম আরম্ভ কর্লে'ন এবং এক লক্ষ জপ হবার পরে আর একটী নাম ধর্লে'ন। এভাবে নানা নাম জপ্‌তে জপ্‌তে একদিন হরিনাম সুরু কর্লে'ন। ননীলাল একাজে সঙ্গী হ'লেন। বন্ধুটী ননীলালকে বল্লেন,—নাম জপের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ আর জগতে কিছু নেই। ননীলাল জিজ্ঞাসা কর্লে'ন,—কোন্ নাম? বন্ধু বল্লেন,—যে নাম ইচ্ছা, আমি ত একটার পর একটা ক'রে সব নামই লক্ষবার ক'রে জপ কচ্ছি। ননীলাল তবু জিঁদ্ কত্তে লাগ্‌লেন জান্‌বার জন্যে যে, সে কোন্ নাম জপ কর্ব্বে। বন্ধু বল্লেন,—আমি যেটি কচ্ছি, সেইটীই কর, আমি এখন হরিনাম জপ্‌ছি। আর কথা নেই, ননীলাল তার কাজে লেগে গেল। এই দিন থেকে ননীলাল তার বন্ধুকে গুরু ব'লে মনে কত্ত। গুরুশিষ্যে নামজপের প্রতিযোগিতা আরম্ভ হ'ল। একদিন ননীলাল বল্লে,—অমি গত রাত্রে তক্তপোষের নীচে আসন পেতে নামজপ ক'রেছি। বন্ধু অমনি পরের রাত্রিতে ঢেঁকিশালের ঢেঁকীর নীচে নাম কত্তে ব'সে গেলেন। শুনে ননীলালের তপস্যার জিদ আরো চ'ড়ে

গেল, ননীলাল গিয়ে নামজপ কত্তে বস্‌ল ঘরের 'কারে' *। আরও নির্জ্জন স্থান সংগ্রহের জন্য বন্ধু গিয়ে বস্‌ল 'কারের' উপরে রক্ষিত চাউল রাখ্‌বার জালার ভিতরে। এই নির্জ্জন স্থানটী দুজনেরই খুব পছন্দ হ'ল, কিন্তু গৃহ-পরিজনদের চক্ষু এড়িয়ে বেশী দিন এই নির্জ্জন স্থানটীতে সাধন করা চল্‌ল না, সুতরাং ননীলাল গিয়ে খুঁজে বের্ কর্‌ল এক বাঁশ ঝাড়ের মাঝখান, যেখানে লোক যায় না। বন্ধু গিয়ে বে'র করে নিলেন এক বাতাবী লেবুর গাছের তলায় শেয়ালের গর্ত্ত। এই ভাবে গুরুশিষ্যে প্রবল সাধন-প্রতিযোগিতা চল্‌ল। ঐ অল্প বয়সেই ননীলালের ভিতর যেন এক ঐশ্বরিক জ্যোতি ফুট্‌তে আরম্ভ ক'রেছিল। এমন সময়ে তার মরদেহের মৃত্যু হ'ল। সে অনন্ত অমৃতের পথে চলে গেল। দশ বছরের শিশুর ভিতরে এরূপ প্রেম আসে পূর্ব্বজন্মের তপস্যার ফলে। তোমরাও যে ভগবানকে ভালবাস্‌তে চাচ্ছ, তাতে তোমাদের পূর্ব্বজন্মের সুতপস্যারই পরিচয় পাচ্ছি।

তপস্যা কর, পুত্রগণ, তপস্যা কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পুত্রগণ, তপস্যা কখনও ব্যর্থ যায় না। তোমরা তপস্বী হও, তোমরা সাধক হও, সাধনের আনন্দে হাস্‌তে হাস্‌তে এই নশ্বর জগতে অবিনশ্বরত্ব লাভ কর। ভালবাস, ভালবাসার পরমধন পরমেশ্বরকে, অনুক্ষণ তাঁর নামের স্মৃতি অন্তরে জাগাও, আর তাঁর নামের সঙ্গে সঙ্গে নিজের সকল সত্তা তাঁতেই বিসর্জ্জন দাও। নিজের সর্ব্বস্ব তাঁকে দিয়ে হও তাঁর, তোমার ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছার অধীন হোক্, তোমার জীবন তার জীবনে বিলীন হোক্। তপস্যা কর পুত্রগণ, তপস্যা কর। এক কণা তপস্যায় কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ধার হয়। এক কণা অনুরাগ কোটি-জন্মের পিপাসা মিটায়। তাঁর প্রেমে হৃদয় রঙ্গিয়ে ফেল, তাঁর স্নেহে নিজ ব্যক্তিত্বকে ডুবিয়ে দাও।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা দারোরা গ্রামে শ্রীযুক্ত রাজবিহারী সেন চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে আসিয়াছেন। গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অনুরোধে শ্রীশ্রীবাবা

* অর্থাৎ টিনের ছাদের নীচের পাটাতন, যাহার উপরে গৃহস্থ ঘরের বহু জিনিষপত্র রক্ষিত হয়।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র ব্রহ্মচারী মহাশয়ের দুর্গাদালানে গমন করিলেন এবং সমাগত জনগণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

গ্রামের শত্রু দলাদলি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অস্বাস্থ্য গ্রামের শত্রু, দারিদ্র্য গ্রামের শত্রু, অশিক্ষা গ্রামের শত্রু, কিন্তু সবচেয়ে বড় শত্রু দলাদলি। আপনারা এই জিনিষটীকে গ্রাম থেকে নির্ব্বাসিত করুন। রহিমপুর উৎসবের সময়ে আমি বড় বড় অক্ষরে উৎসব-প্রাঙ্গনে লিখে রেখেছিলাম,—"গ্রামের শত্রু দলাদলি।" সেই কথাটি আপনারা ঘরে ঘরে লিখে রাখুন। দলাদলি পরম শত্রু, এই শত্রুকে বধ কর্ব্বার জন্য সকলে বদ্ধপরিকর হউন, একজন আর একজনকে এই কার্য্যে সাহায্য করুন, একজন আর একজনকে কায়মনোবাক্যে উৎসাহিত করুন। তাতে প্রত্যেকের উপকারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র গ্রামের উন্নতি সাধিত হবে। এমন কি প্রতিবেশী গ্রামগুলির ভিতরেও এ উন্নতির আবহাওয়া গিয়ে সকলের দেহ-মন স্পর্শ কর্ব্বে।

দলাদলির উৎস

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কর্ত্তৃত্বলিপ্সাই দলাদলির মূল উৎস। সবাই ভাবে,—'আমিই কর্ত্তা হবার যোগ্য, হুকুম জারি কর্ব্বার জন্যই আমার জন্ম, এজন্য আমার আর কোনও পৃথক্ তপস্যার প্রয়োজন নেই।' এইরূপ মনোভাব থেকেই দলাদলির সৃষ্টি ও পুষ্টি ঘটে। আমার মত কেন খাটবে না, আমার কথা কেন রইল না, আমি কি অমুকের চেয়ে ছোট, আমি তমুকের চেয়ে কিসে কম,—এই জাতীয় আত্মাভিমান থেকেই দলাদলি হয়। প্রতিভাবান ও শক্তিশালী লোকেরা এইভাবে দলাদলির উৎস অন্বেষণ ক'রে বের করে, আর প্রতিভাহীন দুর্ব্বল লোকগুলি বক্তৃতায় মুগ্ধ হ'য়ে বা কোনও স্বার্থের খাতিরে সেই উৎসের জল পান ক'রে কলহে প্রমত্ত হয়। শত শত লোক মাতে আর দু'জন একজন লাভবান্ হয়। এর মত ভয়ঙ্কর জিনিষ কি আর কিছু আছে? আপনারা আপনাদের গ্রাম থেকে এই জিনিষটীকে দূর করুন।

আদর্শের-সন্ধানে

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আদর্শহীনতাই দলাদলিকে সহজে পাকিয়ে তোলে। আপনাদের পল্লীর প্রত্যেক নরনারীকে আপনারা উচ্চ আদর্শ দান করুন। প্রতি পল্লীবাসী ব্রতধারী হোক, প্রত্যেকে সঙ্কল্প করুক,—'এই পল্লীতে একজন-কেও অশিক্ষিত থাকৃতে দিব না, একজনকেও বিনা চিকিৎসায় মরতে দিব না, একজনকেও আলস্যে দিন কাটাতে দিব না, একজনকেও অনাহারে থাকৃতে দিব না।' আর্ত্তত্রাণের এই মহাযজ্ঞের অগ্নি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তের ঘৃতাহুতি পেয়ে দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠুক,—দলাদলির কলহ-কচায়ন তাতে চিরতরে ভস্মীভূত হ'য়ে যাক্।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল শ্রীশ্রীবাবা ওজস্বিনী ভাষায় দলাদলি সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহা ক্ষণিকের জন্য হইলেও সকলের প্রাণে যেন এক দিব্য প্রেরণার সঞ্চার করিল। দুঃখের বিষয় এমন অপূর্ব্ব উপদেশা-বলির বিস্তারিত ভাষণ যথাযথ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় নাই।

সদ্গুরুর আত্মবিলোপ

দুইটী যুবকের একান্ত আগ্রহে শ্রীশ্রীবাবা তাহাদিগকে দীক্ষাদান করিলেন। দীক্ষান্তে বলিলেন,—যে অমৃতময় অখণ্ড-নাম লাভ কর্লে, প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে অবিরাম এর সাধনা কর, সাধনার ফলে তোমাদের অন্তরের অবিকশিত সব শক্তি জাগরিত হবে, তোমরা নিজেদের স্বরূপ চিন্তে পার্ব্বে; কিন্তু বাবা, তোমাদের বাহ্য আগ্রহ দেখেই আমি তোমাদের দীক্ষা দিয়েছি, অন্তরের আগ্রহের কোনও প্রমাণ তোমরা নিয়ে আমার কাছে আসনি। তোমাদের হিত হবে, এই বুদ্ধিতেই তোমাদের কাছে জগতের শ্রেষ্ঠ বস্তু পরিবেশন করেছি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা এই নামের ভিতর দিয়ে পরমামৃত আহরণে সমর্থ হও। কিন্তু বাবা, আর একটী কথাও ব'লে রাখ্ছি, আমি তোমাদের স্বাধীনতা হরণ করি নাই। আমার মতে আমার পথে চল্তে যেদিন বাধা হবে, দ্বিধা হবে, এ পথের সাথে তোমার জীবনটাকে খাপ খাইয়ে নিতে যেদিন কিছুতেই পেরে উঠ্বে না, আমার কথা শুন্লে যেদিন

মিথ্যার সাথে আপোষ কচ্ছ ব'লে মনে হবে, সেদিন তৎক্ষণাৎ আমাকে বিনা দ্বিধায় ছেঁড়া কাঁথার মতন পরিত্যাগ ক'রো। সেদিন যে মুহূর্ত্তে দেখ্‌বে, আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তোমাকে সাহায্য কত্তে ইচ্ছুক এবং তোমারও মন তাঁর সাহায্য গ্রহণ কত্তে ইচ্ছুক, তখন আমার জন্য মনের কোণে এক কণা মায়াও রেখোনা। যেমন, গরুর গাড়ীতে ক'রে লোক ষ্টেশনে যায় এবং ষ্টেশনে গিয়ে কলের গাড়ী ধরে। মানুষের 'স্বাধীনতাকে স্ফূরিত কর্ব্বার জন্যই আমি তার গুরু, পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ কর্ব্বার জন্য নয়।

বোরারচর

৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

খুব ভোরে শ্রীশ্রীবাবা বোরারচর রওনা হইলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র সাহা শ্রীশ্রীবাবাকে দারোরা হইতে নিতে আসিয়াছেন। রাণীমুহুরী গ্রামের একটী যুবক বলিতে লাগিলেন, কি করিয়া একটী আচার্য্য ব্রাহ্মণের ছেলে একটী অন্য ধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবার লোভে পড়িয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে এবং পরিশেষে ইতো নষ্ট স্ততোভ্রষ্ট হইয়া হায় হায় করিতেছে।

অসাত্ত্বিক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ইন্দ্রিয়সুখের লোভে প'ড়ে যারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, তাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চারিটীই যায়, একটীকেও তারা পায় না। দেশ-প্রচলিত বা সমাজ-প্রচলিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে ধর্ম্মান্তর গ্রহণের অধিকার প্রত্যেকের আছে, যদি ধর্ম্মলাভের জন্যই তার প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে থাকে। সুন্দরী রমণী পাব, বিপুল সম্পত্তি পাব, সামাজিক প্রভুত্ব পাব, বা কারো উপরে আক্রোশ মিটাবার সুযোগ পাব, এসব বুদ্ধিতে যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ, একে ধর্ম্ম-গ্রহণ না ব'লে অধর্ম্ম-গ্রহণ বলা উচিত। এভাবে যারা ধর্ম্মান্তরের পথে যায়, তারা নিজেদের পায়েও কুড়ুল মারে, জগৎকেও বিন্দুমাত্র লাভবান্ করে না। ধর্ম্মান্তর গ্রহণে যদি দেহ, মন, চিত্ত, আত্মা সব কিছুর যুগপৎ উন্নতি-লাভের সূচনা না হ'ল, তবে বুঝ্‌তে হবে, পরম-কুশলের পথ এটা নয়।

সাত ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা বোরারচর গ্রামে আসিয়া পৌছিলেন। সুসজ্জিত মণ্ডপে গ্রামবাসিগণ বহুশ্রুত আচার্য্যের পাদপদ্ম দর্শন ও উপদেশাদি গ্রহণ করিলেন। গ্রাম্য পাঠশালাটীর উন্নতিকল্পে শ্রীশ্রীবাবা নানাবিধ হিতকর কথা বলিতে লাগিলেন।

দুঃখই জীবনের স্পর্শমণি

শ্রীযুক্ত হীরালাল সাহা দীর্ঘকাল যাবৎ অতি কঠিন রোগে ভুগিতেছেন। দ্বিপ্রহরে তিনি শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্মে রোগের বিস্তারিত বিবৃতি জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই দুঃখের কি আর শেষ হবে না বাবা?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভয় কি বাবা, দুঃখ কখনো অনন্ত নয়, আনন্দই অসীম অনন্ত। যত দুঃখই আজ পাও, অনন্ত অমৃতত্বই তোমার চরম প্রাপ্তি। দুঃখ যতই অসহনীয় হোক্, বিশ্বাস হারিও না। বিশ্বাস কর, ভগবানের অমৃতময় নামে। দুঃখ তোমাকে ভগবানের কথা বারংবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, তোমাকে অমৃতের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। দুঃখই জীবনের স্পর্শমণি।

দুঃখ-বরণই দুঃখজয়ের উপায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দুঃখ যখন অসহনীয় হবে, তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাবে,—'হে ভগবান, আরো দুঃখ আমাকে দাও যেন এই দুঃখটুকু ক্ষুদ্র হ'য়ে, তুচ্ছ হ'য়ে, নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়।' দুঃখকে যে বরণ করে, কোনো দুঃখ তার থাকে না।

প্রকৃত জীবন ও প্রকৃত মৃত্যু

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা কয়েকটী পল্লীবাসীর বাড়ীতে বেড়াইতে বাহির হইলেন। সকলের শেষে যেই বাড়ীটীতে গেলেন, সেই বাড়ীতে বহু স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া শ্রীশ্রীবাবার মধুময় উপদেশ শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—ভগবানের মধুময় নাম ভুলে থাকাই মৃত্যু, আর তাঁর নামকে স্মরণে জাগিয়ে রাখাই জীবন। মৃত্যু জীবনকে অবিরাম গ্রাস কত্তে চাচ্ছে, তোমরা প্রাণপণে জীবনকে আঁকড়ে

ধ'রে থাক। মৃত্যু তার দূত স্বরূপে অলসতা, অহমিকা ও বিষয়াসক্তিকে প্রেরণ কচ্ছে। তোমরা এদের ফাঁদে পা দিওনা। অনুক্ষণ মনকে প্রবল পুরুষকার সহকারে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত রাখ্‌তে চেষ্টা কর। এখনো যে মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে মুক্তিলাভ কত্তে পার নাই, তার জন্য অন্তরে লজ্জা অনুভব কর এবং অহঙ্কার বিসর্জ্জন দাও। যে সংসারের মাঝে ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন, সেই সংসারের কর্ত্তব্য সমূহ পালন কর্ব্বার জন্য যে বিষয়-বিত্ত সংগ্রহ আবশ্যক, তা কর্ত্তব্য-বোধে সংগ্রহ কর, কিন্তু আসক্তি-বর্জ্জিত হ'য়ে। কর্ত্তব্য-বোধেই ব্যবসায় কর, বাণিজ্য কর, কৃষি কর, শিল্প কর, কিন্তু অর্থকেই পরমার্থ ব'লে জ্ঞান না ক'রে।

বড়ইয়াকুরি

৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

অদ্য প্রাতে শ্রীশ্রীবাবা বড়ইয়া কুড়ি গ্রামে আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র সাহা ও তাঁহার পুত্রদ্বয় শ্রীশ্রীবাবার পরিচর্য্যা করিতেছেন। গ্রামের যুবকেরা আসিয়া শ্রীশ্রীবাবার নিকটে গ্রামের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা বর্ণনা করিলেন। এই পল্লীতে এক শ্রেণীর গোসাঁইরা ধর্ম্মের নামে অজ্ঞ, মূর্খ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর মধ্যে ব্যভিচারের প্রসার সাধনে চেষ্টা করিতেছে।

প্রকৃত যৌবনের পরিচয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই মহা-অনর্থকর কুসংস্কারকে দূর কর্ব্বার জন্য যে তোমরা বদ্ধপরিকর হ'য়েছ, এতেই বুঝা যাচ্ছে যে তোমরা যুবক। ছাগ-চরিত্রের অনুবর্ত্তনে নয়, অকল্যাণকে ধ্বংশ করার উদ্যমেই যৌবনের প্রকৃত পরিচয়। দেশ ও সমাজের প্রকৃত শক্তি নির্ভর করে তোমাদের উপরে। তোমরা যদি দেশ ও জাতির ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার সহায় হও, তাতে ধ্বংশের পথেই দেশকে এগিয়ে দেওয়া হবে। ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার প্রশ্রয় তোমরা কোনও প্রকারেই দিতে পার না। আর্টের নামে নয়, আমোদের নামে নয়, স্বাধীনতার নামে নয়, যুগধর্ম্মের নামে নয়, ধর্ম্মের নামে নয়। যেখানে

ইন্দ্রিয়ের সেবা সবল সতেজ বংশধারা প্রবাহিত করার জন্য আবশ্যক, মাত্র সেইখানে ছাড়া অন্যত্র যে কোনও নামে, যে কোনও রূপে, যে কোনও ভঙ্গীতে, যে কোনও অজুহাতে ইন্দ্রিয়ের চর্চ্চা প্রশ্রয় পাবে, তোমরা মনুষ্যত্বের পানে তাকিয়ে তাকে প্রতিরোধ কর্ব্বে। এতেই তোমাদের যুবকত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেওয়া হবে।

ধর্ম্মের নামে ব্যভিচারের আবির্ভাবের মূল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার সমাজে কি ক'রে এসেছে জানো? দুই পথে এ পাপ সমাজে ঢুকেছে। একটী পথ হ'ল এই যে, ধর্ম্মের প্রসারেচ্ছু ব্যক্তি লক্ষ্য কর্‌লেন যে, শত উপদেশ দাও, শত সাবধান কর, লোকে ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা ছাড়তে পাচ্ছে না। সুতরাং তিনি বল্লেন,—"খেয়ে ইলিশের ঝোল, নিয়ে রমণীর কোল, তবু একবার বোল, হরিবোল্, অর্থাৎ ভোগের ভিতর থেকে যখন উঠ্‌তেই পাচ্ছনা, তখন ভোগও কর, সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকেও স্মরণ কর; ফলে, কালক্রমে ভগবানের নামেরই জয় হবে, নামের শক্তি কামের প্রভাবকে অভিভূত কর্ব্বে, তুমি পূর্ণ-সংযমী পূর্ণ-সদাচারী পূর্ণ-প্রেমিক হতে পার্ব্বে।" এঁরা sexuality (ইন্দ্রিয় চর্চ্চা)কে religiosise (ধর্ম্মসমন্বিত) কর্‌বার চেষ্টা করলেন। এর ফল স্থলবিশেষে ভালও হ'ল, স্থলবিশেষে মন্দও হ'ল। কিন্তু আর একদল কর্ল্লে religion (ধর্ম্ম) কে sexualise (ইন্দ্রিয়চর্চ্চা সমন্বিত)। এর ফল ভাল হ'ল না এক কণাও, মন্দই হ'ল ষোল' আনা। এরা দেখ্‌লে, ধর্ম্মবোধ মানবের আদিম সংস্কার, যার দরুণ পাপ-পুণ্যের বিবেচনা অন্তরে জাগে, ফলে পাপ থেকে মানুষ দূরে থাকৃতে চায়, পুণ্যকে অর্জ্জন কত্তে উৎসাহী হয়। এরা নিজেরা দৈববশাৎ বা পুরুষকার প্রভাবে সমাজের লোকের ধর্ম্মগুরুর আসন অধিকার করেছে, অথচ চিত্তে অসংযত বৃত্তিগুলি নিজেদের শাসনাধীন হয়নি। ফলে, ধর্ম্মের চমকদার উপদেশ সমূহ বর্ষণের কালে লোকের চিত্ত-চমৎকার সৃষ্টি হ'লেও মাঝে মাঝে নিজের স্খলিত অসম্বৃত আচরণগুলি শিষ্যদের মধ্যে তীব্র সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি কত্তে আরম্ভ কর্ল্ল। তখন এক একটী অনাচারের

এক একটী মনোরম ব্যাখ্যা প্রদান করা হ'তে লাগ্‌ল। কুমারী মেয়েকে যে-কেউ চুম্বন কল্লে তা দোষের, কিন্তু গুরুদেব যদি সেই কাজটী করেন, তবে হ'তে লাগল সেইটী আধি-দৈবিক কৃপা। পরস্ত্রীর সাথে একাকী একঘরে বাস কল্লে তা হয় নিন্দার, কিন্তু গুরুদেব যদি তা করেন, তবে হতে লাগ্‌ল অনুগ্রহ। অজ্ঞ মূর্খ কুসংসারাচ্ছন্ন শিষ্যশিষ্যাদের চ'খে এইরূপ এক একটা ব্যাখ্যার ঠুলি বেঁধে দিয়ে—আরম্ভ হ'ল অতি কদর্য্য সমাজ ধ্বংশকারী মহাপাপের অনুষ্ঠান। এভাবে পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত সমাজের ভিতরে অতি তীব্র কাম-হলাহলের দ্রুত প্রসার হচ্ছে এবং গণিকা-গৃহই যে-সব কদাচারের উপযুক্ত স্থান, সেই সব কদাচার নানা ধর্ম্মানুষ্ঠানের বাহ্য আড়ম্বরে আবৃত ক'রে করা হচ্ছে। তোমরা এসব পাপকে সমূলে উচ্ছিন্ন কর্ব্বার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও।

ধর্ম্মের সহিত অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবার আপোষ অসম্ভব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধর্ম্মমত যত উঁচু দরেরই হোক, অবৈধ ইন্দ্রিয়-চর্চ্চার সঙ্গে যদি আপোষ রাখ্‌তে হয়, তবে ধর্ম্ম-পথ উন্নতির সোপান না হ'য়ে পতনের পিচ্ছিলতায়ই পূর্ণ হবে। বিবাহিত স্বামি-পত্নীর বৈধ সহবাস ব্যতীত, অন্য কোনও প্রকার ইন্দ্রিয়-মিলনকে কোনও প্রকারেই প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে না। প্রশ্রয় দিলেই সেই ধর্ম্মাবলম্বীরা অতি দ্রুত গতিতে নরকের দিকে অগ্রসর হবে। দেখ্‌তে না দেখ্‌তে তারা বর্ব্বরের সমাজে পরিণত হবে। পর-নারী-সংসর্গ ক'রে যদি কোনও বৈষ্ণব মনে করে যে সে ধর্ম্মাচরণ করেছে, তবে তার ধর্ম্ম তাকে রসাতলে নেবে। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী কাউকে যদি ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বী করা যায়, তা হ'লে অশেষ পুণ্য হয় ব'লে মুসলমানরা বিশ্বাস করে। কিন্তু এই পুণ্য অর্জ্জনের লোভেও যদি কেউ পর-নারী-ধর্ষণ করে, আর তার সমাজ যদি এই কাজটাকে জঘন্য পাপাচার ব'লে ঘোষণা না করে, মোটের উপর প্রশংসেয় বা পুণ্য ব'লেই গণনা করে, তা হ'লে এই মহাভ্রান্তির জন্যই সেই সমাজের প্রকৃত ধর্ম্ম জগৎ থেকে লোপ পাবে। অবৈধ ইন্দ্রিয়-চর্চ্চার সঙ্গে যে সম্প্রদায় বা সমাজ আপোষ কর্ব্বে, সে তার নিজ পায়ে নিজে কুঠার হান্‌বে, নিজের ধ্বংস নিজে সৃষ্টি কর্ব্বে।

দেবদাসী প্রথা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—উদ্দেশ্য সৎ হ'লেও, ইন্দ্রিয়-সেবার সঙ্গে যুক্ত হ'লে তা' পূর্ণ হতে পারে না। দক্ষিণাত্যের দেবদাসী প্রথাটা কোনও জঘন্য উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্ট হয়নি। চিরকৌমার-ব্রতধারিণী থেকে ভগবানের পূজায় জীবন উৎসর্গ ক'রে দেবে, এই মহদুদ্দেশ্যেই পূর্ব্বকালে পিতামাতারা তাদের কন্যাকে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ ক'রে মন্দিরে সেবিকারূপে পাঠিয়ে দিতেন; কিন্তু মন্দিরের পুরোহিতেরা এই সব কুমারীদের জীবনকে পরিপূর্ণ পবিত্রতার মহিমার মধ্য দিয়ে সার্থক কর্ব্বার যে দায়িত্ব, তা পালন কত্তে পারে নি। তারা নিজেদের জৈব দুর্ব্বলতাকে ধর্ম্মের অঙ্গ ব'লে ব্যাখ্যা ক'রেছে এবং এই ভাবে একটা গণিকার শ্রেণী-বিশেষ সৃষ্টি ক'রেছে। এজন্যই আজ দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে এত আন্দোলন ও আইন-কানুন প্রবর্ত্তনের চেষ্টা। কোথায় দলে দলে চিরকৌমার্য্য-ব্রতধারিণী, সংযমশালিনী, তপস্বিনী দেহ-মন-প্রাণ ভগবানকে সম্যক্ সমর্পণ ক'রে ব্রহ্মবীর্য্যে বীর্য্যবতী হ'য়ে নিজেদের সাধনার সৌরভে জগৎকে আমোদিত কর্ব্বেন, না কোথায় রতিরসবতী লাম্পট্য-লাস্যময়ী নর্ত্তকীরা মুনিজনের ভগবন্মুখী চিত্তবৃত্তিকে টেনে এনে নরকের পচা দুর্গন্ধে ডুবিয়ে রাখ্‌ছে। মহদুদ্দেশ্যে কন্যাকে উৎসর্গ ক'রেও সমাজ তাকে অবৈধ ইন্দ্রিয়-চর্চ্চার কদর্য্য আবেষ্টন থেকে মুক্ত কত্তে চায় নাই, বরং ধর্ম্মের নামে এই জঘন্য কদাচারকে প্রশ্রয় দিয়েছে। ফলে, উৎসর্গীকৃতা কন্যার জীবন যেমন ব্যর্থ হ'য়েছে, জাতিও তেমন দুর্ব্বল হ'য়েছে।

চালুনি কর্ত্তৃক সূঁচের ছিদ্রান্বেষণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অবশ্য, এই দেবদাসী-প্রথা এবং এই জাতীয় কতকগুলি ব্যাপার নিয়ে পাশ্চাত্য ছিদ্রান্বেষণকারীরা ভারতবর্ষকে সমগ্র পৃথিবীর কাছে হেয় কর্ব্বার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা হ'য়েছে যেন, সূঁচের ছিদ্র সংখ্যা গণনার জন্য বহুচ্ছিদ্রযুক্ত চালুনীর হাস্যকর চেষ্টার মত।

আমাদের আত্ম-সংশোধন আবশ্যক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের সে সব জঘন্য ব্যাপারের আলোচনা ক'রে আমি আমার জিহ্বাকে কলুষিত কর্ব্ব না। আমাদের ভিতরে যেগুলি নিন্দনীয় ও গর্হিত ব্যাপার রয়েছে, অপরে তার নিন্দা করুক কি না করুক, আমাদেরই কর্ত্তব্য তার সংশোধন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। কিন্তু ইতিহাসের কাছ থেকে এই আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ যে, ইন্দ্রিয়-চর্চ্চার দিকে অত্যধিক মনোযোগ এবং ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রতি একান্ত শিথিলতা থেকেই প্রত্যেক জাতির অবনতির সূচনা হ'য়েছে। ইন্দ্রিয়-সংযমের চেষ্টার ভিতর দিয়ে আমরা যে শক্তি লাভ কর্ব্ব, তাই আমাদিগকে সমগ্র জগতের সমক্ষে ধনে, মানে, জ্ঞানে গুণে, প্রতিভায়, পরাক্রমে অজেয় ক'রে তুল্‌বে।

সমাজ-সেবার নামে ব্যভিচার

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আজ পল্লীতে দেখছ, ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার। সহরে হয়ত ক'দিন পরে দেখ্‌বে, সমাজ-সেবা স্বদেশ-সেবা প্রভৃতির নামে ব্যভিচার। ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার যে ভাবে উৎপন্ন হয়েছে, সমাজ-সেবার নামেও মহাপাপ সেইভাবেই আস্‌ছে। স্বদেশ-সেবার প্রসারেচ্ছু একদল ব্যক্তি ভেবে দেখ্‌লেন, "না জাগিলে এই ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না" এবং সমাজ-সেবায় নারী-কর্ম্মী ও পুরুষ-কর্ম্মীর সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। এসব স্থলে যদি কঠোর নৈতিক নিয়মের কড়াকড়ি করা যায়, তাহ'লে হয়ত প্রস্তাবিত কাজ পিছনেই প'ড়ে থাকৃবে। অতএব, কয়লার খাদের ম্যানেজার যেমন কুলী-কামিনের নৈতিক জীবনের ভালমন্দ তুচ্ছ ক'রে দৈনিক কত কয়লা খাদ থেকে উঠ্‌ছে, তার হিসাবই দেখে, সেই রকম কটা সভা হ'ল, কটা বক্তৃতা হ'ল, কি রকম পিকেটিং হ'ল, দল কেমন পুরু হ'ল বা ভারী হ'ল, এই দিকেই লক্ষ্য রেখে নেতারা পুরুষ ও মহিলা কর্ম্মীদের অবাধ-মিশ্রণ-জনিত সম্ভব-অসম্ভব সকল অনাচারকে তুচ্ছ ক'রে যাবেন। হিসাবটা এই,—হয়ত একজন কর্ম্মী পরস্ত্রীকে এনে নিজের স্ত্রী ক'রে রেখেছেন, হয়ত একটী মেয়ে স্বামীকে ছেঁড়া ন্যাণ্ডালের মত ফেলে এসে অনেক কর্ম্মীর মনোরঞ্জন কচ্ছেন, কিন্তু

তাতে কি যায় আসে,—এদের দ্বারা দেশ বা সমাজের যে অন্যদিকে অসম্ভব রকমের সেবা হচ্ছে! অবশ্য এটা একটা নিতান্ত বেহিসাবী হিসাব। কিন্তু এই হিসাবের সুযোগ নিয়েই সমাজ-সেবায় পাপ প্রবেশ করে।

ব্যভিচারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমরা সর্ব্ববিধ ব্যভিচারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হও। ব্যভিচার, সে যত ভাল নামেই সমাজে চলুক, তোমাদের নিকট যেন ক্ষমার যোগ্য না হয়। যে সকল আচার বা আচরণ প্রত্যক্ষভাবে ব্যভিচার না হ'লেও ব্যভিচারের দিকে নরনারীকে ক্রমশঃ অগ্রসর ক'রে থাকে, সে সকলকেও সমূলে উৎপাটিত কর। উন্নতিলিপ্সু জাতি কোনও পাপ বা বিলাসিতার সঙ্গে আপোষ রাখ্‌তে পারে না। রণদুর্দ্ধর্ষ মনোবৃত্তি নিয়ে ব্যভিচারকে সমাজ থেকে নির্ব্বাসিত কর।

ব্যভিচার দূর করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়

উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু তার শ্রেষ্ঠ উপায়, নারীজাতিকে শিক্ষিত করা, যুবক মনকে শিক্ষিত করা। পুরুষকে শিখাও, নারীর সতীত্বে হস্তক্ষেপ করার মত পাপ নাই; নারীকে শিখাও, সতীত্বের দাম কমার মত ভ্রম নাই; শতবার সহস্রবার প্রত্যেকের কর্ণ-কুহরে এই বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত কর, মর্ম্মে মর্ম্মে এই বাণী গেঁথে দাও, আর সঙ্গে সঙ্গে সবল মনোবৃত্তিসম্পন্ন ঈশ্বরানুরাগ প্রত্যেকের মনে সঞ্চারিত কর।

জাহাপুর

১লা আষাঢ়, ১৩৩৮

অদ্য প্রাতেই শ্রীশ্রীবাবা জাহাপুর আসিয়াছেন। জাহাপুরের যুবক-সম্প্রদায় শ্রীশ্রীবাবাকে পাইবার জন্য অনেক দিন হইতেই ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছিলেন। তাঁহারা একে একে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবার চরণ দর্শন করিতে লাগিলেন এবং নিজ নিজ জীবনের গূঢ় সমস্যাসমূহের সমাধান চাহিলেন।

ভগ্নী-ব্রত

একজনকে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আগে নিজের ভগ্নীটীকে খুব পবিত্র

দৃষ্টিতে দেখ্‌তে শিখ। তোমার ভগ্নী হ'য়ে যে জন্মেছে, তোমার কাছে তার যে একটা অসীম সম্ভ্রম ও অলঙ্ঘনীয় মর্য্যাদা রয়েছে, সেই ধারণাটাকে আগে মনের ভিতরে প্রবল কর। তোমার ভগ্নীর অসম্মান তুমি কখনো দেখ্‌তে পার না। ভগ্নীর অসম্মান দেখ্‌বার আগে নিজ জীবনকে বলি দেবে, এই সঙ্কল্প তুমি কর। তোমার ভগ্নী পাপপথে যাক্, এটা তুমি পছন্দ কত্তে পার না। পাপপথে যদি সে পদার্পণ কত্তে চায় তবে প্রাণপণেও যে তাকে ফিরাতে তোমার হবে, এই বোধকে তোমার মনে প্রবল কর। তোমার ভগ্নী কারো প্রলোভনে প'ড়ে ভুলভ্রান্তি করুক, এ তুমি সহ্য কত্তে চেও না। তোমার ভগ্নী কাউকে প্রলোভিত ক'রে পাপপথে টেনে আনুক, এও তোমার নীরবে সহ্য করার ক্ষমতার বাইরে থাক্। এর প্রতিকার-চেষ্টা তোমার ব্রত হোক্। তোমার ভগ্নী হ'য়ে যে জন্মেছে, তার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতা রক্ষা করা তোমার এক অতি প্রধান কর্ত্তব্য হোক্। নাম দিতে হ'লে একে "ভগ্নীব্রত" নাম দিতে হয়। এই ভগ্নীব্রত অবলম্বন কর আগে। নিজের ভগ্নীর ভিতর নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের-পবিত্রতার সংরক্ষণ, পরিপোষণ, প্রবর্দ্ধন ও সন্দর্শন হোক্ আগে তোমার প্রধান উদ্যম। এইটুকু হবে তোমার নারীব্রতের ভিত্তি।

নারী-ব্রত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তারপরে তোমার এই ভগ্নী-মর্য্যাদা-বোধকে সকল নারীদের মধ্যে সম্প্রসারিত ক'রে দাও। তোমার বয়সী বা তোমার চেয়ে ছোট যত মেয়ে আছে, সকলকে তোমার ভগ্নী ব'লে ভাবতে থাক আর সকলকে তোমার ভগ্নীরই মত অলঙ্ঘনীয়া ও সম্ভ্রমশালিনী ব'লে জ্ঞান কত্তে থাক। মানুষ তার চিন্তার দাস। যেমন চিন্তা করবে, তুমি তেমন মানুষটী হ'য়ে যাবে। এদের প্রত্যেকের প্রতি তোমার সম্ভ্রম-বুদ্ধিকে বারংবার প্রয়োগ কত্তে কত্তে শেষে এমন হ'য়ে যাবে যে, একটা দুশ্চরিত্রা মেয়ে বা গণিকাও তোমার নিকটে পবিত্রতার আধার ব'লে প্রতীয়মানা হবে এবং তাদের প্রতিও তোমার কর্ত্তব্য তুমি ভ্রাতার সম্ভ্রম নিয়ে ক'রে যেতে পারবে। নারীমাত্রেরই প্রতি এই যে মর্য্যাদা-বোধ, যার গুণে তাদের

নিয়ে নীচ চিন্তা করার সামর্থ্য তোমার লোপ পাবে, তাকে নাম দিতে পার "নারীব্রত"। পাশ্চাত্য জাতি নারীকে খুব সম্মান করে, কিন্তু তাকে তারা ভোগের দেবতা ব'লে জানে। তোমরা তাকে সম্মান করো, পবিত্রতার অবতার জেনে।

মাতৃ-ব্রত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু নারীকে নারী এবং পবিত্রতার আকার ব'লে জ্ঞান কর্‌লেই চরম কাজ হ'য়ে গেল তা নয়। নারীকে মাতা ব'লে ভাব্‌তে পারাই ভারতীয় আদর্শ। একে নাম দিতে পার "মাতৃব্রত"। কিন্তু সব নারীকে নিজের মায়ের মত দেখ্‌তে হ'লে আগে চাই, নিজ গর্ভধারিণীকে পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি ব'লে অনুভব করা, পবিত্রতা-স্বরূপ পরব্রহ্মকে, শুদ্ধ আপাপবিদ্ধ শ্রীভগবানকে মায়ের সঙ্গে অভেদ ব'লে উপলব্ধি করা।

জননীতে জগন্মাতৃবোধ ও পৌত্তলিকতা

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—অবশ্য, জননীকে ভগবানের সঙ্গে অভেদ কল্পনা করায় পৌত্তলিকতা হবে ব'লে কেউ কেউ আপত্তি কত্তে পারেন। কিন্তু নারীর অবমাননাকারী অপৌত্তলিকের চাইতে নারীর মর্য্যাদা-দানকারী পৌত্তলিক সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

রহিমপুর আশ্রম

২রা আষাঢ়, ১৩৩৮

ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দারোরা, বোরারচর, বড়ইয়াকুড়ি ও জাহাপুর শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন এবং প্রাণপণে শ্রীশ্রীবাবার সেবা-পরিচর্য্যা করিয়াছেন। সকল স্থানেই ভ্রমণ পদব্রজে হইয়াছে এবং কোথাও জল কোথাও কাদা ভাঙ্গিয়া পথ চলিতে হইয়াছে। অধিকাংশ স্থানেই খালি পায়ে চলিতে হইয়াছে এবং কোথাও হাঁটু জলে এবং কোথাও কোমর জলে ভিজিয়া পথ ভাঙ্গা হইয়াছে।

ব্রহ্মই গুরু

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সহ শ্রীশ্রীবাবা অদ্য অপরাহ্নে রহিমপুর আশ্রমে

ফিরিয়া আসিয়াছেন। দূরবর্ত্তী কোনও স্থান নিবাসী জনৈক ভক্ত কিছু কাল যাবৎ মৌনী আছেন। শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্ম দর্শনের আকাঙ্খায় তিনি আশ্রমে আসিয়া বসিয়া আছেন। শ্রীশ্রীবাবা আশ্রমে প্রবেশ করিতেই তিনি "জয় গুরু শ্রীগুরু" বলিয়া মৌন ভঙ্গ করিলেন।

ভক্তকে দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীবাবা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—শ্রীগুরুরই জয় হোক্, কিন্তু বাবা ব্রহ্মই গুরু, মানুষকে যে গুরু ব'লে ভাবে সে মূর্খাদপি মূর্খ।

রহিমপুর আশ্রম
৩রা আষাঢ়, ১৩৩৮

অদ্য বৃহস্পতিবার। পৃথিবীর সকল আচার্য্যগণের সম্মানার্থ সপ্তাহের মধ্যে এই দিনটী শ্রীশ্রীবাবার ভক্তেরা সমবেত উপাসনায় বসিয়া থাকেন। রহিমপুরবাসী যে সকল ভক্ত যুবক এই দিন হাটে না যাইয়া পারেন বা হাট হইতে সকাল সকাল ফিরিতে পারেন, তাহারা প্রত্যেকে আগ্রহ সহকারে ইহাতে যোগ দিয়া থাকেন। মোচাগড়া হইতেও অনেকে আসিতে যত্ন পান।

বুদ্ধির ভাণ ভাল নহে

অদ্যকার উপাসনা শেষ হইলে শ্রীশ্রীবাবা মনের একাগ্রতার স্বরূপ ও তাহার সাধন সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করিলেন। পাতঞ্জল যোগ-দর্শনের অতি নিগূঢ় বিষয়সমূহ এত সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীশ্রীবাবা বুঝাইয়া দিলেন যে বারো বছরের বালকটীর নিকটও তাহা জলের মত সোজা বলিয়া উপলব্ধ হইল।

সমাগতদের মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি ছয় সাত মাস কাল নিজ গৃহে থাকিয়া মৌনব্রত পালন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন,—এত সরল ভাবে ব্যাখ্যা শুন্‌তে ভাল লাগে না। অমুক পত্রিকায় বেশ কাঠিন্যের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা হচ্ছে, পড়্‌বার সময়ে বুদ্ধিকে বেশ খাটাতে হয়, তাই ভালোও লাগে।

উপাসনার শেষে বাহিরাগত সকলে চলিয়া গেলে শ্রীশ্রীবাবা উক্ত ব্যক্তিকে

বলিলেন,—বাবা হে, মগজে যদি ঘী থাকেও তবু বাইরে তা নিয়ে ভাণ করা ভালো নয়।

রহিমপুর আশ্রম
৪ঠা আষাঢ়, ১৩৩৮

বড় কাজের প্রাণ সদাচার

আশ্রম সীমার মধ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ। আশ্রম-কর্ম্মীদের কাহারও ধূমপানের অভ্যাস নাই, বাহিরের লোকেও সকলেই আশ্রম-সীমায় আসিয়া এই সদাচার কঠোরতার সহিত পালন করেন। রাত্রি আটটার সময়ে আশ্রম-কুটীর ও রন্ধনশালা এতদুভয়ের মধ্যস্থলে শূন্যদেশে একটী অগ্নিস্ফূরণ দেখিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া শ্রীশ্রীবাবা সমীপবর্ত্তী হইলেন। দেখিলেন,—পাতঞ্জলের সুকঠিন ব্যাখ্যা-প্রিয় যুবকটী বিড়ি টানিতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—লক্ষ্মী ছেলে, শুধু পাতঞ্জল পড়্‌লেই হবে না, একটু একটু ক'রে সদাচারকেও অভ্যাসের মধ্যে আন্‌তে হবে। যত বড় কাজ তুমি কর্ত্তে চাও, তত কঠোর হবে তোমার সদভ্যাস। কখনো ভুলো না, বড় কাজের প্রাণ সদাচার। জীবনে তোমার অনেক মহৎ কার্য্য কর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। এইজন্যেই তোমার সদাচারে নিষ্ঠা থাকা দরকার অত্যধিক।

রহিমপুর আশ্রম
৬ আষাঢ়' ১৩৩৮

অদ্য আশ্রমে বহু অতিথির সমাগম হইয়াছে। বেলা দশটা বাজিতে চলিল কিন্তু চাউল-ডাইলের সহিত দেখা নাই। আশ্রমের প্রধান কর্ম্মিদ্বয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সবুর কর, ঘাবড়াবার প্রয়োজন নেই।

ইহার অত্যল্পকাল পরেই রসুলপুর গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণা সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সুবর্ণপ্রভা দেবী প্রচুর দুগ্ধ, ক্ষীর, চিড়া, মুড়ি ও তণ্ডুলাদি বহুপ্রকার দ্রব্যে একটী নৌকা পূর্ণ করিয়া আশ্রমে সমাগত

হইলেন। ভক্তগণ রাত্রি আট ঘটিকা পর্য্যন্ত মহানন্দে প্রসাদ গ্রহণ ও শ্রীশ্রীবাবার সহিত ধর্ম্মালাপ করিতে লাগিলেন।

ভগবানের নাম ছাড়িও না, সম্পদেও না, বিপদেও না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবানের নাম ছাড়্‌বে না। সম্পদেও না, বিপদেও না। সম্পদেও তাঁকে ডাকো, বিপদেও তাঁকে ডাকো। যখন তাঁকে ডাক্‌তে মন চাইবে না, বিপথে চল্‌তে চাইবে, তখন নামে রুচি হবার জন্য বারংবার তাঁর চরণেই প্রার্থনা জানাও। প্রার্থনার শক্তি অসীম। যে যা চায়, সে তা পায়। যে যত গভীর ভাবে চায়, সে তত গভীর ভাবে পায়। ধন, জন, যৌবনের জন্য প্রার্থনা না ক'রে অবিরাম তাঁর পায়ে প্রার্থনা জানাও যেন তাঁর মধুময় নামে, প্রেমময় নামে, সুখময় নামে তোমার রুচি থাকে, রুচি বাড়ে। নামের দড়ি দিয়ে শক্ত ক'রে কোমর বাঁধ, দৃঢ়হস্তে সেই দড়ি ধ'রে রাখ, অবাধে অবহেলে মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিজয়-ডঙ্কা বাজাতে বাজাতে শান্তিধামে চ'লে যাবে। ভগবানের নামে দুঃখ সুখময় হবে, ব্যথা সোহাগ-মধুর হবে, নিষ্ফলতা সার্থকতায় সুন্দর হ'য়ে উঠবে। নামকে জানো অমৃত, নামকে জানো মহামণি, নামকে জানো নিত্যধন।

রহিমপুর আশ্রম
৭ই আষাঢ়, ১৩৩৮

শেষ রাত্রে উঠিয়া শ্রীশ্রীবাবা কতকগুলি পত্রের উত্তর প্রদান করিলেন।

সৎসঙ্গের উদ্দেশ্য

পাবনা জেলান্তর্গত সলপ-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"সৎসঙ্গ করার একমাত্র উদ্দেশ্যই জানিবে ঈশ্বরোপাসনায় উদ্দীপনা লাভ। যাঁহার সঙ্গ করিলে পরমাত্মার ধ্যানে মন রুচি-সম্পন্ন হইবে, যাঁহার সঙ্গ করিলে পরমাত্মার চিন্তায় আনন্দ বৃদ্ধি হইবে, যাঁহার সঙ্গ করিলে সাধন-ভজনে উৎসাহ বাড়িবে, তাঁহার সঙ্গই করিবে। মহতের সহিত বাচালতা না করিয়া তাঁহার সংসর্গে কি করিয়া ভগবন্মুখতা ক্রমবর্দ্ধিত হয়, তাহার দিকে লক্ষ্য দিবে।"

বিফল জীবন

জলপাইগুড়ি জেলান্তর্গত ময়নাগুড়ি-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"সেই জীবন ধারণ করাই বৃথা, যেই জীবনে ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা জাগরিত হইল না, যেই জীবন ভগবল্লাভের জন্য ব্যয়িত না হইল। আহার নিদ্রায় দিন কাটাইয়া যাইতেছে পশুপক্ষীরাও। ভগবানের জন্যই যদি ব্যাকুল না হইলাম, তবে এই দুর্ল্লভ মানব-দেহ লাভ করিয়া কি লাভ হইল? এই কথা অনুক্ষণ চিন্তা কর এবং মানব-জন্মকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য প্রত্যেকটী পল, প্রত্যেকটী বিপল, প্রত্যেকটী অনুপল সাধন-কর্ম্মে প্রয়োগ কর।"

যৌবনকে সামাল দাও

দিনাজপুর জেলান্তর্গত আইহাই-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"যৌবনকে সৎপথে পরিচালিত করিবার পুরস্কার শ্রীভগবান্ বার্দ্ধক্যে প্রদান করিয়া থাকেন। সুখময়, শান্তিময়, তৃপ্তিময়, আত্ম-প্রসাদময়, বার্দ্ধক্যের চিত্র যদি মনে অঙ্কিত করিয়া থাক, তাহা হইলে যৌবনকে তদনুরূপ পরিচালন প্রদান করিতে প্রয়াসশীল হও। জগতে দীর্ঘজীবন কে না চাহে? কিন্তু বার্দ্ধক্যের জরাভারক্লিষ্ট অক্ষম জীবনই বা কাহার কাম্য হইয়া থাকে? সকলেই দীর্ঘায়ু চাহে কিন্তু বার্দ্ধক্য চাহে না। কিন্তু যৌবনের মিতাচার, যৌবনের পরিণামদর্শিতা, যৌবনের হিসাব-প্রিয় সন্তর্পণ পদসঞ্চার বার্দ্ধক্যকে বার্দ্ধক্য-ভার হইতে মুক্তি প্রদানে সমর্থ হয়। সময়ে যে সঞ্চয় করে, অসময়ে সে নির্ব্বিবাদে দিন কাটাইতে পারে। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল অবাধ্য যৌবনকে সামাল দাও।"

ভগবানকেই ভালবাস

ঢাকা জেলান্তর্গত বজ্রযোগিনী-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"ভালবাসার মত অমূল্য সম্পদকে তালে বেতালে এখানে সেখানে অপচয় করিয়া কি লাভ হইবে? যাঁর চেয়ে আর বড় আধার কেহ নাই, তাঁর কাছেই ইহাকে সমর্পণ করা উচিত। মানুষের ভালবাসা কতবার কত পাত্রে গিয়া পড়িতেছে আর হতাশা নিরাশা চয়ন করিয়া ব্যর্থতার জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। এই ঝক্‌মারির প্রয়োজন কি? এস আমরা ব্রহ্মাণ্ডের সকল ভালবাসার বস্তুকে এক কথায় অগ্রাহ্য করিয়া দেই এবং মন-প্রাণের সমগ্র প্রেম একমাত্র পরম-প্রেমসুন্দর শ্রীভগবানের পাদপদ্মে ঢালিয়া দেই। ভাল তোমাকে বাসিতেই হইবে, কারণ ইহা তোমার স্বভাব-ধর্ম্ম। কিন্তু যাকে তাকে ভাল না বাসিয়া, প্রেম-রস-বিগ্রহ চিরপ্রেমমধুর পরমপ্রেমাস্পদকেই ত' ভালবাসিয়া এই প্রেম-পিপাসার পূর্ণ পরিতৃপ্তি বিধান বিজ্ঞোচিত হইবে। অজ্ঞান ব্যক্তির আচরিত পন্থা ছাড়িয়া এস আমরা বিজ্ঞের পথে চলি।"

রহিমপুর আশ্রম,
৮ই আষাঢ়, ১৩৩৮

সমাজের গলগ্রহ হইও না

আশ্রমান্তর হইতে একটী যুবক কর্ম্মী কিছুদিন যাবৎ রহিমপুর আশ্রমে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। আশ্রম-কর্ম্মীদের কঠোর কর্ম্মশীলতার ইনি পক্ষপাতী নহেন। কর্ম্মশীলতা সাধন-ভজনের বিঘ্ন উৎপাদন করে বলিয়া ইনি এই বিষয়ে আলোচনা তুলিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বহির্ম্মুখ কর্ম্ম মনের অন্তর্ম্মুখিনতা কমায়, একথা ঠিক্। কিন্তু তোমার শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য সমাজের অপর লোকে নিজ সংসারীর বোঝার উপরে আবার সাধু-সেবার শাকের আঁটি বহন করুন, এ দাবী তোমার পক্ষে সঙ্গত নয়। সিদ্ধপুরুষদের ভার সমাজ স্বেচ্ছায়ই বহন কচ্ছেন, কিন্তু তোমরা যারা half-boiled (অর্দ্ধ-সিদ্ধ) তাদের খোরাকীর bill সমাজের নিকট পাঠান ঠিক্ নয়। লোকালয়ে থেকে যদি তপস্যা কত্তে হয়, তবে নিজের জন্য শ্রম নিজেকেই কত্তে হবে। সমাজের তুমি গলগ্রহ হ'য়ে থাক্‌বে, এটা অত্যন্ত আপত্তিজনক। জোঁককে লোকে ভয় করে কেন, জানো? সে অপরের ক্লেশ-

সঞ্চিত রুধির শোষণ করে ব'লে। সমাজের লোক জোর ক'রে তোমার শ্রম তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিক্, তার চেয়ে স্বেচ্ছায় তুমি নিজের শ্রম নিজে কচ্ছ, এটা অধিকতর সম্মানজনক। শ্রম কর, আর, কাজের সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানের নাম চালাও। কাজও ছেড় না, নামও ছেড় না। শেষে যা হয়, হবে।

সংসারের সকল কাজে ভগবৎ-স্মরণ

শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎ রহিমপুর আশ্রমের আদি কর্ম্মী। শ্রীশ্রীবাবা এই আশ্রমে আসিবার পূর্ব্ব হইতেই ইনি এখানে আছেন এবং কাজ করিতেছেন। অদ্য তিনি দেশে চলিয়া যাইবেন। তাঁহার দেশ ২৪-পরগণায়।

যাইবার কালে শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে বলিলেন,—এখানে ত' বাবা শিখে গেলে, কোদাল মার্‌তে মার্‌তে ভগবানের নাম কি ক'রে কত্তে হয়। বাড়ী গিয়েও অভ্যাসটী রেখ। সংসারের কাজ ক'রেও যে সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকে ডাকা যায়, সে কথা ভুলে যেও না।

শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎ বিনীতভাবে সম্মতি জানাইয়া শ্রীশ্রীবাবার চরণধূলি লইয়া রওনা হইলেন।

রহিমপুর আশ্রম
৯ই আষাঢ়, ১৩৩৮

গৈরিক ও আত্মগঠন

মোচাগড়া আশ্রমের জনৈক কর্ম্মি-ব্রহ্মচারী গৈরিক বস্ত্র পরিধানের জন্য অত্যন্ত সমুৎসুক হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাবা গৈরিকের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান্। এইজন্য লঘু প্রয়োজনে গৈরিক পরিধানকে অত্যন্ত অপছন্দ করেন। উক্ত ব্রহ্মচারীর একখানা পত্র পাইয়া তদুত্তরে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"বাবা, তোমার পত্রখানা পাইয়াছি। তোমার গৈরিকধারণ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, বাহিরের গেরুয়া সকল সময়েই অন্তরের প্রকৃত বৈরাগ্যের সহায়ক হয় না, কখনো কখনো আত্ম-প্রতারণারও সহায়ক হয়। এইজন্যই আমি তোমাকে আপাততঃ গৈরিক দিতে ইচ্ছা করি না। কিছুদিন পরে যখন গেরুয়া

তোমার অঙ্গারোহণ করিবে, তখন উহা গেরুয়ার পক্ষেও গৌরবজনক হইবে, তোমার পক্ষেও মঙ্গলপ্রদ হইবে। একে ব্রাহ্মণের বংশে জন্মিয়াছ, তার উপরে যদি গৈরিকধারণ আরম্ভ কর, তাহা হইলে গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকেরা বেড়াজালে ধরিয়া তোমাকে প্রচলিত একটী গোসাঁইতে পরিণত করিয়া ছাড়িবে, তপঃ-সাধনার বিঘ্ন ঘটাইবে। আমি সেই বিপদ হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে চাহি। আরও অগ্রসর হও, আরও একাগ্র হও, মান-যশ-প্রতিপত্তিকে অগ্রাহ্য করিতে শিক্ষা কর, আরও ব্রহ্মগত-প্রাণ হও,—স্বেচ্ছায় আসিয়া গৈরিক বসন তোমাকে প্রণতি জানাইয়া সম্মুখে দাঁড়াইবে। নিজের উপরে কণামাত্র অবিশ্বাস না রাখিয়া তুমি অমিত-বিক্রম সহকারে অমৃতময় অখণ্ড-নামের সেবা কর। নামই তোমাকে গৈরিকের যোগ্য করিবে। তপস্যাই তোমাকে মানুষ করিবে, পরিচ্ছদ নহে। অবশ্য গৈরিক-বসনের আবশ্যকতাও অনেকের পক্ষে আছে। তোমার পক্ষেও যখন উহা সত্যই আবশ্যক হইবে, তখন তুমি না চাহিলেও তোমার বসন আপনিই গৈরিক-রঞ্জিত হইয়া যাইবে। এখন তুমি সমগ্র প্রাণ-মন দিয়া তপঃসাধনে রত হও। সাধন-বিষয়ে যেদিক দিয়া যতটুকু গুরূপদেশ পাইয়াছ, তাহাই প্রবল অধ্যবসায় সহকারে পালন করিতে থাক। গুরুবাক্যে এককণাও অবিশ্বাস রাখিও না। অভ্রান্ত সত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া বেদবাক্যের ন্যায় বিতর্কের অতীত প্রতীতি করিয়া গুরূপদেশ পালন কর। ইহার মধ্য দিয়াই তোমার সকল যোগ্য ভাব আহরণ হইয়া যাইবে। ব্রহ্মচর্য্যের দিকে কঠোরতর দৃষ্টি দাও, বীর্য্য-ধারণকে সকল তপস্যার মূলীভূত সত্য বলিয়া গ্রহণ কর এবং সর্ব্ব-প্রকার বীর্য্যক্ষয়কে নিবারণের জন্য জ্ঞাত সর্ব্বপ্রকার সদুপায়কে প্রাণান্ত নিষ্ঠাসহকারে অবলম্বন কর। এভাবে আত্মগঠন করিতে থাক। আত্মগঠনের চেষ্টার মধ্য দিয়াই নিত্য নবতর সামর্থ্য তোমার মধ্যে সঞ্জাত হইবে।"

নেতৃত্ব লাভের উপায়

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা শ্রীযুক্ত অশ্বিনী পোদ্দারের বাড়ী বসিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন,—যোগাড়-যন্ত্র দ্বারা কেউ নিজেকে নেতৃপদে আসীন কত্তে পারে না।

সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণ এবং যোগ্যতার সমাবেশের চেষ্টাই মানুষকে নেতৃত্ব দেয়। অনেক ব্যক্তি প্রতিভার অধিকারী হ'য়েই মনে করে,—"আমি নেতা হবার যোগ্য"। নেতা হওয়ার জন্য যে চারিত্রিক সাধনার দরকার, যে ধীরতা, যে দৃঢ়তা, যে আত্মবিশ্বাস প্রয়োজন, তা' যার নেই, সে শুধু প্রতিভার বলে নেতা হতে চায় মাত্র অপূরণীয় দুরাকাঙ্ক্ষার তাড়নায়।

দ্বিবিধ নেতা

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—জগতে দুই রকমের নেতা দেখা যায়। এক-দল দিনের পর দিন লোক-লোচনের সমক্ষে নিজ আদর্শকে প্রচার কত্তে থাকে। অপর দল লোক-লোচনের সম্বন্ধ না রেখে গভীর প্রযত্নে আত্মগঠন করে এবং প্রয়োজন এলেই দ্বিধাহীন চিত্তে কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝম্প দেয়। যথা, সমুদ্র-মন্থন-কালে মহাদেব। মণি উঠ্‌ছে, রত্ন উঠ্‌ছে, ঐরাবত উঠ্‌ছে, উচ্চৈঃশ্রবা উঠ্‌ছে' দেবতাদের অগ্রমুখ হ'য়ে যিনি যেটী পাচ্ছেন, লুফে নিচ্ছেন, কিন্তু মহাদেব ব'লে কেউ যে একজন আছেন, সেইদিকে কারো ভ্রূক্ষেপও নাই। কিন্তু হঠাৎ যেই হলাহল উত্থিত হ'ল, সব নেতাদের নেতাগিরী খতম হ'ল, দেবাদি-দেব মহাদেব অনায়াসে গরল ভক্ষণ ক'রে অবহেলে চোখ বুজে যেয়ে নিজের বেলতলাটীতে বস্‌লেন। আমার দৃষ্টিতে ইনিই শ্রেষ্ঠ নেতা। তবে, নেতৃত্ব স্থলে এঁর আবির্ভাব সব সময়ই বিরল। এই শ্রেণীর নেতাকেই আবাল্য আমি অর্চ্চনার সামগ্রী ব'লে কল্পনা ক'রে এসেছি। তারই জন্যে একদিন বলেছিলাম,—"তেমনি গান গাহিতে চাহি, যে গান শুনিয়া সুপ্তিমগ্ন জাগিয়া উঠিবে, কর্ম্মৈষণার প্রচণ্ড তাড়নে ভাঙ্গিবে গড়িবে, কিন্তু কে যে কোন্‌ গোপনপুরে বসিয়া রাগিণী আলাপ করিয়া গেল, তাহা অনুমানেও না জানিতে পারে।" কিন্তু নেতা যেই প্রকারেই হউক না কেন, চরিত্রবল, introspection and clear sight of events (অন্তর্দৃষ্টি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিচয়ের সুস্পষ্ট জ্ঞান) প্রভৃতি গুণগুলির অনুশীলন কত্তে হবেই।

নেতৃত্বের ব্যর্থতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নেতায় নেতায় ঢুঁসাঢুঁসি দেশের দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

আসল কথায় উপেক্ষা ক'রে বাজে কথা নিয়ে লড়াই চালান নেতৃত্বের ব্যর্থতার প্রমাণ। আভিজাত্য বা অর্থবল, বিদ্যা অথবা পক্বকেশ, দলাদলি কর্‌বার ক্ষমতা অথবা ষড়যন্ত্র-প্রিয়তা কারো নেতৃত্বের মাপকাটী হ'তে পারে না।

রহিমপুর আশ্রম

১০ই আষাঢ়, ১৩৩৮

অদ্য বৃহস্পতিবার। শ্রীশ্রীবাবার সন্তানেরা সমবেত হইয়া সন্ধ্যায় উপাসনা করিলেন। তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিতে লাগিলেন।

জীব ভগবদুপাসনা করে কেন ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—চঞ্চল চিত্তে শান্তিলাভ হয় না, অশান্তিই বিরাজিত থাকে। ভগবদুপাসনা চিত্তের চঞ্চলতা নিবারণ করে। তাই শান্তিপ্রার্থী জীব ভগবদুপাসনা করে।

চিত্তের বিভিন্ন অবস্থা ; ভগবদুপাসনা তথা স্বদেশ-সেবা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—চিত্তের পাঁচটী অবস্থা। প্রথমটী হচ্ছে ক্ষিপ্ত ভাব। এ ভাবের দ্বারা শান্তিলাভ হয় না। ক্ষিপ্ত চিত্ত দেশ-সেবায়ও অক্ষম, জীব-সেবায়ও অক্ষম। দ্বিতীয় অবস্থা মূঢ় ভাব। মুগ্ধাবস্থায় জীব বিদ্বেষ-বশে স্বদেশ-প্রেমিক, হুজুগ-বশে রোগীর সেবক, মলিন সহানুভূতির বশে দুঃখীর দুঃখ দুরীকরণে কৃতসঙ্কল্প। মূঢ় চিত্ত লোভবশতঃ রসগোল্লার ধ্যান করে, ক্রোধবশতঃ শত্রুর ধ্যান করে, এই অবস্থা যোগীর নয়। ক্ষিপ্ত মনকে বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ আংশিকভাবে ক্ষিপ্ততা-বর্জ্জিত করার পক্ষে স্বদেশ-সেবা ও জীব-সেবা হিতকর। বিক্ষিপ্ত মনটা কি রকম জানো? যেন একটা গরুকে দড়ি দিয়ে খুঁটায় বাঁধা হয়েছে, দড়ি তার একটু লম্বা কিন্তু অসীম নয়, চারদিকে ঘুরে ঘুরে সে ঘাস খাচ্ছে, আবার দড়িতে টান পড়্‌লেই খুঁটার কাছে ফিরে ফিরে আস্‌ছে। এই যে লক্ষ্যের কাছে বারবার ফিরে ফিরে আসা, অথচ চঞ্চলতা ত্যাগ না করা, একে বলা যায় বিক্ষিপ্ততা। ক্ষিপ্ত মন স্বদেশ-সেবায়ও অক্ষম, আত্ম-সেবায়ও অক্ষম। মূঢ় মনের স্বদেশ-সেবা মোহ না টুটা পর্য্যন্ত। বিক্ষিপ্ত মনের সঙ্গে একাগ্র মনের পার্থক্য যেন, বৃষ্টির জল আর প্রপাতের

জলের মত। বৃষ্টির জল অবিশ্রান্ত পড়্‌লেও মাঝে মাঝে ফাঁক থাকে। বিক্ষিপ্ত মন বারংবার নিজ লক্ষ্যের দিকে ফিরে ফিরে এলেও আংশিক বিচ্ছেদ আছে। একাগ্র মনে তা নেই। একাগ্র অবস্থাটা যেন তৈল-ধারাবৎ,— ধারা চল্‌ছে, গতি আছে, কিন্তু একমুখিনী, অবিরাম এবং একই তত্ত্বের। একাগ্র অবস্থাকে ধানুষ্কের নিক্ষিপ্ত শরের সঙ্গে তুলনা দিতে পার। তীর চলেছে, অবিরাম চলেছে লক্ষ্যেরই পানে, একটু ডাইনে একটু বাঁয়ে নয়, চলেছে সোজা, গতি তার তীব্র, কিন্তু গতি থাক্‌লেও গতির লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট, লক্ষ্য বদ্‌লাচ্ছে না,—এই অবস্থাটা একাগ্র অবস্থা। মনের এই অবস্থায় পৌঁছে জীব-সেবা বল, স্বদেশ-সেবা বল, আত্ম-সেবা বল, পরসেবা বল, যে যেই সেবারই ব্রত গ্রহণ করুক, তার আর স্খলনও নেই, প্রতিক্রিয়াও নেই। অনেকে প্রশ্ন করেন যে, মস্ত মস্ত দেশসেবী শেষটায় সাধু হ'য়ে যান কেন? তার উত্তর এই যে, মুগ্ধ বা বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে যাঁরা ব্রতধারী হন, তাঁরা মনের উচ্চাবস্থা লাভ কর্লেই নূতন পথ ধর্‌তে বাধ্য হন। বিক্ষিপ্তমনার বিক্ষেপের সময়ে যে স্বদেশ-প্রেম, তা একাগ্র অবস্থায় রূপান্তর পায়। কারণ, বিক্ষেপের দুইটী প্রকৃতি। একটী স্থির, অপরটী অস্থির। ঐ অস্থির অবস্থাটীর স্বদেশ-প্রেমই একাগ্র অবস্থায় বদ্‌লে যায়। কারণ, একাগ্র অবস্থায় ঐ অস্থিরতা থাকে না। তাই স্থায়ী স্বদেশ-প্রেম যারা চায়, তাদের দেখ্‌তে হবে, মনের একাগ্র অবস্থায় যেন তার উদ্ভব হয়। ভগবদুপাসনা ক্ষিপ্ত চিত্তকে, মূঢ় চিত্তকে সহজে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এনে দেয় এবং বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র অবস্থায় আনে। এজন্যই প্রকৃত স্বদেশ-সেবক হ'তে হ'লেও ভগবদুপাসনা আবশ্যকীয়।—ভগবদুপাসনা বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করে, একাগ্র চিত্তকে নিরুদ্ধ করে। নিরুদ্ধ অবস্থাটা যেন নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায়, সম্পূর্ণ আকাশের অভ্রান্ত প্রতিবিম্ব তাতে পড়ে; আকাশের চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-তারা সব কিছুর ছবি তাতে ভেসে ওঠে। নিরুদ্ধ অবস্থাতেও নিখিল ব্রহ্মতত্ত্ব চিত্তের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হ'য়ে ওঠে, সমগ্র অস্তিত্ব জ্ঞানময়, রসময়, মধুময় হ'য়ে যায়। ইহাই শান্তি। এই শান্তির জন্যই নারদ-ঋষি বীণাযন্ত্রে হরি-গুণ গান করেন, ব্রহ্মা চতুর্মুখে

গায়ত্রীধ্বনি ক'রে অক্ষসূত্র জপ করেন, বিষ্ণু ধ্যানস্তিমিত লোচনে তপস্যা করেন, মহেশ্বর সর্ব্বৈশ্চর্য্য পরিত্যাগ ক'রে শ্মশানে-মশানে চিতাভস্ম সংগ্রহ ক'রে, সর্ব্বাঙ্গে লেপন ক'রে শাব্দিক প্রণব ব্যোম-ব্যোম ধ্বনি ক'রে দিগ্‌দিগন্ত নিনাদিত করেন।

শান্তির জন্য ব্যাকুল হও

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই মহাশান্তির জন্য বাবা তোমরা সবাই ব্যাকুল হও। জগতের সকল বস্তুর সুখাস্বাদের লোভ তোমাদের দূরীভূত হউক, ভগবানের পরমমধুর নামামৃতের মধু-রস আস্বাদনের জন্য তোমরা পাগল হও। ভগবান আর তুমি এই নিয়ে তোমাদের সোহাগ-মধুর সংসার সৃষ্ট হউক। ভগবানকে কর মাতা, কর পিতা, কর পুত্র, কর কন্যা, কর সখা, কর সখী, কর স্বামী, কর পত্নী, কর বন্ধু, কর বান্ধবী, কর জীবন, কর যৌবন, কর দেহ, কর মন, কর প্রাণ, কর আত্মা। তাঁকে নিয়েই তোমার শান্তিময় নিত্যজীবন লাভ হোক্।

রহিমপুর আশ্রম

১২ আষাঢ়, ১৩৩৮

ধনী কে? গুণী কে? রূপবান কে?

অদ্য রামকৃষ্ণপুর হইতে দুইটী দর্শনার্থী যুবক আসিয়াছেন। উভয়েই ধনীর ছেলে এবং সুশ্রী।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জানো বাবা, ধনী কে? যার ভগবৎ-প্রেমধন আছে। গুণী কে?—যে সর্ব্বগুণাকর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। রূপবান্ কে?—নিখিল রূপের আকর শ্রীভগবানের পায়ে যে আত্মসমর্পণ করেছে।

রহিমপুর আশ্রম

১৩ আষাঢ়, ১৩৩৮

তপস্যার শক্তি

মোচাগড়া আশ্রমে অবস্থিত জনৈক ব্রহ্মচারীর নিকট শ্রীশ্রীবাবা অদ্য এই পত্র লিখিলেন,—

"অহর্নিশ একাগ্রচিত্তে অমৃতময় নামের সেবা করিতে থাক। নামের সেবার মধ্য দিয়াই অফুরন্ত জ্ঞান-প্রবাহ তোমার ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকিবে। প্রকৃত সত্য কখনই উদগ্র তপস্যা ব্যতীত লব্ধ হয় নাই এবং কখনও হইবে না। অতএব সকল লোভনীয় পদার্থ হইতে মনকে টানিয়া আনিয়া নামযোগে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের ধ্যানে নিরত হও।

"—'তপস্যা' কথাটীকে বড় বড় অক্ষরে হৃদয়-ফলকে লিখিয়া রাখিও। তপস্যাই পবিত্রতা দান করে, প্রেমদান করে, শুদ্ধ প্রীতি দান করে, জ্ঞান দান করে, অসম্ভবকে সম্ভব করিবার শক্তি দান করে। তপস্যাই দগ্ধ জীবনে শান্তির অমিয়-হিল্লোল বহাইয়া দেয়, পরাধীনতার দুঃসহ শৃঙ্খল চূর্ণ করে, অচেতন জাতির মৃত-সঞ্জীবনী বিধান করে। তপস্যাই পতিতকে অভ্যুত্থিত করে, ধ্বংশোন্মুখকে নবযৌবনশ্রী-দীপ্ত করে, মৃত্যুপথগামীকে অমৃতত্ব দান করে। তপস্যাই অন্ধকে দৃষ্টি-শক্তি দেয়, বধিরকে দিয়া কথা কহায়, খঞ্জকে দিয়া অনায়াসে হিমগিরি লঙ্ঘন করায়। দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া সত্য কাজ যদি কিছু করিতে চাহ তাহা হইলে তপস্বী হও।

"বাহিরের শত কাজ কর্ত্তব্যবোধে করিয়া যাও কিন্তু অন্তরে অন্তরে নামের অমৃতপানের জন্যই কণ্ঠ বাড়াইয়া রাখ। লাউ, কুমড়া, সিম লতার পরিচর্য্যা শুধু কর্ত্তব্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যই করিয়া যাও, কিন্তু এই সকল বহির্ম্মুখ কর্ত্তব্য পালনের সময়েও মনকে ঢালিয়া রাখ নামের অবিশ্রান্ত স্রোতে। নামকে জীবনের সার বলিয়া স্বীকার কর। নামকে সর্ব্বস্ব-ধন বলিয়া অনুভব কর। নামের সেবায় মনপ্রাণ সম্যক সমর্পণ করিয়া দিয়া তোমার সংগুপ্ত সাত্ত্বিকী শক্তি দ্বারা ইচ্ছার অগোচরে এই বার্দ্ধক্য-পীড়িত মহাজাতির জরাব্যাধি দূরীভূত কর।"

ব্রহ্মচর্য্যের অভাব ও সাত্ত্বিক বিকৃত-মস্তিষ্কতা

উক্ত পত্রখানা শ্রীশ্রীবাবা লিখিতেছেন, ঠিক এমনি সময়ে এক সাধু আশ্রমে আসিলেন। সাধুটী অপ্রকৃতিস্থ ও ক্ষিপ্তমনার ন্যায় আবোল তাবোল বকিয়া যাইতেছেন, আবার মাঝে মাঝে ভাল কথাও কহিতেছেন। আভাস

পাওয়া যায় যেন মাঝে মাঝে একটা ব্রহ্মচেতনার আমেজ আসিতেছে। কিন্তু পরক্ষণেই অতি কদর্য্য সব বিষয় সাধুর রসনাকে কলুষিত করিতেছে। মনে হইতেছে, সাধুর মন এই সব কদর্য্য বিষয়ে আসক্ত নহে কিন্তু রসনা অভ্যাসের বশে কদর্য্য প্রসঙ্গ সমূহে নিজেকে ক্লেদাক্ত করিতেছে। আশ্রমে মাত্র দুই জনের আহারীয় হইয়াছে তথাপি সাধুকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করান হইল এবং শ্রীশ্রীবাবা ও সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী অর্দ্ধোপবাস করিলেন।

সাধু চলিয়া গেলে ব্রহ্মচারী বলিলেন,—এটা সাধুর কি অবস্থা?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এটা তার বিক্ষিপ্ত অবস্থা। সাধারণ লোকে এটাকেই একটা মস্ত অবস্থা ব'লে মনে ক'রে থাকে এবং অসিদ্ধ সাধুকেই সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শীর আসনে বসিয়ে পরিণামে ঠকে।

ব্রহ্মচারী।—ব্রহ্মচেতনার মাঝে মাঝে এরূপ কদর্য্যালাপ ও কদর্য্য কথার অবতারণা কেন?

শ্রীশ্রীবাবা।—এ সব অভ্যাসের ফল মাত্র। এর মন যে সেই সময়ে ঠিক কদর্য্য তত্ত্বেরই অনুশীলন কচ্ছে, তা নয়। জিহ্বাটা যেন একটা জড় যন্ত্রের ন্যায় নিজের অজ্ঞাতসারে কাজ কচ্ছে এবং লোকটার পূর্ব্বাভ্যাস জিহ্বা-পথে বেরুচ্ছে।

ব্রহ্মচারী।—এর কারণ কি?

শ্রীশ্রীবাবা।—কারণ, অব্রহ্মচর্য্য। জীবনের মধ্যে ব্রহ্মচেতনা জাগাবার চেষ্টা অনেক সাধকের থাকে কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য পালনে যত্ন থাকে না। তারই ফল এই বিকৃত-মস্তিষ্কতা। অসংযমের ফলে আধার এত ছোট ও অযোগ্য হ'য়ে পড়ে যে, ভূমার আস্বাদন আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই মস্তিষ্কের বিকৃতি এসে যায়। দেশের পল্লী অঞ্চলে যত সাধু দেখ্‌তে পাচ্ছ, তার মধ্যে একটা বিরাট অংশ ব্রহ্মচেতনার অধিকারী হ'য়েও শুধু ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে বিকৃত মস্তিষ্ক হ'য়ে যাচ্ছেন। অবশ্য, লোকে তাঁদের অবাধে পূজা কচ্ছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সিদ্ধ পুরুষ এঁরা নন।

আধ্যাত্মিক উচ্চাভিলাষিণী স্ত্রীর স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য

আশ্রম-ভূমির দাতা ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অসুস্থ শুনিয়া শ্রীশ্রীবাবা তাঁহাকে দেখিতে চলিলেন। সেখানে একটী মহিলার কথা উঠিল। মহিলাটী জনৈক সাধুর নিকট হইতে সাধন পাইবার পরে স্বামীর প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ও বিদ্বিষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শিষ্যের এইরূপ মনোবৃত্তির মধ্যে সদ্‌গুরুর সত্য পরিচয় পাওয়া যায় না। সকল বিরুদ্ধ কর্ত্তব্যের মধ্যে যিনি সামঞ্জস্য বিধান ক'রে দিতে না পার্ব্বেন, আমি তাকে গুরু ব'লে মানিই না।

স্ত্রীর স্বকীয় সংযম-রক্ষা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অবশ্য কতকগুলি স্থল আছে, যেখানে এই সীতা, সাবিত্রীর দেশেও স্ত্রী স্বামীর ইচ্ছাকে প্রতিরুদ্ধ কর্ত্তে অধিকারিণী। স্বামী যদি বলেন, ভগবানকে ডেকোনা, তা হ'লে স্ত্রী সে কথা শুন্‌তে পারেন না। কিন্তু ভগবান্‌কে ডাকৃছ বলেই যে সংসারের কর্ত্তব্যে উপেক্ষা কর্ব্বে, এটা ভারতীয় নারীর সনাতন ধর্ম্ম নয়। দু'টাই সমানে চালাতে হবে,—সহজ উপায়ে না চলে ত' কৌশল অবলম্বন কর্ত্তে হবে। স্বামী যদি অসময়ে স্ত্রীকে ইন্দ্রিয়-ব্যবহারে প্রবর্ত্তিত কর্ত্তে চান, তবে স্ত্রী বৈধভাবেই তাঁকে বাধা দিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রী যদি সম্যক্ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর্ত্তে চান, তা হ'লে এই বিষয়ে তাকে স্বামীর অনুমোদন নিয়ে তবে ব্রতগ্রহণ কর্ত্তে হবে। কারণ, তা নইলে তার স্বামীকে হয়ত সে সাংসারিক অসুবিধায় ফেলবে। সম্যক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনেচ্ছু স্ত্রীর কর্ত্তব্য হবে যে, স্বামীকেও এই পথে টেনে আনা, নতুবা স্বামীকে পুনর্ব্বিবাহের সুযোগ ও অধিকার দান করা এবং স্বামীর সাংসারিক জীবনকে কোনও প্রকারে ব্যাঘাত না দিয়ে চলা,—এখন তা সংসারে থেকেই হোক্ বা সংসার পরিত্যাগ ক'রেই হোক্। ধর্ম্ম করার ওজুহাতে কোনও স্ত্রীরই এমন অধিকার নেই বা এমন ভাবে চলার অধিকার নেই, যাতে স্বামীর সামাজিক সম্মান নষ্ট হ'তে পারে।

মহাজন কে ?

বৈকালে আশ্রমে বহু জনসমাবেশ হইল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নানা

মত নানা পথ দেখে জীব নিজের পথ ঠিক কত্তে পারে না। তাই শাস্ত্র বল্লেন,—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। কিন্তু মহাজন কে? যেদিকে তাকাই, সেদিকেই দেখি কত মহাজন কেহ পদব্রজে, কেউ রথে, কেউ অশ্বে, কেউ গজে নিজ নিজ পথে চল্‌ছেন। আমি কাকে অনুসরণ কর্ব্ব? আমার মহাজন কে? কোন্ জনের চেয়ে কোন্ জন বড়, তা যে ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারি না। তখন কি কত্তে হয়? তখন চুপ্ ক'রে চৌমাথায় দাঁড়াতে হয়, চক্ষু বুজে, নিজের মহাজন নিজেকেই জান্‌তে হয় এবং নিজের রুচিমত সাধন কত্তে হয়। তারি ফলে যিনি এ পাষাণ প্রাণ গলাতে পার্ব্বেন, তার আবির্ভাব ঘটে। সদ্‌গুরু-লাভ শুধুই কৃপা-সাপেক্ষ মনে ক'রোনা, এই কৃপাটুকুকে সত্য ক'রে পাবার জন্য তোমার পুরুষকারেরও যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে।

সাধুসঙ্গের পূর্ণ সুফল লাভার্থে স্বকীয় চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা

সাধুসঙ্গ সম্পর্কে কথা উঠিলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাধু ত' খুব দয়াল, সবই দিতে পারেন, কিন্তু তুমি যদি হও ঝাঁঝরি, সে দান গ'লে যাবে। তুমি যদি হও ফুটো কলসী, তাও গ'লে যাবে, একটু পরে। তুমি যদি হও পোক্ত আধার, তবে সবটুকু দয়া ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌বে। শুধু সাধুসঙ্গ কল্লে'ই হবে না, নিজ আধারকে শুদ্ধ করার জন্য ব্রহ্মচর্য্যে গভীর নিষ্ঠা চাই, সাধনে গভীর অধ্যবসায় চাই।

পূর্ব্ব দীক্ষিতের পুনর্দীক্ষা

মোচাগড়া আশ্রম হইতে জনৈক কর্ম্মী এই মাত্র রহিমপুর আশ্রমে আসিয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীবাবাকে বলিলেন,—মোচাগড়াতে অনেকে আপনার নিকট দীক্ষা চান। তারা পূর্ব্বে অন্যত্র দীক্ষিত।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পূর্ব্বে একবার যার বিয়ে হ'য়ে গেছে, তেমন মেয়ের ফিরে বিয়ে দেওয়া যেমন ব্যাপার, পূর্ব্বে একবার যার দীক্ষা হ'য়ে গেছে, তাকে আবার অন্যত্র দীক্ষা দেওয়াও তেমনই ব্যাপার। সহজ অবস্থায় এর আমি অনুমোদন করি না।

হুজুগ ও দীক্ষা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দীক্ষা নেওয়া একটা ফ্যাসানে দাঁড়িয়েছে। যেন, দেখাদেখি নাচা। এটা জাতির মঙ্গলের চিহ্ন নয়। যাকে দেখ, তার কাছ থেকেই একটা কাণে-ফুঁ নেওয়া একটা ব্যাধি-বিশেষ। প্রকৃত বৈদ্য বিকার-গ্রস্ত রোগীকে ঔষধ দিতে রোগের সূক্ষ্ম বিচার করেন, অন্ন-পথ্য দেবার আগে উপযুক্ত কাল অপেক্ষা করেন। বলা নেই, কহা নেই, একটা ফোঁস্-মন্ত্র দিয়ে ফেল্লেই হ'ল না, নিয়ে ফেল্লেও হ'ল না।

দীক্ষার মানে নবজন্ম লাভ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দীক্ষার মানে একটা rejuvination of life (নবযৌবন সঞ্চারণা) বা আরো-সত্য ক'রে বল্‌তে গেলে, দীক্ষা হল rebirth (নবজন্ম)। No one can take Diksha if not inspired within by a zeal for a new life i. e. rebirth (দীক্ষা কেউ নিতে পারে না, যদি নূতন জীবন, মানে, নবজন্ম লাভের প্রবল প্রেরণা দ্বারা চালিত না হয়)।

চাচা, আপন বাঁচা

পরিশেষে কর্ম্মীটীকে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন, —এ সব ত বাবা অপরের বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা। কে আমার কাছ থেকে ধর্ম্ম-জীবনের দীক্ষা গ্রহণ কর্ব্বে আর না কর্ব্বে, সে সব ভাব্‌না ছেড়ে দাও। তুমি ত বাবা অনেক আগেই দীক্ষা পেয়েছ! তুমি শুধু ভাব্‌তে থাক, কিসে তোমার দীক্ষার মর্য্যাদা থাকে, কিসে তুমি নিজের জীবনকে এই দীক্ষার ভিতর দিয়ে পূর্ণরূপে বিকশিত কত্তে পার, সার্থক কত্তে পার। গুরুভ্রাতা আর গুরুভগ্নীদের দলপুষ্টি ক'রে জগদুদ্ধার না ক'রে আগে নিজের বল বাড়িয়ে নিজেকে উদ্ধার কর। সাধন কর বাবা, সাধন কর। অসাধকের জীবনে সুখও নেই, শান্তিও নেই।

দীক্ষার পাত্রাপাত্র

মোচাগড়া-নিবাসিনী জনৈকা ভক্তিমতী মহিলা মোচাগড়া আসিয়া দীক্ষাপ্রার্থী ও প্রার্থিনীদিগকে দীক্ষা দিয়া যাইবার জন্য যে পত্র লিখিয়াছেন,

উক্ত কর্ম্মীর মারফৎ শ্রীশ্রীবাবা তাহার উত্তরে নিম্নরূপ পত্র প্রেরণ করিলেন,—

'স্নেহের মা,—*** দীক্ষা লওয়াটা কি একটা হুজুগের ব্যাপার? দশজনে লয়, তাই দীক্ষা লইতে হইবে, ইহাই কি দীক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য? দীক্ষা কি শুধু একটা কাণে-ফুঁ? দীক্ষার কি কোনও সত্য সার্থকতা কিছু নাই?

"দীক্ষা যাহারা লইতে চাহে, তাহাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য এই বিষয়ে চিন্তা করা। একটা ব্যবসায় পাতাইবার ফন্দীরূপে দীক্ষাদান কার্য্যকে গ্রহণ করিয়া একশ্রেণীর গুরুরা দীক্ষার সম্মান নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। অপর শ্রেণীর গুরুরা পাত্র-অপাত্র বিচার না করিয়া যাকে তাকে দীক্ষা দান করিয়া দীক্ষার কৌলীন্য নাশ করিয়াছেন। আমি চাহি না, দীক্ষার এইরূপ শোচনীয় অকৌলীন্য আর হোক।

"তোমাদের ওখানে অনেকেই দীক্ষা লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এই ব্যস্ততাকে ব্যগ্রতা বলিয়া আমি মনে করি না। সুতরাং তালে-বেতালে দীক্ষা দিয়া আমি বৃথা কর্ম্মভোগ বাড়াইতে চাহি না। সত্য সত্যই যাহারা ভগবৎ-সাধনার পথে দিব্য জন্ম লাভ করিতে চাহে, দীক্ষার শুভফলদায়িত্বে সত্য সত্যই যাহাদের দৃঢ়া আস্থা উপজাত হইয়াছে, দীক্ষা শুধু তাহাদেরই প্রাপ্য।"

সাধু গৃহস্থ হও

নবীপুর-নিবাসী একটী ভক্ত যুবকের বিবাহ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যুবকটী এই বিষয়ে শ্রীশ্রীবাবার অনুমতি লইতে আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—এইমাত্র আমি একটী ছেলেকে ব'লে দিয়েছি, সন্ন্যাসের চেয়ে sublime life (উন্নত জীবন) আর কিছু হ'তে পারে না। মানে, আমার চ'খে সন্ন্যাসীর চেয়ে সুন্দর জিনিষ আর কিছু নেই। আবার এখনি তোকে বল্‌তে হবে যে, বিবাহিত জীবন খুব ভালজীবন, এতেই শান্তির উৎস। কেমন বেটা, কথাগুলি self-contradictory (আত্মবিরোধী) শুনাবে না? যুবক হাসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সাধু গৃহস্থকে আমি সমগ্র অন্তর দিয়ে সম্মান করি ও শ্রদ্ধা করি। তোরা যথার্থ সাধু গৃহস্থ হ।

বিবাহের দোষ ও গুণ

পরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—You become double by marriage or half by it. [বিবাহ ক'রে তুমি দ্বিগুণ শক্তিশালীও হ'তে পার, আবার অর্দ্ধেকও হ'য়ে যেতে পার।] বিবাহের ফল কার জীবনের বৃক্ষে যে কি রকম ফল্‌বে, তা কে বল্‌তে পারে? অনুকূল ভার্য্যা পেয়ে কেউ মহাবল ঐরাবতের বিক্রমে আত্মোন্নতি কর্ব্বে, প্রতিকূল ভার্য্যা পেয়ে বন্যার স্রোতে তৃণের মত কেউ ভেসে যাবে।

বিবাহার্থী ও নববিবাহিতের কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু ভবিতব্য বাবা যাই হোক্, বিয়ে করাই যখন ঠিক্, বীরের মত ক'রে ফেল। সঙ্কল্প নিয়ে বিয়ে কর যে, স্ত্রীকে তুমি ভগবানের পথে সহায়িকা রূপে গ'ড়ে তবে ছাড়্‌বে। সঙ্কল্প কর যে, তার কাছে তোমার চরিত্রের পশুত্বপূর্ণ অংশটাকে খুলে না ধ'রে দেবত্বপূর্ণ অংশটাই খুলে ধর্‌বে, যাতে এই সুকুমারী কিশোরীর মনে বিবাহের রাত্রি থেকেই উচ্চ ভাবের প্রেরণাসমূহ জাগ্‌তে থাকে। বিবাহিত জীবনের প্রচলিত নিকৃষ্ট অর্থ না ধ'রে একটা বৃহত্তর আদর্শের প্রতি গতিশীল অর্থ যাতে নব পরিণীতা পত্নী সহজেই অনুভব কর্ত্তে পারে, দেহে, মনে, প্রাণে তার মত তুমি চেষ্টাশীল হও। তাতেই দ্বিগুণিত হবে, শক্তি-ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচ্‌বে।

রহিমপুর আশ্রম
১৫ আষাঢ়, ১৩৩৮

জানো, তুমি অখণ্ড-পরাণ

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা দ্বারভাঙ্গা রাজ-হাইস্কুলের জনৈক ছাত্রকে পত্র লিখিলেন,—

"কল্যাণীয়বরেষু—

(১)

"সত্যেরে যে করে আলিঙ্গন,
মিথ্যারে সে করে পরাজিত,
ধর্ম্মে যার নিয়ত রমণ,
অধর্ম্মে সে করে পদানত।

(২)

"সংযমেতে দৃঢ়া নিষ্ঠা যার,
অসংযম ভয় বাসে তারে ;
দুঃখে যার নাই হাহাকার
সুখ তারে চাহে বারে বারে।

(৩)

"নিত্যসুখে রতি নাহি যার,
অসত্যের পিছে ঘু'রে মরে।
তৃপ্তিহীন ক্ষণিকার মোহে
দুঃখময় অন্ধকূপে পড়ে।

(৪)

"জানো, তুমি কেশরি-বিক্রম,
জানো, তুমি ব্রহ্মের সন্তান,
জানো, তুমি শুদ্ধ, গতক্লম,
জানো, তুমি অখণ্ড-পরাণ। ইতি

আশীর্ব্বাদক

—স্বরূপানন্দ—"

কৃষিই পবিত্রতম জীবিকা

ত্রিপুরা-আকুবপুর নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"কৃষির আয় অতি পবিত্র আয়। কোনও মানুষকে প্রতারিত না করিয়া, কাহারও মুখের গ্রাস কাড়িয়া না নিয়া, নিজের সম্মান অটুট অক্ষত রাখিয়া,

স্বকীয় চরিত্রে একটী মাত্র কলঙ্ক-রেখাও পড়িতে না দিয়া অন্নার্জ্জন একমাত্র কৃষকেই করিতে পারে। ভূমি-লক্ষ্মীর সেবা এই জন্যই আর্য্য ঋষিরা স্বহস্তে করিতেন এবং শ্রদ্ধাসহকারে করিতেন। পেট ভরিয়া খাইবার মত পুণ্য নাই, —একথা তোমরা আমার নিকটে বহুবার শ্রবণ করিয়াছ এবং পেট ভরিয়া খাইতে হইলে যার যার অন্ন তার তার নিজ নিজ হস্তে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে।"

বাজে মাল দিয়া সম্প্রদায়-পরিপুষ্টি

উক্ত ভক্তের জনৈক সতীর্থকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—"যা' তা' বাজে মাল নিজেদের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গণ্ডীর ভিতর ঢুকাইতে চেষ্টা না করিয়া নিজেদের ভিতরে প্রেম, পবিত্রতা ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যই বিশেষ ভাবে উৎসাহশীল হইবে। সন্দিগ্ধ-চরিত্র ব্যক্তিদের দ্বারা সম্প্রদায়-পরিপুষ্টি অতীব বিপজ্জনক।"

রহিমপুর আশ্রম

১৬ আষাঢ়, ১৩৩৮

স্ত্রীর প্রতি তপঃসাধনেচ্ছু স্বামীর কর্ত্তব্য

অদ্য নোয়াখালী হইতে জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্ম দর্শনে শুভাগমন করিলেন। সন্ধ্যার পরে গোমতী তীরে উভয়ের আলাপ আলোচনা হইল।

ভক্তের জীবনের বহুবিধ সমস্যার বিষয় সম্যক অবগত হইবার পরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—স্ত্রীকে সাধন-পথে টেনে না এনে তাকে বাদ দিয়ে একা একা সাধন করা যেমন মূর্খতা, তেমনি স্বার্থপরতা। যে স্ত্রী প্রতিনিয়ত তোমাকে পিছনে টান্‌ছে, সে যদি দয়া ক'রে পিছনে টানা বন্ধ করে, তা' হ'লে যে তোমার বল দ্বিগুণ বাড়ে। আর যদি সে আবার তোমাকে আধ্যাত্মিক তপস্যায় সহায়তা দেয়, তবে ত' তুমি তিনগুণ শক্তিশালী। এইজন্যই বুদ্ধিমান লোকেরা স্ত্রীকেও নিজের সাধন-পথে টেনে আনেন। তারপর, যে স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার সেবা ও সর্ব্বপ্রকার যত্নের তুমি সর্ব্বদা দাবী কর, এবং যার যত্ন ও সেবা প্রতিনিয়ত পেয়েও থাক, ধর্ম্মজীবনের পরমলভ্যসমূহ থেকে তাকে বঞ্চিত ক'রে রাখা ত' এক পরম অধর্ম্ম। তাই, ন্যায়পরায়ণ বিবাহিত

লোকেরা নিজ ধর্ম্মজীবনের প্রেরণাগুলিকে স্ত্রীর সাহচর্য্যের মধ্য দিয়েই সার্থকতা দিতে চেষ্টা পান। কিন্তু স্ত্রী যদি হয় একটা গাছ বা পাথর, মস্তিষ্কহীন হৃদয়হীন একটা জড় বস্তু, জন্মাবধিই যদি থাকে তার ধারণা-শক্তির অভাব, অনুভূতি-শক্তির অভাব, তবে তাকে নিয়ে জোর-জবরদস্তির প্রয়োজন নেই। তোমার সাধন-পথ তুমি বীরেন্দ্র-বিক্রমে চল্‌তে থাক, তোমার স্ত্রীর ভিতরে যা প্রেরণা জাগা সম্ভব, তা তোমার একান্ত নির্ভরশীল ভগবৎ-পরায়ণতার ফলে ভগবানেরই কৃপায় আপনি জাগ্‌বে। আজ না জাগে, ত' কাল জাগ্‌বে। আর, কখনই যদি না জাগে, তবে বুঝ্‌বে, স্ত্রী তার অলঙ্ঘনীয় প্রাক্তন নিয়ে এসেছেন, এ জন্মের সৎসঙ্গ তাঁকে আগামী জন্মের জন্য আনুকূল্য দেবার কারণ-স্বরূপ হবে মাত্র, কিন্তু এজন্মে হয় ত' আর কিছু হবার জো নেই। তাঁর প্রতি কৃপালু হও, অনুকম্পাপরায়ণ হও এবং তাঁর উপরে অত্যাচার না ক'রে তাঁর স্বভাবের পথে তাঁকে অগ্রসর হতে দাও।

বাঙ্গরা

১৭ আষাঢ়, ১৩৩৮

অবনীবাবুর ছাত্র-হিতৈষণা

অদ্য প্রাতে শ্রীশ্রীবাবা বাঙ্গরা পৌঁছিয়াছেন। বাঙ্গরার জমিদার রায়সাহেব রূপেন্দ্র লোচন মজুমদার মহাশয় মহাসমাদরে শ্রীশ্রীবাবাকে নিজালয়ে অভিনন্দন করিয়া আনিলেন। বাঙ্গরা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অবনী মোহন মজুমদার এম, এ, বি-এল মহাশয় বলিলেন,—"আপনাকে আমরা ভাগ্যবশে যখন পাইয়াছিই, তখন ক্রমান্বয়ে কিছুদিনের জন্য চাই। নষ্ট-চরিত্র যুবক-সমাজের ব্যথার ব্যথী আপনি, আপনার সঙ্গ দ্বারা এরা সবাই প্রণষ্ট মনুষ্যত্ব ফিরিয়া পাউক, ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা।" তৎপরে তিনি আরও বলিলেন যে, ছাত্রদিগকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করিবার জন্য প্রত্যেক শ্রেণী হইতেই একের পর এক করিয়া সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইবেন,—অবশ্য যদি শ্রীশ্রীবাবা অনুমতি দেন। শ্রীশ্রীবাবা সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

দ্বিপ্রহরের পরে দুই একটী করিয়া ছাত্র শ্রীশ্রীবাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে লাগিল। অধিকাংশকেই শ্রীশ্রীবাবা তাহাদের প্রয়োজন বুঝিয়া স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, বৈরাগ্য, কর্ম্মনিষ্ঠা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, আদর্শানুরাগ প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। কেহ কেহ প্রশ্নাদি করিল, শ্রীশ্রীবাবা তাহারও উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন।

কুকার্য্যে আসক্ত অঙ্গের উপরে ইচ্ছার শক্তি

একটী যুবকের নিবেদন শুনিবার পরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দিবারাত্র তোমার হাতটাকে বল্‌তে থাক, যেন সে পাপকাজে নিজেকে না ব্যবহৃত হ'তে দেয়। বারংবার মনে মনে বল্‌তে বল্‌তে এই বলাটী একটী আশ্চর্য্য শক্তি পাবে। প্রথম বার বল্‌বার সময়ে যা মনে হবে অসম্ভব ব্যাপার, এক লক্ষ বার বল্‌লে পরে দেখ্‌বে যে, তাই তোমার প্রায় স্বভাবে পরিণত হয়ে এসেছে। শরীরের প্রত্যেকটী অঙ্গের উপরে মনকে স্থির কর, আর suggestion (অনুজ্ঞা) দিতে থাক যে, এই অঙ্গ কখনো কোনো অন্যায় কাজে ব্যবহৃত হবে না। শত সহস্র লক্ষ বার এই অনুজ্ঞা চালাতে থাক। দেখ্‌বে, তার ফলে তোমার মস্তিষ্কের ভিতরে সৎ-সঙ্কল্পের এমন এক ছাপ প'ড়ে যাবে যে, অসৎ পথে চল্‌তে চাইলেই মস্তিষ্কের ভিতর থেকেই প্রবল বাধার সৃষ্টি হবে। পূর্ব্বে যখন শরীরের কোনো অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গকে কোনো অন্যায় কাজের জন্য আদেশ দিয়েছ, তখনি তোমার মস্তিষ্কের উপরে সেই আদেশের একটা ছাপ পড়েছে। এ ভাবে বহুবার একই ছাপ পড়্‌তে পড়্‌তে কুকাজ একটা অতি সহজ অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। সমগ্র শরীর ও সমগ্র মনকে কুকার্য্য-বিরোধী অনুজ্ঞা লক্ষ লক্ষ বার দিতে দিতে মস্তিষ্কের উপরে আবার একটী বিরুদ্ধ ছাপ পড়্‌বে। এই নূতন ছাপটী যতই স্পষ্ট হবে, উজ্জ্বল হবে, পুরাতন ছাপটী ততই মলিন ও ততই অদৃশ্য হ'তে থাক্‌বে। এভাবে ক্রমশঃ মস্তিষ্ক থেকে পাপের ছাপ লোপ পেয়ে গেলে তোমার পক্ষে দেহকে পাপ কার্য্যে নিয়োগ করাই এক অসম্ভব ব্যাপারে পরিণত হবে। সুতরাং হাত, পা, চ'খ, নাক, কাণ প্রভৃতি প্রত্যেকটী

ইন্দ্রিয়ে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মন স্থির ক'রে অনুজ্ঞা দেবার অভ্যাস কত্তে থাক যে, এরা কিছুতেই কোনো পাপানুষ্ঠানে নিজেদিগকে ব্যবহৃত হ'তে দেবে না।

নিজের ইচ্ছাকে ভগবদিচ্ছার অনুগত কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু তোমার ইচ্ছার শক্তিকে অমোঘ-বীর্য্য করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে, তোমার ইচ্ছার সাথে ভগবদিচ্ছাকে এক ক'রে নেওয়া। তুমি যখন নিজের ইচ্ছায় কাজ কর, তখন ভাল ভেবেও অনেক মন্দ কাজ ক'রে ফেল, কারণ তোমার দৃষ্টি ত্রিকালব্যাপিনী নয়। কিন্তু তুমি যখন ভগবদিচ্ছায় কাজ কর্‌বে, তখন আপাত-দুঃখদ ব্যাপারও অনন্ত সুখের উৎপাদক হয়, কারণ ভগবানের দৃষ্টি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালকে নিয়ে। নিজের ইচ্ছাকে সর্ব্বতোভাবে ভগবানের ইচ্ছার অনুগত ক'রে নিতে প্রয়াসী হও,—এবং জান্‌বে, তাঁর পরম পবিত্র নাম জপ থেকেই তোমার ভিতরে নিজের ইচ্ছার লোপ হ'য়ে তাঁর ইচ্ছার বিকাশ ঘট্‌বে।

নামের সেবা করে যারা
তাদের আবার কিসের ভয়,
বেচালে তার পা পড়ে না
যে জন সদাই নামে রয়।

কিসের হিসাব কিসের নিকাশ
নাম ক'রে তুই মিটারে আশ,
চল্‌তে পথে শত মতে
নামেতে মন কর্‌ বিলয়।

নামের মাঝে নামীর বল
লুকিয়ে থাকে অবিরল,
আগুনের উত্তাপের মত
দগ্ধ করে দুঃখচয়।

যোগ-যাগে যার নাই অধিকার
নামের গুণে সব হবে তার,
বিশ্ব-ভুবন আপন হবে
আরাধ্য ধন সর্ব্বময়।

—নামের গুণে বিপথচারী চরণদ্বয় বিনা চেষ্টায় সৎপথে ফিরে আস্‌বে। ভাল-মন্দের বিচার-বিবেচনার ভিতরে তোমাকে যেতে হবে না, নামের ভিতরে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টার ফলে নামের মধ্য থেকে ভগবানের ঐশী কৃপা অবতীর্ণ হ'য়ে নিজের শক্তিতে সব বাধা, সব বিঘ্ন, সব প্রলোভন, সব আকর্ষণ নষ্ট ক'রে দিয়ে বিশ্ব-জগতের সাথে তোমার সেই আপনত্ব প্রতিষ্ঠা ক'রে দেবে, যে আপনত্বের ভিতরে প্রীতি আছে কিন্তু প্রতিক্রিয়া নেই, যে আপনত্বে মধু আছে কিন্তু মাদকতা নেই।

উপস্থমূলে মহাপুরুষ-ধ্যানের সুফল

অপর একটী যুবক সমাগত হইলে তাহাকে শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিলেন,— তোমার উপস্থের মূলদেশে কোনও জিতেন্দ্রিয় নিষ্কাম নিষ্কলুষ মহাপুরুষের ধ্যান ক'রো। তাতে ইন্দ্রিয়-চপলতার বিশেষ প্রতিষেধ হবে।

উপস্থিত যুবক নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সম্পর্কে কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করে। তাই শ্রীশ্রীবাবার মুখে মহাপুরুষ-মূর্ত্তি ধ্যানের উপদেশ পাইয়া একটু দ্বিধা-পীড়িত হইল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মানুষটীকে মানুষ জেনেই ধ্যান ক'রো। তাঁকে ঈশ্বর ব'লে মনে কত্তে কে বলেছে? মানুষটীকে ধ্যান কর্ব্বে তাঁর গুণ-গুলির জন্য, তাঁকে ধ্যান করার মানে তার গুণগুলির ধ্যান করা। কিন্তু মনে যদি বুঝ না পাও, বা তেমন কোনো মহাপুরুষ তোমার জানার ভিতরে না থাকে, তাহ'লে একটী কৌশল অবলম্বন কর্ব্বে। সেইটী হচ্ছে এই যে, প্রথমতঃ কিছুক্ষণ কল্পনা কত্তে থাক্‌বে যে, তুমি যেন দীর্ঘকাল তপশ্চর্য্যা ক'রে একজন জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষে পরিণত হ'য়েছ, তপস্যার জ্যোতি তোমার চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হচ্ছে, তোমার অন্তর-প্রদেশ পবিত্রতার এক অপূর্ব্ব

আধারে পরিণত হ'য়েছে। এই কল্পনাটী যখন বেশ জমে উঠ্‌ল, তখন নিজের সেই পবিত্র মূর্ত্তিটীকে উপস্থমূলে ধ্যান কত্তে থাক্‌বে, আর মনে মনে বারংবার জপ কর্ব্বে "জিতেন্দ্রিয়" "জিতেন্দ্রিয়" এই শব্দটী।

কোন বস্তুতেই ভোগ-চিহ্ন আবিষ্কারের চেষ্টা করিও না

অতঃপর আর একটী যুবক আসিল। শ্রীশ্রীবাবা তাহাকে বলিতে লাগিলেন,—ইতর ভোগাকাঙ্ক্ষা যদি কারো দীর্ঘকাল ধ'রে বাড়্‌তে থাকে, তাহ'লে তার এমনি এক স্বভাব দাঁড়িয়ে যায় যে, যে-কোনও বস্তুর দিকে সে তাকাক না কেন, সে শুধু ভোগের চিহ্নই দেখ্‌তে পায়, শুধু ভোগের বিষয়ই কল্পনা করে। কারো বিছানার চাদরখানা একটু এলোমেলো দেখ্‌লে সে কল্পনা করে যে, এ শয্যা ইতর কাজে ব্যবহৃত হ'য়েছে। কারো চ'খে একটু ঘুমের আমেজ দেখ্‌লে সে অনুমান করে, নিশ্চয়ই সে সারারাত জেগে ফূর্ত্তি করেছে। নির্জ্জন স্থানে গেলে তার জিহ্বায় আস্‌তে চায় যত কদর্য্য অপভাষা। পায়খানায় গেলে তার ইচ্ছা করে বিশ্রী অশ্লীল সব ছবি আঁকতে। তখন তার এমন দুরবস্থা হয় যে, মাতা-ভগ্নীর কথা ভাব্‌তেও অন্তরে পবিত্রতা রক্ষা কত্তে পারে না। চিত্তটা তার ভোগের বিষে একেবারে জর্জ্জরিত হ'য়ে যায়। ফলে সে ক্ষিপ্তের মত হ'য়ে যায়, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়ে, যা' কর্ব্বার নয় এমন অনেক কাণ্ড ক'রে ফেলে এবং অধিকাংশ সময়ই কামের বিষ হাল্কা ক'রে নেবার জন্য প্রাণপণে আবার কামেরই চর্চ্চা করে। ঐ সকল যুবকের নিকটে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকার, এমন কি একখানা ছবির বা প্রতিমার পর্য্যন্ত, মান বাঁচ্‌বার উপায় নেই। এরা নিজেদেরও শত্রু, সমাজেরও শত্রু, দেশেরও শত্রু। প্রতিজ্ঞা কর, নিজের সঙ্গে বা পরের সঙ্গে এরকম শত্রুতা আর কর্ব্বে না।

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—ভগবানের নাম এই আত্মবৈরিতা নাশ করে, সমাজ-বৈরিতা নাশ করে, দেশ-বৈরিতা নাশ করে। নামের আশ্রয় নাও, নামের সন্তাপহারী, সর্ব্বদুঃখ-বিদূরণকারী অমৃতের সমুদ্রে ডুব দাও।

সমাজের উন্নতির মাপকাটি

অপর একটী যুবক আসিলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে সমাজের মধ্যে কামুক লোকের সংখ্যা যত বেশী, বুঝ্‌তে হবে, সে সমাজ তত অবনত। সমাজের অধিকাংশ লোক দরিদ্র হ'লেই মনে ক'রো না যে, এ সমাজে মনুষ্যত্ব নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় ডিগ্রীধারী লোকের প্রাচুর্য্য যে সমাজে কম হবে, তাকেই হীন পতিত ব'লে মনে ক'রো না। চরিত্রবলই সমাজের উন্নতির পরিচায়ক। পর-স্ত্রীতে মাতৃত্ব-বোধ তুমি তোমার সমাজে জাগাতে পেরেছ? যদি পেরে থাক, তবেই আমি বল্‌ব, তুমি উন্নত সমাজে বাস কচ্ছ।

এই যুবকটীকেই শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—সমাজের উন্নতি সাধন কর্ত্তে হ'লেই তোমাকে সর্ব্বাগ্রে সেই উপায় উদ্ভাবন কর্ত্তে হবে, যার ফলে কিশোর ও যুবকেরা অকাল ও অবৈধ বীর্য্যক্ষয় ত্যাগ কর্ব্বে, কিশোরী ও যুবতীরা পুরুষদের মনে চঞ্চলতা আনয়নের সহায়তা কর্ত্তে ঘৃণাভরে বিরত হবে, কুলস্ত্রীরা পর-পুরুষকে বর্জ্জন কর্ব্বে, পুরুষেরা পর-নারীর দিক্ থেকে লুব্ধ দৃষ্টি ফিরিয়ে আন্‌বে। যে সমাজের কুমারী বিবাহের পূর্ব্বে কারো কাছে আত্ম-সমর্পণ করে না, যে সমাজের বিবাহিতা নারী স্বামীর অফুরন্ত ভোগেচ্ছাকে যথাসাধ্য প্রশমিত ক'রে তার জীবনকে পবিত্র রাখ্‌তে চেষ্টার ত্রুটি করে না, যে সমাজের বিধবা গুপ্ত-অসংযমে সমাজকে ব্যভিচারের বিষে আচ্ছন্ন করে না, যে সমাজের দারিদ্র্য-পীড়িতা অনাথা নারী অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পড়্‌তে হ'লেও বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে না, আমি বলি, সেই সমাজই উন্নত। যে সমাজের দুর্ব্বল বালকটীও নারীর সতীত্ব বিপন্ন হ'লে সবল আততায়ীকে আক্রমণ কর্ত্তে ভয় পায় না, মুমূর্ষু বৃদ্ধও নারী-অবমাননাকারীকে ক্ষমা করে না, আমি বলি, সেই সমাজই উন্নত।

কিরূপ অভিমান আত্মোন্নতি-সহায়ক

অপর একটী যুবককে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—"আমি সৎ, আমি সাধু", এইরূপ অভিমান কর্ব্বে। তাতে সৎ থাক্‌বার সহায়তা পাবে। পাপচিন্তা যখন মনের মাঝে আস্‌বে, তখন ভাব্‌তে থাকবে,—"আমি সাধু হ'য়েও যদি এর কাছে

পরাজিত হই, তবে অপর লোকেরা কর্ব্বে কি?" পুরুষের পুরুষত্বের অভিমান থাকা ভাল। কারণ, সে যদি ভাব্‌তে থাকে "আমি পুরুষ হ'য়ে যদি দুর্ব্বলতার কাছে মাথা নত করি, তবে স্ত্রীলোকেরা কর্ব্বে কি?"—তা'হলে তার দুর্ব্বলতা বেশীক্ষণ টিক্‌তে পারে না। বলবানের বলের অভিমান থাকাও ভাল, যদি সে ভাব্‌তে জানে,—"বলবান্ হ'য়েও যদি আমি রিপুর সংযম না কত্তে পারি, তবে দুর্ব্বলেরা কর্ব্বে কি?" গুরুর ভাবা উচিত, —"আমি গুরু হ'য়েও যদি ইন্দ্রিয়-দমন কত্তে না পার্ল্লাম, তবে শিষ্যেরা কর্ব্বে কি?" পিতার ভাবা উচিত,—"আমি জন্মদাতা হ'য়েও যদি পাপ-লালসার বশীভূত হ'য়ে প'ড়ে থাকি, তবে পুত্রকন্যারা কর্ব্বে কি?" ব্রাহ্মণের ভাবা উচিত,—"আমি সমাজের মাথার মণি হ'য়েও যদি ভোগাতুর বিষ্ঠার ক্রিমির জীবনই যাপন করি, তবে শূদ্রেরা কর্ব্বে কি?" বিদ্বানের ভাবা উচিত, "আমি জ্ঞানী ও বিবেচক হ'য়েও যদি নিজেকে অপকর্ম্মে লিপ্ত করি, তা হ'লে অজ্ঞান মূর্খেরা কর্ব্বে কি?" স্ত্রীলোকদের ভাবা উচিত,—"আমি বিশ্ব-মায়ের অংশ-স্বরূপিনী হ'য়েও যদি কাম-কলুষেই ডুবে থাকি, তবে সন্তানের জাতি কর্ব্বে কি?" এই ভাবে বিচার কত্তে কত্তে লালসা ক'মে যায়।

যুবকের পক্ষে ইচ্ছাকৃত নারী-সংস্পর্শ

অপর একটী যুবকের সহিত কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তোমাদের যা বয়স, আর যতটুকু আত্মগঠন, তাতে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ইচ্ছা ক'রে খুব মিশামিশি না করাই উচিত। কারণ, এমন অনেক সময় হ'তে পারে, যখন কোনো স্ত্রীলোক তোমার প্রতি কামভাবসম্পন্না নয়, তবু তুমি তার ঘনিষ্ঠতার ভুল অর্থ ক'রে বিপদে পড়্‌তে পার। এমনও হ'তে পারে, তুমি কারো প্রতি কাম-ভাবাপন্ন নও, তবু তোমার ঘনিষ্ঠতাকে ভুল বু'ঝে কোনও স্ত্রীলোক বিপদে পড়্‌তে পারে। কখনো বা তোমারই কোনও অসতর্ক আচরণ তোমার মনে লালসার বহ্নি জ্বালিয়ে দিতে পারে। এইজন্যই স্ত্রীলোক-ঘেঁষা পুরুষগুলি এবং পুরুষ-ঘেঁষা স্ত্রীলোকগুলি অনেক সময়ে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই নিজেদের ও অপরের চারিত্রিক অনিষ্ট সাধন করে।

বাঙ্গরা
১৮ আষাঢ় ১৩৩৮

উচ্চ চীৎকার ও গম্ভীর ধ্যানাবেশ

অন্য একজন ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন যে,—পূর্ব্বে তার কীর্ত্তনাদি কালে অশ্রু, স্বেদ, পুলক, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইত এবং তিনি নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন। এখন তাহা হয় না কেন?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—উচ্চ চীৎকার ও লম্ফ-ঝম্পাদি সাধারণতঃ গভীর ধ্যানাবেশের বিরোধী। এজন্যই এতে যত সহজে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়, তত সহজে সমাধি আসে না। উচ্চ-কীর্ত্তনে চিত্তে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হ'লেই কীর্ত্তন ছে'ড়ে দিয়ে নামজপে লেগে যাওয়া উচিত। তা'হলেই সাত্ত্বিক-ভাবসমূহ নিবিড় ও অক্ষয় আনন্দের ভাণ্ডারে নিয়ে পৌছে দেয়। ভাবের বহির্ম্মুখ প্রকাশকে যে চাপ্‌তে জানে না, তার অন্তর্ম্মুখ প্রকাশ কি ক'রে হবে? অশ্রু, স্বেদ, পুলক, কম্পই সাধনের চরম লভ্য নয়, এগুলি সাত্ত্বিকতার এক প্রকারের লক্ষণ মাত্র। অশ্রু-পুলককেই চরম সার ব'লে মনে ক'রে আপনি তার পরেরও যা প্রাপ্য আছে, তাকে অনাদর করেছেন। তাই আজ আপনার আনন্দের ভাণ্ডার রিক্ত।

ভদ্রলোক বলিলেন,—জনৈক মহাপুরুষ আমাদিগকে ধর্ম্ম-বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি যা বুঝাতে চেয়েছেন, হ'তে পারে হয়ত আমরা তা ভুল বুঝেছি। কিন্তু ভুলই বুঝি আর ঠিকই বুঝি, আমরা কিন্তু মহোৎসব করা আর অহোরাত্র কীর্ত্তন করাই চরম ধর্ম্ম ব'লে মনে করেছি। আজ জীবনের সায়াহ্নে এসে মনে হচ্ছে, হয়ত মস্ত বড় এক ভ্রমই কর্‌লাম।

শ্রীশ্রীবাবা এই কথার উপরে আর কোনও উত্তর করিলেন না।

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবা বাঙ্গরা উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে "ভগবদুপাসনার প্রয়োজনীয়তা" সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ অভিভাষণ দিলেন।

অদ্য যদিও শ্রীশ্রীবাবার অবসর খুব অল্প ছিল, তথাপি বহু যুবক তাঁহার নিকট হইতে সংশয়-চ্ছেদনমূলক উপদেশ পাইল।

স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধনের উপায়

একজন প্রশ্ন করিল,—স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিবার উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পড়া মুখস্থ কর্‌বার জন্য ত ? বেশ, পড়্‌তে বস্‌বার আগে ধীর স্থির সুদৃঢ় মনে নামজপ কত্তে আরম্ভ কর। মেরুদণ্ড সরল ক'রে ব'সে, চক্ষু মুদ্রিত ক'রে, মনকে ভ্রূমধ্য-সেবী ক'রে, শ্বাস-প্রশ্বাসকে স্বাভাবিক ভাবে চল্‌তে দিয়ে, নিরুদ্বেগচিত্তে নামজপ চালাতে থাক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বাহ্যজ্ঞান রহিত হ'য়ে যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দৃঢ়বিক্রমে নাম চালাও। মন বারং-বার বিভিন্ন দিকে ঘু'রে বেড়াতে চাইলেও ঘাব্‌ড়ে যেও না। সময় একটু বেশী লেগে গেলেও চঞ্চল হ'য়ো না। মন যতক্ষণ না জপ কত্তে কত্তে শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়্‌ছে, ততক্ষণ জোর ক'রে, জবরদস্তি ক'রে, বিক্রম প্রকাশ ক'রে নাম কত্তেই হবে। তারপরে পড়া আরম্ভ কর্ব্বে। দু'একদিন শরীর কেমন অবসাদগ্রস্ত ব'লে মনে হবে, পড়াও তেমন ভাল লাগ্‌তে চাইবে না। কিন্তু নিশ্চিন্ত থেকো। কয়েক দিন যেতে না যেতেই দেখ্‌তে পাবে, এর ফলে তোমার মস্তিষ্কের ভিতরে এমন এক আশ্চর্য্য শক্তির জাগরণ এসেছে, যার প্রভাবে আগে যা শিখ্‌তে দু'দিন লাগ্‌ত, এখন তা দু'ঘণ্টার মধ্যে অনায়াসে শিখে ফেল্‌তে পাচ্ছ। কথায় বলে,—"নচ দৈবাৎ পরং বলম্"—"দৈবের সমান বল নাই"। কিন্তু সেই বলও পুরুষকারের প্রয়োগের মধ্য দিয়েই জাগ্রত হয়।

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধনের আরও একটা উপায় আছে। পড়্‌বার সময়ে পুস্তক-লিখিত প্রত্যেকটা শব্দ ওজন ক'রে ক'রে পড়্‌বে এবং একবার পড়া হ'য়ে যাবার পরেই বই বন্ধ রে'খে মনে মনে আলো-চনা ক'রে দেখ্‌বে, সবটা তুমি ঠিক ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছ কিনা, সব কথা তোমার মনে আছে কিনা। তারপরে পুস্তক খুলে আবার মিলিয়ে দেখ্‌বে। এই ভাবে বারংবার কল্লে অধ্যয়ন খুব পাকা ত হবেই, সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি-শক্তিও খুব বাড়্‌বে।

ভগবান্‌কে স্মরণ রাখাই প্রকৃত স্মৃতিশক্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—শুধু এই স্মৃতির কথাই আমি ব'লে ক্ষান্ত

হব না, এর চেয়ে বড় স্মৃতির কথাও তোমাকে বল্‌ব। সর্ব্বদা ভগবানকে স্মরণ রাখ্‌তে পারাই হচ্ছে প্রকৃত স্মৃতিশক্তি। দিন নাই, রাত্রি নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, সম্পদ নাই, বিপদ নাই, নিদ্রা নাই, জাগরণ নাই, গমন নাই, উপবেশন নাই, সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় তাঁকে স্মরণ রাখ্‌তে পারাই হচ্ছে স্মৃতিশক্তির যথার্থ সার্থকতা। কিন্তু এ স্মৃতি সকলের জাগে না, মাত্র তারই জাগে, যার বীর্য্য অর্থাৎ উৎসাহ ও অধ্যবসায় আছে। চিত্ত ক্লান্ত হ'লেও যে তাকে কৌশলপূর্ব্বক ঈশ্বর-চিন্তনে নিয়োজিত করে, চিত্ত অনিচ্ছুক হ'লেও যে তাকে ঈশ্বর-ধ্যানে জোর ক'রে বসিয়ে দেয়, চিত্ত অন্য বিষয়ের পানে ছুটে যেতে চাইলেও যে তাকে প্রবল পুরুষকার সহকারে টেনে আনে, সে-ই শুধু এই ঐশ্বরিকী স্মৃতিতে সিদ্ধিলাভ কর্ত্তে পারে। এই স্মৃতি যার লাভ হয়, সে বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর-ধ্বনিতেও শ্রীভগবানের ওঙ্কার-রূপী মহানাম শুন্‌তে পায়, আবার রণক্ষেত্রের কামান-গর্জ্জনেও তার কাণে নামের ধ্বনিই ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে। নিস্তব্ধ নীরব গগন-মধ্যেও সে অনাহত অখণ্ড-নাদই শ্রবণ করে, নিজের শরীরের রক্তের স্পন্দনে বা শ্বাসের চঞ্চলতায়ও সে নামেরই পরশ পায়। এই স্মৃতি যার লাভ হয়, বৃক্ষ-লতা, গিরি-নদী, জল-স্থল, মানুষ-পশু যে-কোনও বস্তু তার দৃষ্টিতে পড়ুক, সব তার ওঙ্কারময় হ'য়ে যায়, ভগবানের নাম ছাড়া আর কোনও বস্তুই সে স্বতন্ত্রভাবে দেখ্‌তে পায় না, তাঁর নামের মধ্য দিয়েই তাঁর চ'খে ব্রহ্মাণ্ডের সকল দৃশ্য ফুটে ওঠে।

ঈশ্বরীয় স্মৃতি সাধনের উপায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু এই ঈশ্বরীয় স্মৃতি সাধনেরও উপায় আছে। প্রথমতঃ অভ্যাস কর্ত্তে হবে, যেন, নাম স্মরণ মাত্র এ নাম কার নাম, তাও স্পষ্ট-রূপে স্মরণ হয়। মুখে বল্‌ছি হরি হরি, মন ভাব্‌ছে মর্ত্তমান কলা, এ রকম অভ্যাস হ'লে চল্‌বে না। এমন অভ্যাস হওয়া চাই যেন নামটী স্মরণ বা উচ্চারণ মাত্র একমাত্র ঈশ্বরের কথাই মনে জাগে, নাম-স্মরণ-কালে যেন ঈশ্বর ব্যতীত অন্য স্মৃতি জাগরিতা না হ'তে পারে। সতী-নারী যেমন ভ্রমেও স্বামীর সঙ্গে ছাড়া অন্যের সঙ্গে ঘুমায় না, ঠিক তেমনি এমন অভ্যাস জন্মান চাই যেন

নামের উচ্চারণ তোমাকে ঈশ্বরের স্মৃতিতেই পৌঁছে দেয়, কালী কালী জপ্‌বার সময় চটীজুতার কথা না ভাব, খোদা খোদা জপ্‌তে আরম্ভ ক'রে মরা গরুর ধ্যান না কর। আবার এ ও অভ্যাস কত্তে হবে, যেন অজ্ঞাতসারেও কখনো ভগবানের কথা মনে পড়্‌লে সঙ্গে সঙ্গে তোমার এই নির্দ্দিষ্ট নামটী মনে পড়েই পড়ে। জপ কচ্ছ ক্লীং-কৃষ্ণ, আর ভগবানের কথা মনে পড়লে যদি ক্লীং-কৃষ্ণ স্মরণে না এসে রাং-রাম মনে পড়ে, তবে বুঝ্‌বে, তোমার অভ্যাস এখনো পূরাপূরি ঠিক্ হয়ে আসে নাই।

চাই সজাগ স্মৃতি

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এইরূপ ঈশ্বরীয় স্মৃতি সর্ব্বদা উদ্দীপিত রাখ্‌তে হ'লে একটী বিষয়ে কঠোর সতর্কতা চাই। সেটী হচ্ছে এই যে, শত্রু-বেষ্টিত দুর্গের নৈশ প্রহরী যেমন সঙ্গোপনে সজাগ থাকে, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনিবার লক্ষ্য কত্তে থাকে, সব ঠিক আছে কিনা, তেমনি তোমাকেও সর্ব্বদা খুব হুঁশিয়ার থাকৃতে হবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে যে, নামজপের কালে নামীর অর্থাৎ ভগবানের কথা স্মরণে আছে কিনা। জান্‌তে হবে, নিজের চিত্তটাকে যেন একেবারে সম্মুখে রেখেই তুমি তাঁকে দর্শন কচ্ছ এবং যখনই চিত্ত ঈশ্বরীয় স্মৃতি থেকে বিচ্যুত হচ্ছে, তখনি সঙ্গীনের খোঁচা দিয়ে তাঁকে সজাগ ক'রে দিচ্ছ। তোমাকে মনে রাখ্‌তে হবে যে, একদিকে তুমি যেমন ঈশ্বরীয় ভাবের স্মরণকারী, অপর দিকে তুমি তেমন ক্ষণিক বিস্মৃতি ঘট্‌লে তারও নির্ম্মম শাসনকারী।

উপাসনা-কালে মন স্থির করিবার উপায়

অপর একটী যুবক প্রশ্ন করিলেন,—উপাসনা কালে মন স্থির করিবার উপায় কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শ্রেষ্ঠ উপায় অভ্যাস। কিন্তু অভ্যাসকে সহায়তা দানের জন্য কতকগুলি বিধি পালনও হিতকর। যেমন, স্নানান্তে উপাসনায় বস্‌লে সহজে মন স্থির হয়। "হয়ত আর দু-ঘণ্টা পরেই আমার মৃত্যু হ'তে পারে",—এইরূপ বিচারও সহজে মনকে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট করে। যাঁর

মনটী স্থির, অচঞ্চল, শীতের সমুদ্রের ন্যায় প্রশান্ত ও দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল, এমন ব্যক্তির মনটীর কথা ভাব্‌লেও চিত্তস্থৈর্য্যের সহায়তা হয়।

গুরুমূর্ত্তি-ধ্যান ও চিত্তস্থৈর্য্য

প্রঃ—এই কারণেই কি গুরুমূর্ত্তি ধ্যানের বিধান আছে ?

শ্রীশ্রীবাবা :—কতকটা। কারণ, স্থিরমনা পুরুষের ধ্যানে মনের স্থিরতা কতকটা আসেই। ত্যাগীর ধ্যানে ত্যাগ-বুদ্ধি জাগে, যোগীর ধ্যানে যোগানুরাগ বাড়ে, জিতেন্দ্রিয় পুরুষের চিন্তনে ইন্দ্রিয়-সংযমের আগ্রহ বর্দ্ধিত হয়।

যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিন্তু গুরু যার চঞ্চল-চেতা, লম্পট ও স্বার্থের ক্রীতদাস, সে কি কর্ব্বে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এস্থলে তার কর্ত্তব্য, শ্রীভগবানকেই একমাত্র গুরু ব'লে বিশ্বাস ক'রে তাঁরই মহিমার ধ্যান করা। অথবা এই সময়েই বা বলি কেন, সর্ব্বসময়েই ভগবান্‌কে তোমার গুরু ব'লে চিন্তন কর্ব্বে। যিনি মন্ত্র দিয়েছেন, তাঁকে ভগবানের নামের বাহক মাত্র জ্ঞান ক'রে মনকে আদি-গুরুর চরণে লগ্ন কর্ব্বে।

স্ত্রীলোক-দর্শনে ভোগলিপ্সা-দমন

অপর একটী যুবক তার পারিবারিক জীবনের নানা কদর্য্য প্রলোভনের কথা অকপটে শ্রীশ্রীবাবার চরণে নিবেদন করিয়া আশ্রয়-ভিক্ষা করিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সর্ব্বাগ্রে অন্তরের ভিতরে ঈশ্বরে-বিশ্বাস জাগ্রত কর। তর্ক-যুক্তি দিয়ে নয়, কারণ, সে পথ দুরধিগম্য। তর্ক-দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার অধিকার শুধু তাদেরই, যারা অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যের অভাবনীয় শক্তিতে দিব্য চিন্তা-শক্তির অধিকারী হয়েছেন। তুমি শুধু মনের উপরে অহর্নিশ এই seggestion (আদেশ বা ছাপ) ফেল্‌তে থাক যে,—"ওমস্তি, ওমস্তি, ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর আছেন।" ঈশ্বরাস্তিত্বের সমর্থক প্রমাণ-প্রয়োগের অপেক্ষা ক'রো না, সংশয়ান্দোলিত চিত্তের সংশয় বৃথা তর্ক দিয়ে আরো বাড়াতে যেয়ো না, তুমি প্রাণপণে কেবল জপ্‌তে থাক, "ওমস্তি,—ঈশ্বর আছেন।" অভ্যাসের ফলে ক্রমশঃ তোমার চিত্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব-চিন্তনে প্রসন্নতা অনুভব কর্ব্বে। তখনই

জান্‌বে যে, ভোগস্পৃহা দমন তোমার পক্ষে সহজ। যে চক্ষুদুটী দেখলে লালসার আকর্ষণে অধীর হ'য়ে যাও, তার সেই চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্যেও "ওমস্তি, ঈশ্বর আছেন," এই কথা ভাব্‌তে থাক। যে অধর দর্শনে চুম্বনের লালসায় তোমার অধর উন্মত্ত হ'য়ে ওঠে, ভাব্‌তে থাক, সে অধরেও "ওমস্তি, ঈশ্বর আছেন।" যে পীনোন্নত পয়োধর দর্শনে তাকে বুকে চেপে ধর্‌বার জন্য পাগল হ'য়ে ওঠ, ভাব্‌তে থাক, সে পয়োধরেও "ওমস্তি, ঈশ্বর আছেন।" যার গুপ্তেন্দ্রিয়ের কথা স্মরণে তোমার সর্ব্বাঙ্গে লাম্পট্যের তীব্র হলাহল যেন বর্ষাকালীন পার্ব্বত্য-নদীর ন্যায় ছুট্‌তে থাকে, ভাব্‌তে থাক, তার গুপ্তেন্দ্রিয়েও "ওমস্তি ঈশ্বর আছেন।" "ঈশ্বর আছেন,—সর্ব্বাবস্থায় আছেন, সর্ব্বত্র আছেন", এই তত্ত্বের ধ্যান কর্ত্তে কর্ত্তেই তুমি পাপ-লালসার দাসত্ব হ'তে মুক্তি পাবে।

প্রলোভনকারিণীর মন পরিবর্ত্তনের উপায়

যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—আমি পাপকাজে আসক্ত হতে চাই না, তবু যদি কোনও রমণী আমাকে পাপক্রিয়ায় যোগ দিতে আহ্বান করে, তবে তার মন পরিবর্ত্তনের জন্য আমি কি কর্ব্ব ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সদযুক্তি ও সদ্‌বুদ্ধির প্রণোদনা দেওয়া এক উপায়। কিন্তু তাতে তার মন্দ কাজের আহ্বান কতকটা যদি কমেও, তবু মন্দ বুদ্ধিটা দূর হবে না। তার অন্তর্নিহিত মন্দ-কামনা পুনর্ব্বার সুযোগ পাওয়া মাত্র কঠিনতর প্রলোভনরূপে তোমার সমক্ষে এসে দাঁড়াবে। তাই প্রয়োজন, তার মন পরিবর্ত্তনের জন্য সূক্ষ্মতর উপায় অবলম্বন করা। কোনও নির্জ্জন স্থানে ব'সে মনে মনে কল্পনা কর্ত্তে থাক, যেন ঈশ্বর স্বয়ং তোমার ও তার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান আছেন। ঈশ্বর তাঁর অপার মহিমা ও অতুল পবিত্রতার জ্যোতিতে দীপ্তিমান হ'য়ে উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান কচ্ছেন,—এরূপ অনুভূতি কিম্বা প্রবল বিশ্বাস যতক্ষণ না অন্তরে উপলব্ধি কর্ত্তে থাক্‌বে, ততক্ষণ ধ্যান চালাও। এরূপ উপলব্ধি এসে গেলেই, মনে কর্ত্তে থাক্‌বে যেন, তোমার সকল সৎচিন্তার প্রবাহ ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে পরিশ্রুত হ'য়ে সেই রমণীর ভিতরে পড়্‌ছে। তখন বারংবার সিংহগর্জ্জনে বল্‌তে থাকবে,—"সৎ হও, সংযমী হও, জিতেন্দ্রিয় হও।"

এভাবে তারও চরিত্র অজ্ঞাতসারে পরিবর্ত্তিত হ'তে থাক্‌বে, তোমারও যদি কোনও গুপ্ত লালসা তার প্রতি থেকে থাকে, তবে তা পরিশোধিত হবে। কারণ, ভগবান্ এখানে filterএর কাজ কচ্ছেন।

বাঙ্গরা

১৯ আষাঢ় ১৩৩৮

অদ্য প্রাতেই শ্রীশ্রীবাবার মেটংঘর যাইবার কথা। মেটংঘরে যে আশ্রমের কাজ হইতেছে, তাহা পরিদর্শন করিয়া আসিবার জন্য লইয়া যাইতে সাতমুড়ার ভ্রাতা শশধর এবং মেটংঘরের ভ্রাতা অনাথ আসিয়া ধর্না দিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু বাঙ্গরা স্কুলের অনেক ছাত্র এখনও শ্রীশ্রীবাবার সহিত আলাপ করে নাই বা ভিড়বশতঃ তাঁর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। শ্রীশ্রীবাবা এজন্য প্রাতে মেটংঘর যাওয়া স্থগিত করিলেন এবং সন্ধ্যায় রওনা হওয়া স্থির করিলেন।

কীর্ত্তনাদির বহিরানন্দ ও অন্তরানন্দ

শ্রীশ্রীবাবা বাঙ্গরা আসিয়াছেন শুনিয়া একজন মুসলমান ফকীর তাঁর পাদপদ্ম দর্শনে সমাগত হইয়াছেন। ফকীর সাহেব তারের যন্ত্র বাজাইয়া একটী ধর্ম্ম-সঙ্গীত গাহিলেন। ফকীর সাহেবের ভিতরে ভাব বেশ জমাট হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল কিন্তু কোনও বহির্ম্মুখ চঞ্চলতা পরিদৃষ্ট হইল না। ফকীর সাহেব যেন গানটী গাহিবার সময়ে তার প্রত্যেকটী শব্দ আনন্দের সহিত আস্বাদন করিতে করিতে গাহিতেছেন এবং এক অন্তর্ম্মুখীন ভাবাবেশের রাজ্যে শান্ত-স্নিগ্ধ গতিতে বিচরণ করিতেছেন।

দ্বিপ্রহরে ফকীর সাহেব আহারান্তে স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলে পরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কীর্ত্তনাদি কর্‌তে কর্‌তে হাসা, কান্না, নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী ও লম্ফ ঝম্ফ করা, গড়াগড়ি দেওয়া প্রভৃতি অত্যন্ত বাইরের আনন্দ। চিত্ত যখন ভিতরের রসে ডোবে, তখন এ সব চপলতা থাকে না, তখন থাকে একটা নেশার ভাব, একটা আবেগের আমেজ। বন্যার জল বিলে যখন প্রথম এসে পড়ে, তখন স্রোত থাকে, তরঙ্গ থাকে, ঘূর্ণিপাক থাকে, কিন্তু বিল যখন পূর্ণ

হয়, তখন সে জল করে থৈ থৈ, তার মূর্ত্তি খুব প্রশান্ত, খুব গম্ভীর। জ্ঞান ও প্রেমের কুমুদ-কহ্লার এই প্রশান্ত-গম্ভীর পূর্ণোদকেই ফোটে।

তারপরে শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—কীর্ত্তনাদিতে শান্ত রসকে বজায় না রেখে তাকে চৌদ্দমাঁদলের হট্টগোল আর মাতঙ্গ-নর্ত্তনের তাণ্ডব-কোলাহলে পরিণত করার সব চেয়ে বড় কুফল এই যে, এতে অনেক অপ্রেমিকও প্রেমের ভাণ দেখিয়ে ভণ্ডামি কত্তে পারে। "প্রাণ গৌর-নিত্যানন্দ" ব'লে সাড়ে তেরো হাত লম্ফ দিতে পাল্লেই যখন সমাজে সাধুর প্রতিপত্তি লাভ করা যায়, তখন কোন্ প্রতিষ্ঠালিপ্সু মূর্খ আবার কষ্ট ক'রে স্বাধ্যায়, জপ, ধ্যান, ধারণা ও নিদিধ্যাসন কত্তে যাবে?

মেটংঘর
১৯ আষাঢ় ১৩৩৮

জীবনের উন্নতি লাভের উপায়

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা সন্ধ্যা সাত ঘটিকার কালে মেটংঘর শ্রীযুক্ত দ্বারিকা নাথ সাহারায়ের বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র এবং তাহার ভ্রাতৃগণ যে কি ভাবে শ্রীশ্রীবাবার প্রীতি-সম্পাদনের জন্য চেষ্টাপরায়ণ হইলেন, বলিবার নহে। হস্ত-পদ-মুখাদি প্রক্ষালনানন্তর একটু বিশ্রাম করিলে পর একটী যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—জীবনে উন্নতিলাভের উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—উচ্চ লক্ষ্য উচ্চ চরিত্রকে গড়ে, উচ্চ চরিত্র উচ্চ সার্থকতা লাভের সহায় হয়। প্রাণপণে উচ্চ চিন্তা কর, মহান্ বিষয়ের ধ্যান জমাও, নীচ চিন্তাকে সম্পূর্ণ নির্ব্বাসিত ক'রে মহতী কল্পনায় নিমজ্জিত হও। আপনিই জীবনের উন্নতি-পথ খুলে যাবে।

উন্নত চিন্তার সাথে পরিচয়-স্থাপন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জগতের সকল উন্নত চিন্তার সাথে পরিচয় স্থাপন কর। কোন্ স্থানে কার কোন্ বাণীতে মনুষ্যত্বের অমিয়-ঝঙ্কার মন্দ্রিত হ'য়ে উঠেছে, কাণ পেতে তা শোন।' যে বাণী শুনে শত মানব-মানবী পাপ-তাপ বর্জ্জিত হয়েছে, দুঃখশোকাতীত হয়েছে, আলস্য-জড়তা পরিত্যাগ

করেছে, পশুত্ব পরিহার ক'রে মনুষ্যত্ব বিকশিত করেছে, দেবত্বে উন্নীত হয়েছে, সে বাণী শোন। নীচ, পঙ্কিল, অধোগতি-বর্দ্ধক কথা শোনা বন্ধ ক'রে দাও, ঊর্দ্ধগতি-সম্পাদক চিন্তার সঙ্গে প্রেম-সম্বন্ধ স্থাপন কর।

লক্ষ্য-নির্দ্ধারণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তারপরে কর স্থির, কোন্ পথে তুমি যাবে। বহু মহাজন বহু পথে গিয়েছেন, কিন্তু প্রত্যেকেই গিয়েছেন, নিজ নিজ পথে। প্রত্যেকেই আগে খুঁজে বের করেছেন, কোন্ পথে গেলে হবে তাঁর জীবনের পূর্ণ সার্থকতা। তার পরে সেই পথে চলেছেন অযুত-হস্তি-বিক্রমে। চলেছেন, বাধা-বিঘ্নকে অগ্রাহ্য ক'রে,—চলেছেন, লক্ষ বিপদ পদতলে চেপে নিষ্পেষিত ক'রে। তেমনি, আগে লক্ষ্য কর স্থির। লক্ষ্য নির্ণয় হ'ল কি জীবনোন্নতির অর্দ্ধাংশে তোমার সফলতা এল ব'লে জান্‌বে।

কিরূপ লক্ষ্য থাকা উচিত

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এমন একটী লক্ষ্যকে স্থির কর, যা তোমার পক্ষে একাধারে আকাঙ্ক্ষিত এবং কর্ত্তব্য। এমন লক্ষ্য স্থির কর, যে লক্ষ্যের সংলাভে তোমার প্রাণের গভীর পিপাসাও মেটান যায়, অপিচ তোমার উপরে যে সকল পবিত্র কর্ত্তব্যের দাবী রয়েছে, তাও মেটান যায়। এমন লক্ষ্য স্থির কর, যাতে তোমার জীবনের হবে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরতা স্থাপন এবং সমগ্র জগতের হবে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সুখ-সংসাধন।

লক্ষ্যলাভে আত্ম-বিসর্জ্জন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তারপরে দাও আত্ম-বিসর্জ্জন,—লক্ষ্যলাভে সম্যক্ আত্মাহুতি। লক্ষ্য স্থির হ'বার পরে তোমার সকল আত্ম-সুখ-লিপ্সার মৃত্যু হোক্, সকল আরাম-প্রিয়তার ধ্বংস হোক্, লক্ষ্য-লাভ-কল্পে নিজেকে বলি দাও। ভুলে যাও অতীত-ভবিষ্যৎ, ভুলে যাও সুখ-দুঃখের লীলা, ভুলে যাও সাফল্য বা অসাফল্যের কথা,—উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে নিজেকে রাখ পণ, আর সমগ্র শক্তি, সমগ্র বুদ্ধি, সমগ্র প্রতিভা, সমগ্র পুরুষকার নিঃশেষে কর প্রয়োগ। মনে জানো, বিশ্রামের তোমার অধিকার নেই! জানো, অলসতা তোমার

তপোভঙ্গকারিণী মেনকা, এর সঙ্গে প্রণয়-সাধন তোমার নূতন স্বর্গ সৃষ্টির বিঘ্ন।

দশ দিকে মন দিও না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দশ দিকে মন দিও না। লক্ষ্য হবে এক। যেমন ধ্রুবতারা থাকে একটী, শত শত নয়। একটী তীর দিয়ে কয়টী পাখী বিঁধ্‌বে? একটী জীবন একটী লক্ষ্যেই ব্যয় ক'রে দাও।

অসাফল্যের পানে তাকাইও না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অসাফল্যের পানে তাকিও না। অসাফল্য পাপ নয়, চেষ্টা না করাই পাপ। যতবার অসফল হবে, ততবার প্রাণপণে উন্মত হবে। উদ্যমেন হি সিদ্ধন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।

মেটংঘর

২০ আষাঢ়, ১৩৩৮

শ্রমের মহিমা

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা মেটংঘরেই অবস্থান করিলেন। একজন যুবকের প্রশ্নে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জগতে পরিশ্রমেরই জয়-জয়কার চতুর্দ্দিকে। আলস্যের কোনো জয়ধ্বনি নেই। পেট ভ'রে খেতে চাও, পরিশ্রম কর। ভাল কাপড় পর্‌তে চাও, পরিশ্রম কর। সুনিদ্রা লাভ কত্তে চাও, পরিশ্রম কর। স্বাস্থ্যবান হ'তে চাও, পরিশ্রম কর। লোক-সম্মান পেতে চাও, পরিশ্রম কর। দশজনকে সুখী কত্তে চাও, পরিশ্রম কর। একটা দেশকে দেশের ইতিহাস বদ্‌লে দিতে চাও, পরিশ্রম কর। একটা বলদুর্দ্ধর্ষ মহাজাতি সৃষ্টি ক'রে জগতের বিস্ময় লাগিয়ে দিতে চাও, পরিশ্রম কর।—উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ (লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষসিংহেরই অঙ্কশায়িনী হন।)

তালে বেতালে শ্রম করিলে চলিবে না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু পরিশ্রমের একটা পদ্ধতি থাকা চাই। তালে বেতালে শ্রম কল্লে চল্‌বে না। লক্ষ্যকে জেনে, লক্ষ্যলাভের উপায়কে জেনে নিজের অর্জ্জিত শক্তিকে জেনে, এই তিনের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে পরিশ্রম কত্তে হবে।

লক্ষ্য ও নিজশক্তি জানিবার উপায় ; ভগবৎ-সাধন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অবশ্য, লক্ষ্যকে জানা বা নিজ শক্তিকে জানা সহজ কথা নয়। তারও একটা সাধনা আছে। সে সাধনা হচ্ছে, নিজেকে, নিজের মনকে সকল কর্ম্ম, সকল চপলতা, সকল programme (কার্য্যতালিকা) থেকে তুলে ধ'রে একেবারে নিজের কাছে গুটিয়ে আনা। তারপরে মন যে কাজটীতে বস্‌বে, সেইটীই তোমার লক্ষ্য। মনের সকল চপলতাকে বিনাশ ক'রে তাকে নিজের কাছে পূর্ণরূপে পরিচিত ক'রে নেবার জন্যই ভগবৎ-সাধন। ধন দাও, যশ দাও, পুত্র দাও, শত্রু মারো,—এ সব বল্‌বার জন্যই ভগবৎ-সাধন নয়। ভগবানের দেওয়া সব শক্তি, আবার ভগবানের নির্দ্ধারিত প্রকৃত কর্ম্মপথ, সব যাতে তোমার চ'খের সাম্‌নে স্পষ্ট ধরা পড়ে, তারই জন্য ভগবৎ-সাধন।

আকুবপুর
২১ আষাঢ়, ১৩৩৮

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা বেলা বারোটায় আকুবপুর আসিলেন এবং পুনরায় চারি-ঘটিকায় বাঙ্গরা গমন করিলেন। আকুবপুর হইতে বাঙ্গরা যাইবার পথে সঙ্গীয় যুবকদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

কেন নিরুৎসাহ হইবে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেন নিরুৎসাহ হবে? আজ তুমি জীবন-পথে ভুলের কাঁটা চয়ন করেছ, কাল তুমি জীবন-পথে সাফল্যের রত্ন আহরণ কর্‌বে। আজ তুমি ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে আছ ব'লে কালও তোমাকে এভাবেই থাক্‌তে হবে, একথা কে বল্লে? মানুষেই ভুল করে, আবার মানুষেই তা সংশোধন করে। ভুল করেছ, দুঃখের কথা, কিন্তু ভ্রম-সংশোধন কত্তেও ত তুমি পার, সে শক্তিও ত তোমার রয়েছে। Exert yourself to the best of your abilities (নিজেকে প্রাণপণে খাটাও), and make your appearance on a new platform (এবং নূতন কর্ম্মাঙ্গনে আবির্ভূত হও)। কত মানুষ পাপের গভীর পঙ্ক থেকে আত্মোদ্ধার ক'রে দেবত্ব অর্জ্জন

করেছে, তুমি কেন পার্ব্বে না? তারাও রক্ত-মাংসের মানুষ, তুমিও রক্ত-মাংসের মানুষ।

নিজ নিজ অন্তর পরিষ্কৃত কর

বাঙ্গরার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভদ্রের দুইটী উৎসাহী ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীশ্রীবাবাকে নিয়া আসিবার জন্য আকুবপুর গিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাবা বসন্ত বাবুর বাড়ীতেই উঠিলেন।

বসন্ত বাবুর বিধবা ভ্রাতৃবধূ পরম ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা শান্তিলতা দেবী শ্রীশ্রীবাবার শ্রীচরণ ধৌত করিয়া দিবার জন্য এক গামলা জল নিয়া ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কাউকে আমার পা ধুইয়ে দিতে হবে না মা। সবাই নিজ নিজ অন্তরকে পরিষ্কৃত কর, চিত্তকে পবিত্র কর। তাতেই বিষ্ণু-পাদপদ্ম পূজা করা হবে। ব্রহ্ম-পাদপদ্মই বল, আর বিষ্ণু-পাদপদ্মই বল, সে জিনিষটী হচ্ছে তোমার নিজের অন্তর। অখণ্ড-নামের অমৃত বারিতে তাকেই অবিরাম ধৌত কর।

শ্রীযুক্তা শান্তি দেবী নিষেধ মানিলেন না, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবার চরণ ধৌত করিয়া দিলেন।

সংসারে থাকিয়া ঈশ্বর-ভজন

শ্রীশ্রীবাবার নৈশ ভোজন সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্তা শান্তিদেবী বলিলেন,—বাবা, সংসারে থাকিয়া ঈশ্বর-ভজন হয় না। ইহার কি করি?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সংসার ছেড়ে মা যাবি কোথায়? তীর্থে যাবি? সেখানেও বাজার, সেখানেও হাট। আশ্রমে যাবি? সেখানেও উনুন, সেখানেও রন্ধন। বনে যাবি? সেখানেও ফল-মূল আহরণ দরকার হবে, জল, ঝড়, রৌদ্র থেকে আত্মরক্ষার জন্য কুটীর চাই। শরীরটাই একটা সংসার। যেখানে যাবি, শরীরটা ত যাবেই, তার ক্ষুধা, তার তৃষ্ণা, তার ক্লান্তি, তার অবসাদ, তার রোগ, তার অশান্তি,—সঙ্গে সঙ্গেই যাবে। সুতরাং যেখানে যাবি, সেখানেই সংসার। সংসার ছাড়্‌বার উপায় নেই। অতএব, বুদ্ধি-

মতীর কাজ হবে, যদি, যেখানে ভগবান যাকে রেখেছেন, সেই অবস্থার মধ্যেই অবিরাম তাঁর পবিত্র নাম স্মরণ কত্তে থাকিস্।

বাঙ্গরা

২২শে আষাঢ় ১৩৩৮

স্বধর্ম্মনিষ্ঠা ও আতিথেয়তার জন্য সমগ্র ত্রিপুরায় সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র লোচন মজুমদার ও শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্র লোচন মজুমদার মহাশয়দ্বয়ের একান্ত আগ্রহে শ্রীশ্রীবাবা অদ্য হইতে তাঁহাদের বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছেন। উমালোচন হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত অবনীমোহন মজুমদার মহাশয় পূর্ব্ব-বারের ন্যায় প্রত্যেক ক্লাস হইতে একটী একটী করিয়া অনেক ছাত্রকে শ্রীশ্রীবাবার সহিত আলোচনার জন্য পাঠাইতেছেন।

গুরুগিরির উৎপাত

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা মাঠে ভ্রমণে বাহির হইলেন। রূপবাবু ও অবনী-বাবু গুরুগিরির উৎপাত সম্বন্ধে নিজেদের জীবনের একটী কৌতূকপ্রদ কাহিনী বর্ণন করিলেন। একজন ভদ্রলোক সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া আসিয়া অনেককে শিষ্য করিবার পরে ধরা দিলেন যে তাঁর স্ত্রী আছেন। কিছুকাল পরে জানিতে দিলেন, যে, তার কয়েকটী কন্যারত্নও আছেন। তার পরে হঠাৎ জানা গেল, ইনি আলিপুর আদালতে মোক্তারিও করেন। সুতরাং শিষ্যদের বিরাগ জন্মিল। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গুরুদেব শিষ্যদিগকে 'শাপ' দিলেন। শিষ্যরা আবার গুরুদেবকে জানাইলেন যে, 'সাপের' জন্য লোকের ঘর হইতে তাঁহারা 'ব্যাঙ্গ' সংগ্রহ করিতেছেন। ইত্যাদি।

গেরুয়ার উৎপাত

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—এইবার দেখ্‌ছি, আপনারা আমাকেও বিপদে ফেল্‌বেন।

অবনী বাবু বলিলেন,—আপনার সে ভয় নাই, কারণ আপনি গেরুয়া পরেন না। আপনার সাদা কাপড় দেখেই লোক আপনার নিকটে ছুটে আসে। পরে যার যার দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা অনুসারে অন্তরের গেরুয়া লক্ষ্য ক'রে যায়।

রূপবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্বামীজী, আপনি ত' সন্ন্যাসী, তবে, আপনার গেরুয়া নাই কেন? কথাটা ক'দিন ধ'রেই জিজ্ঞাসা করব করব মনে কচ্ছি।

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—সে ও আর এক কৌতুকোদ্দীপক গল্প। কল্‌কাতার রাস্তা দিয়ে একদল গৈরিকধারিণী রমণী জল-প্লাবনের আর্ত্ত-ত্রাণার্থে চাঁদা-সংগ্রহের সঙ্গীত গেয়ে যাচ্ছে, সংখ্যা তাদের চারি পাঁচ শত হবে। গৈরিকধারী স্বরূপানন্দ সেই দৃশ্য দেখে আনন্দে অধীর। তবে এতগুলি ত্যাগী রমণী বাংলাদেশে আছেন! আনন্দে সারারাত্রি তার ঘুম হ'ল না। পরদিন খবরের কাগজে দেখা গেল এরা সব চিৎপুর, রামবাগান, আর হাড়-কাটা গলির গণিকা। ঘৃণা ধ'রে গেল। গেরুয়ার এত অপব্যবহার সহ্য করা যায় না। স্বরূপানন্দ গেরুয়া ছেড়ে দিল।

ব্রাহ্মণের পতনের কারণ

রূপবাবু বলিলেন,—তিন ফুঁয়ে ব্রাহ্মণ নষ্ট,—চোঙ্গা, শঙ্খ আর কাণ।

শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করিলেন,—মানে?

রূপবাবু।—চোঙ্গা ফোঁকে পাচক ব্রাহ্মণ, শঙ্খ ফোঁকে পূজারি ব্রাহ্মণ, কাণ ফোঁকে গুরুতা-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ। এই তিনটী ফুঁ দিয়েই ব্রাহ্মণের পতন হ'য়েছে। বেদবিদ্যার চর্চ্চা নেই, শুধু কোনও প্রকারে জীবিকা-সংগ্রহ।

চিন্তাই মানুষের প্রকৃত জীবন

২৫ আষাঢ়, ১৩৩৮

এই চারিদিন ধরিয়া বাঙ্গরা হাইস্কুলের ছাত্রেরা একজনের পর একজন করিয়া প্রায় একশত জনের উপর আসিয়া শ্রীশ্রীবাবার নিকট জীবনগঠনোপযোগী উপদেশ গ্রহণ করিয়াছে। রূপবাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলোচন মজুমদার মহাশয় আজ-না-কাল করিয়া শ্রীশ্রীবাবাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন অদ্য অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা নৌকা-যোগে মোচাগড়া রওনা হইতেছেন।

বাঙ্গরা হাইস্কুলের অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র রক্ষিত মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কে কোন্ কাজ করে, তাই দিয়ে লোকে

তার জীবনের বিচার করে। কিন্তু তার প্রকৃত জীবন হচ্ছে তার চিন্তা। কে কোন্ চিন্তা করে, তাই দিয়েই তার— ইহকাল পরকাল সব কিছুর গতি-নির্দ্ধারণ হয়।

চিন্তার শক্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—চিন্তাই মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে। চিন্তাই মানুষকে নারকী বা দেবতায় পরিণত করে। চিন্তাই তাকে ক্রীতদাস বা দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষে রূপান্তরিত করে। চিন্তারই পার্থক্যে একজন হয় পতিতাধম, আর একজন হয় পতিত-পাবন।

চিন্তাকে অবিরাম ঊর্দ্ধমুখিনী রাখিবার উপায়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—চিন্তাকে অবিরাম ঊর্দ্ধমুখিনী রাখ্‌তে যে পারে, সেই সাধু, সেই মহৎ, সেই দেবতা, সেই ক্ষণজন্মা। তার কৌশল হচ্ছে, অবিরাম মনকে ভগবানের সঙ্গে লগ্ন করা। চিত্তবৃত্তি ঊর্দ্ধে বা অধোদেশে যেখানেই থাক্, ভগবানকে রাখ্‌তে হবে সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর নামকে চিত্তের উত্থান-পতন, স্থিরতা-আলোড়ন, সকল অবস্থার সঙ্গে একেবারে revet (পেরেক) মেরে রাখ্‌তে হবে।

ভগবানের নামই তোমাদের পরমাশ্রয়

সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবা মোচাগড়া পৌছিলেন। শ্রীযুক্ত গদাধর দেব মহাশয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী এবং বিধবা কন্যা শ্রীমতী গায়ত্রী দেবীর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবানের অমৃতময় নামই হোক্ তোমাদের মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন। নামই হোক্ তোমাদের জীবন, তোমাদের সর্ব্বস্ব-ধন। নামই হোক্ পুত্র, কন্যা, সখা, সখী, ভক্তি-প্রেম-ভালবাসার একমাত্র সামগ্রী। নামই হোক্ আশ্রম, নামই হোক্ পরমাশ্রয়। নামই হোক বেদ-বেদান্ত-উপনিষৎ, নামই হোক ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, নামই হোক সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তিদায়ক পরম বস্তু।

নামসেবা ও সমাজ-সেবা

শ্রীমান্ অমূল্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—নামই যদি অনুক্ষণ কর্ব্ব, তবে আর সমাজ-সেবা কর্ব্ব কখন ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অন্তরে কর নাম, বাইরে কর সমাজের সেবা, দেশের কল্যাণ, জগতের উপকার। সেবকের চাই স্থিরা প্রজ্ঞা, অটল সঙ্কল্প, অবিচলা বুদ্ধি। নামের গুণে তা তোমার আস্‌বে। সেই প্রতিভা নিয়ে জীব-কল্যাণে আত্মোৎসর্গ কর্‌লে উৎসর্গ হবে সুন্দর ও সর্ব্বাঙ্গীন।

রহিমপুর
২৬ আষাঢ়, ১৩৩৮

গোঁজামিল দিও না

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা বেলা দশ ঘটিকায় মোচাগড়া হইতে রহিমপুর আশ্রমে আসিয়াছেন। আশ্রমাগত জনৈক অস্থায়ী কর্ম্মীর মনে কিঞ্চিৎ বিকলতা আসিয়াছে। কীর্ত্তনের কোলাহল নাই, আবার ধ্যান-ধারণার দোহাই দিয়া অবিশ্রাম উপবেশনও নাই, পরন্তু সর্ব্বক্ষণ কোনও না কোনও শ্রম চলিতেছে, আর "কাজ কর নামের তালে তালে, উঠ নামের স্মরণে, বস নামের স্মরণে, মাটি কাট নামের স্মরণে, কোদাল চালাও নামের স্মরণে, জীবনের প্রতিদিনকার কার্য্যগুলির সাথে নামকে একেবারে অঙ্গীভূত করিয়া ফেল, ধ্যান-ধারণার দোহাই দিয়া শারীরিক আলস্যের প্রশ্রয় দিও না, আবার কর্ম্মের বা জীবসেবার দোহাই দিয়া ভাগবতী স্মৃতিকেও হারাইও না,"—এই হইতেছে এই আশ্রমের মূলমন্ত্র। ইহা উল্লিখিত কর্ম্মীর পছন্দ হইতেছে না, কর্ম্মী অন্যত্র যাইবার কল্পনা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীবাবা কর্ম্মীকে বলিলেন,—লক্ষ্য কর অন্তরের আহ্বানকে। চেয়ে দেখ, প্রাণের গতির দিকে। গোঁজামিল দিয়েও এখানেই থাক্‌তে হবে, এর কোনো মানে নেই। প্রাণের গতির সঙ্গে মিল্‌বে না, অথচ তুমি এখানেই লেগে থাকবে, এরূপ আচরণকে আমি মিথ্যাচার ব'লে মনে করি। অপরের স্বাধীন সত্তাকে আমার ব্যক্তিত্ব বা মতামত দিয়ে আচ্ছন্ন ক'রে দেওয়া আমার মত বা পথ নয়। তোমার স্বাধীন বুদ্ধি তোমাকে পথ দেখিয়ে চলুক। এই বিষয়ে নির্ভীক্ হও। চ'খের লজ্জায় বা মনের দুর্ব্বলতায় গোঁজামিল দিও না।

রহিমপুর আশ্রম
২৭শে আষাঢ়, ১৩৩৮

অদ্য সূর্য্যোদয় হইতে তিন দিন শ্রীশ্রীবাবা মৌনী থাকিবেন। আজ শ্রীশ্রীবাবা কয়েকখানা পত্র লিখিলেন।

প্রার্থনাকে অব্যর্থ করিবার কৌশল

ফেণী-নিবাসী জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

—"ব্যক্তিগত-স্বার্থগন্ধ-হীন মঙ্গল কামনা লইয়া প্রার্থনা করিলেও অনেক সময়ে-ভগবান তাহা পূর্ণ করেন না। বুঝিতে হইবে, সে স্থলে প্রার্থনা উপযুক্ত পরিমাণ গভীর হয় নাই। কিন্তু বাহ্যতঃ তাহা গভীর বলিয়া ভ্রম হইবে। কেন না, তপোদৃষ্টি ব্যতীত প্রার্থনার গভীরতা বুঝা কঠিন। নিজের জীবনটাকে তপস্যার সমুদ্রে ডুবাইয়া দাও। প্রার্থনাকে অব্যর্থ করিবার ইহাই কৌশল।"

নামের শক্তি

কুমিল্লায় অবস্থিত জনৈক ভক্ত বালককে লিখিলেন,—

—"ভগবানের নাম সমগ্র মন-প্রাণ-দিয়া জপিতেছ ত? নামের শক্তিতে দেহের ও মনের আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এক একবার তাঁর নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দেহের অনুপরমাণুগুলি এবং মনের প্রাক্তন সংস্কার সমূহ রূপান্তর প্রাপ্ত হইতে থাকে। দুই একদিন নাম জপিয়াই এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে না পার, কিন্তু দীর্ঘকাল সমপ্রযত্নে সাধন করিতে করিতে দেহের স্বচ্ছন্দতা ও মনের নির্ম্মলতার মধ্য দিয়া এই রূপান্তর ধরা পড়ে। কাচ যেমন স্বচ্ছ, নামের শক্তিতে দেহমন সেইরূপ স্বচ্ছ হয়। ইস্পাত যেমন দৃঢ়, নামের শক্তিতে দেহ তেমন রোগের পক্ষে এবং মন তেমন কুচিন্তার পক্ষে দুর্ভেদ্য হয়। সুনির্ম্মল জল যেমন জীব-জগতের জীবন-স্বরূপ, নামের শক্তিতে তোমার দেহ ও তোমার মন জগতের সকল জীবের পক্ষে সেইরূপ মঙ্গলপ্রদ হইবে। নামকে আশ্রয় করিয়া বীর-বিক্রমে জীবনকে সংগ্রাম-কুশল ও রণস্পর্দ্ধী করিয়া গড়িয়া লও।"

বাল্যেই করিতে হবে ব্রহ্মের সাধনা ; প্রতিযোগিতায় সাধন

উক্ত বালকের তরুণ বয়স্ক জ্যেষ্ঠতাত-ভ্রাতাকে শ্রীশ্রীবাবা লিখিলেন,—

"আমি যখন একটা মানুষের পূর্ণ উন্নতির কথা চিন্তা করি, তখন তার জীবন হইতে ভগবৎ-সাধনার কথাটী বাদ দিয়া তার সর্ব্বশক্তির সম্যক্ বিকাশকে ধারণায়ই আনিতে পারি না। তার কারণ এই যে, আমি অতি তরুণ কৈশোরেই নিজ অন্তরে ভগবৎ-প্রেরণাকে লাভ করিয়াছিলাম। এক মহাপুরুষ, যিনি বাক্যের দ্বারা জীব-কল্যাণ করেন নাই, তিনি তাঁর তপঃপূত স্নিগ্ধ দৃষ্টিকে মাত্র আমার উপরে স্থাপিত করিয়া আমার সমগ্র জীবনকে জাগাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। সেই আট বৎসর বয়সের বালক আজও সেই পবিত্র দিনটীর সুমহৎ সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া মুহুর্মুহু রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া থাকে।

"সেই বয়সে আমি দুইজন অপ্রত্যাশিত তপঃসহায় পাইয়াছিলাম আমার দুই সমবয়সী বন্ধুকে, যাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমি নাম জপিতাম। তারা যদি জপিত এক হাজার, আমি জপিতাম দুই হাজার। তাহা যদি জপিত দুই ঘণ্টা, আমি—জপিতাম তিন ঘণ্টা। জপ-সাধনায় আমাকে পরাজিত করিবার জন্য তাদেরও আগ্রহ ছিল অত্যদ্ভুত। তাদের মধ্যে কনিষ্ঠটীর আগ্রহই ছিল সর্ব্বাধিক। হইতে হইতে এমন হইল যে, যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বিবাদে জপ চলিতে পারে, তার জন্য আমরা কোনও দিন খালি মট্‌কীর ভিতরে বসিয়া, কোনও দিন বাঁশের ঝাড়ের মাঝে বসিয়া, কোনও দিন বেত-বনের কাঁটার ঘাই খাইয়া. কোনও দিন বা শিয়ালের গর্ত্তে বসিয়া নাম জপিয়াছি। অনুজের মত সে সর্ব্বদা আমার সঙ্গে থাকিত, শিষ্যের মত সে সর্ব্বদা আমার বাক্য প্রতিপালন করিত এবং যথার্থ সখার মত সে আমার সাহচর্য্য করিবার অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপ অভিভাবকের ভ্রূকুটি ও বেত্রাঘাত সহিত। তার মত সাধনানুরাগ কি তোমাদের হইবে না? তোমরা যে কয়জন আছ এক সাধন-পথের পথিক, তারাও প্রতিযোগিতার ভাব লইয়া সাধন করিতে আরম্ভ কর। এই প্রতিযোগিতার বুদ্ধি তোমাদিগকে বিস্ময়কর উন্নতি প্রদান করিবে।"

জাহাঁপুর

৩০শে আষাঢ়, ১৩৩৮

জাহাঁপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার রায় শ্রীশ্রীবাবাকে নিবার জন্য নৌকা পাঠাইয়াছেন। আগ্রহের অকপটতা উপলব্ধি করিয়া ভক্ত-প্রবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে লইয়া শ্রীশ্রীবাবা জাহাঁপুর রওনা হইলেন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রভাব

পথিমধ্যে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র শ্রীশ্রীবাবাকে বলিলেন যে জাহাঁপুরে একজন সাধক আছেন, তাঁর নাম রামচন্দ্র ব্রহ্মচারী এবং তিনি বারদীর প্রসিদ্ধ লোকনাথ ব্রহ্মচারীরই শিষ্য।

এই কথা শুনিতেই শ্রীশ্রীবাবা—

"ব্রহ্মানন্দং পরম-সুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগন-সদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং
একং নিতং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণ-রহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি"

স্তোত্রটী বারংবার পাঠ করিতে লাগিলেন।

পরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জানো গিরিশ, লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নাম শুন্‌লেই কেন আমার মন সজাগ হ'য়ে ওঠে? বাল্যকালে দেখেছি, আমার জ্যেঠীমাতা রামকৃষ্ণ পরমহংসের, আর আমার জননী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ছবির পাদমূলে দৈনিক পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। অবশ্য, তাঁরা এই রুচি সংগ্রহ করেছিলেন যথাক্রমে আমার জ্যাঠামশায় আর বাবার কাছ থেকে। রামকৃষ্ণকে নিয়ে আমার মনে কোনও ভাবনা হ'ত না বা তার বিষয়ে কিছু জান্‌বারও কৌতূহল হ'ত না, কিন্তু অসুখ-বিসুখে পড়্‌লেই আমি "ঠাকুর ঠাকুর" ব'লে লোকনাথকে ডাকতাম এবং তাঁর মূর্ত্তির ধ্যান কত্তাম। ধ্যান একটু জমে এলেই দেখ্‌তাম, মাথা ধরাই বল আর জ্বরই বল, সেরে গেছে। তখন ত কালী, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গা প্রভৃতির মত লোকনাথকে একজন দেবতা ব'লেই মনে কত্তাম। কিন্তু বড় যখন হ'লাম, তখন জান্‌লাম, ইনি দেবতা নন, ইনি মানুষ, আমার মত,

তোমার মত মানুষ, তবে তপোবলে পুরুষোত্তম হয়েছেন। তাঁর তপস্যার কথা জেনে মনে এত ভক্তি এল যে বল্‌বার নয়। এর'পরে একদিন 'লোকনাথ-মহিমা' নামে একখানা সংস্কৃত স্তোত্রের বই হাতে পড়্‌ল। তার প্রথমেই উদ্ধৃত করা আছে, "ব্রহ্মানন্দং পরম-সুখদং—" স্তোত্রটী। কণ্ঠস্থ কর্‌লাম এবং জপের মালা নিয়ে এই স্তোত্রকে লক্ষ লক্ষবার জপ কর্‌লাম।

এই কথা বলিয়া শ্রীশ্রীবাবা পুনরপি বারংবার "ব্রহ্মানন্দং পরম সুখদং" ইত্যাদি স্তোত্রটীকে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

জন্মমৃত্যু অবিরাম

অপরাহ্নে শ্রীমৎ রামচন্দ্র ব্রহ্মচারীজীর আশ্রমে যাওয়া হইল। ব্রহ্মচারী মহারাজ শ্রীশ্রীবাবাকে বসিবার জন্য একখানা মৃগচর্ম্ম প্রদান করিলেন এবং যথোচিত সমাদর প্রদর্শন করিলেন। জাহাঁপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় মহাশয় নানাপ্রকার প্রশ্নাদি করিতে লাগিলেন।

প্রশ্নোত্তর-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এক একটা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহটা রূপান্তর পাচ্ছে। একটা একটা চিন্তা-তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে দেহটার রূপান্তর হচ্ছে। শ্বাসে দেহ গড়্‌ছে, প্রশ্বাসে ক্ষয় পাচ্ছে। কোনো চিন্তায় দেহের বৃদ্ধি হচ্ছে, কোনো চিন্তায় দেহ ক্ষীয়মান হচ্ছে। এভাবে অবিরাম দেহের মধ্যে জন্মমৃত্যুর খেলা চলেছে। জন্মমৃত্যুকে অবিরাম নিজ দেহের মধ্যে দর্শন ক'রে যিনি জরামরণাতীত পরব্রহ্মে লীন হ'য়ে থাক্‌তে পারেন, তিনিই ধীমান্।

সৃষ্টি অনাদি

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সৃষ্টি অনাদি, অনন্তকাল চল্‌ছে এবং চল্‌বে। সাধারণ ভাবে যাকে আমরা প্রলয় বলি, সেরূপ collective (সমষ্টিগত) প্রলয় কখনই হবে না। সর্ব্বত্রই সৃষ্টি ও প্রলয় individual (ব্যক্তিগত)।

যোগীর সহানুভূতি

সহানুভূতির কথা উঠিলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অযোগীর সহানুভূতির

পশ্চাতে কারণ থাকে, যোগীর সহানুভূতি অকারণ, তাঁর স্বভাব তাঁকে সর্ব্বজীবে সহানুভূতি কত্তে বাধ্য করে। সাধন ক'রে ক'রে যিনি নিজ প্রকৃতিকে বিরজ (রজস্বলতাহীন) করেছেন, তিনিই স্বাভাবিক প্রেরণায় পরদুঃখে দুঃখানুভব করেন এবং ফলে তাঁর সহানুভূতিই জগতের দুঃখ হরণ করে।

আলোচনা-কালে বসন্ত বাবুর প্রশ্ন করিবার ভঙ্গীর ভিতরে এত শ্রদ্ধা ও পাণ্ডিত্য ছিল যে, শ্রীশ্রীবাবা তাহাতে বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন।

জাহাঁপুর
৩১ আষাঢ়, ১৩৩৮

পীতবসন হরি

অদ্য ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত গিরিশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বৈবাহিক এবং স্থানীয় জমিদারদের গুরু শ্রীযুক্ত নবচৈতন্য গোস্বামী মহাশয় মাধ্যাহ্নিক-কৃত্যের জন্য শ্রীশ্রীবাবাকে নিজগৃহে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। গোস্বামি-গৃহে প্রবেশ করিয়াই আঙ্গিনার এক পার্শ্ব জুড়িয়া অফুরন্ত হরিদ্রাবর্ণের সন্ধ্যামালতীর বন দেখিয়া শ্রীশ্রীবাবা আনন্দিত হইয়া মৃদুস্বরে গান ধরিলেন,—

"কৈ কৈ মম বাঞ্ছিত ধন
পীত-বসন হরি কৈ,
যাহার লাগিয়া দিবস রজনী
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হই।*"

গোস্বামি-পরিবারে শ্রীশ্রীবাবার পদধূলি লইবার জন্য একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। † শ্রীশ্রীবাবা কিন্তু গাহিয়া চলিলেন,—

"পাইলে যাঁহারে চাইনে রাজত্ব
চাইনে বীরত্ব, চাইনে ধীরত্ব,
যাঁহার লাগিয়া মহেশ উন্মত্ত,
প্রাণ হতে প্রিয় সে ধন কৈ?

* শ্রীশ্রীবাবার পিতামহ নিত্যধামগত গৃহস্থ মহাপুরুষ হরিহর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় রচিত।

† পরবর্ত্তী-কালে পাদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম শ্রীশ্রীবাবা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

"ব্রহ্মা জপে নাম যাঁর অবিরাম,
বিষ্ণু করে স্তুতি যাঁর গুণগ্রাম,
কোটি অবতার করিছে প্রণাম,
সে চির-আরাধ্য দেবতা কৈ ?"

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"পীতবসন হরি" কথাটার মানে জানেন গোসাঁইজী ? এই ভারতবর্ষে পীতবর্ণ বহু যুগ ত্যাগের প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছিল। যেমন, পরবর্ত্তী যুগে গৈরিক বসন হয়েছে। 'পীতবসন হরি' মানে ত্যাগের দ্বারা আবৃত যে পরব্রহ্ম,—ত্যাগের চর্চ্চা কর্লে তবে যাকে পাওয়া যায়, ত্যাগে নৈকেনামৃতত্বম্ আনশুঃ।

বিষ্ণুহরি, কৃষ্ণহরি ও ব্রহ্মহরি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমার কীর্ত্তন হরি ওম্। বিষ্ণুহরি বা কৃষ্ণহরি নন, একেবারে ব্রহ্মহরি। কবীর সাহেবের রাম যেমন দশরথাত্মজ রাম নন, একেবারে ব্রহ্ম।

ব্রহ্ম-গুরু

গোস্বামী মহাশয়ের প্রশ্নের ফলে প্রসঙ্গ গুরুবাদের দিকে অগ্রসর হইল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরু নয়, আমার গুরুও ব্রহ্মগুরু। ব্রহ্মই গুরু, যিনি আনন্দস্বরূপ, সুখস্বরূপ, একমাত্র, অদ্বিতীয়, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, শান্তিস্বরূপ, পবিত্রতাস্বরূপ, যিনি অজো নিত্যং স্বাশ্বতোঽয়ং সনাতনঃ, যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের পরমপ্রভু, যিনি সীমাতীত, অনাদি, অনন্ত, সেই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই আমার গুরু।

মানুষ-গুরু

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অবশ্য, মানুষ-গুরুরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু ব্রহ্মগুরুর অভিমুখী হবার জন্যই মানুষ-গুরুর প্রয়োজন। মানুষ-গুরু শিষ্যকে যদি ব্রহ্মগুরুতে বিমুখ করে, তবে তাকে বর্জ্জন কর্ত্তে হবে।

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুর প্রসঙ্গ উঠিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দীক্ষাদাতা

গুরুর যদি হয় শিষ্যসংখ্যা অত্যধিক, তা হ'লে শিষ্যদিগকে উপদেশ-দানের জন্য একটী ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই ভাবেই শিক্ষাগুরুর উৎপত্তি হয়েছে। জ্ঞানীগুরু দীক্ষা দিয়ে শিষ্যের অধ্যাত্ম-জীবনের সূচনা ক'রে দিয়ে গেলেন, অজ্ঞান শিষ্য গুরুর উপদেশ পালন কর্ল্লেও নিজের রসানুভূতির সঙ্গে তাকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে নিতে পার্ল্ল না। একজন উপদেষ্টা এসে, তার মনের খোঁচ ভেঙ্গে দিলেন, তার প্রাপ্ত সাধন-পথকেই সহজগম্য ক'রে দিলেন। এই হ'ল শিক্ষাগুরুর আবির্ভাবের মূলকথা। একজন মন্ত্র পেয়েছে—ক্লীং, কিন্তু বুঝ্তে পাচ্ছেনা যে, কৃষ্ণ বস্তুটী কি। একজন উপদেষ্টা এসে ব'লে গেলেন কৃষ্ণ কি এবং নূতন জ্ঞানের আলোকে সে পুরাতন পথেই অধিকতর বিক্রমে অধিকতর বিশ্বাসে চল্‌তে আরম্ভ কর্ল্ল। এই হ'ল শিক্ষাগুরু করা। শিক্ষা-গুরু একজনের শত শত থাকৃতে পারে। মৃত-সঞ্জীবনী খেলে যেমন পুরোণো শরীরেই নূতন বল আসে, তেমনি যাঁর উপদেশে পুরোণো সাধনেই নূতন উৎসাহ আসে, তাকেই বলে শিক্ষাগুরু।

শিক্ষাগুরুর কর্ত্তব্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শিক্ষাগুরুর কর্ত্তব্য কি নূতন আর একটা মন্ত্র দেওয়া? নিশ্চয়ই নয়। পূর্ব্বপ্রাপ্ত মন্ত্রটাকেই জীবন্ত ক'রে দেওয়া শিক্ষা-গুরুর কর্ত্তব্য। দীক্ষগুরু মন্ত্র দিয়ে খালাস, শিক্ষাগুরু সেই মন্ত্রের প্রকৃত মহিমা শিষ্যের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট ক'রে ঐ মন্ত্রেই তার নিষ্ঠা, ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভর বাড়িয়ে দেবেন। এই আশাতেই ধর্ম্মাচার্য্যেরা এক সময়ে শিক্ষাগুরু-প্রথার প্রবর্ত্তন করেছিলেন। কিন্তু এখন ব্যাপার দাঁড়িয়েছে উল্টো। দীক্ষাগুরু যদি এক কাণ ফুঁকেছেন, তবে শিক্ষাগুরু এসে আবার আর এক কাণে ফুঁক্-বেন। এ' এক অদ্ভুত ব্যভিচার। শিক্ষাগুরুরা শিষ্যদের মনকে এক পরিতাপ-যোগ্য দ্বিধার মধ্যে ফেলে দিচ্ছেন। আসল উদ্দেশ্যই হ'য়ে গেল মাটি। জেলাবোর্ডের রাস্তার পার্শ্বে বটের ডাল লাগিয়ে তাকে বাঁচাবার জন্য জিওলের ডাল দিয়ে দেওয়া হ'ল বেড়া, ভাগ্যদোষে বটের ডাল গেল ম'রে, বেঁচে রইল ছায়াহীন পত্রহীন অখ্যাত জিওলের ডাল।

পরোপদেশে আত্মোপকার

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা চন্দ্রকুমার বাবুর বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন, কতিপয় আমলা-বাবু শ্রীশ্রীবাবার সহিত ধর্ম্মালোচনায় রত হইলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্র-গ্রন্থগুলি শুধু জীব-হিতার্থেই লিখেন নি। নিজেদের হিতার্থেও লিখেছেন। যে সত্যকে লাভ ক'রে জীব শান্তি পায়, সেই সত্য সকলকে অকাতরে বিতরণ কর্ব্বার তার আগ্রহ হয়। আবার অপরকে সত্য বিতরণ কত্তে গিয়েও লোকে নূতন নূতন সত্যের সাক্ষাৎকার পায়। জ্ঞানী ব্যক্তি অপরের অজ্ঞান দূর কর্ব্বার জন্য উপদেশ দেন, আবার অপরকে উপদেশ দিতে দিতে নিজের ভিতরে নূতন নূতন উপদেশের অনুভূতি লাভ করেন। শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছেন শুধু পরকে বুঝাবার জন্যই নয়, নিজেরা বুঝ্‌বার জন্যও।

শাস্ত্রপাঠের সুফল

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সকলেরই শাস্ত্রপাঠ করা সাধ্যমত উচিত। কারণ, শাস্ত্রবাক্য অননুভূত বিষয়ে idea (আভাস) দিয়ে সাধনোৎসাহ বাড়ায়। শাস্ত্রপাঠে নিজের সাধন-লব্ধ অনুভূতিগুলির সত্যতায় বিশ্বাস বাড়ে।

সাধন-হীন শাস্ত্রপাঠ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু যারা সাধন-ভজন করে না, শুধু শাস্ত্রই পাঠ করে, তারা কুতার্কিক, দাম্ভিক ও জ্ঞানগর্ব্বী হ'য়ে পড়ে। পর-মতে দোষ-দর্শনের অনুচিত অভ্যাস তাদের এসে যায়। এজন্য সাধন করা ও শাস্ত্রপড়া এই দুইটী কাজ সমভাবে সমোৎসাহে করা উচিত।

সৎ শাস্ত্র ও অসৎ শাস্ত্র

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু সব শাস্ত্রই সব-সময়ে অধ্যয়নের উপযুক্ত নয়। সংস্কৃতে হোক্, হিব্রুতে হোক্, আর্‌বিতে হোক্ আর জেন্দ্ ভাষায় হোক্, হিন্দীতে হোক্, উর্দ্দুতে হোক্, তামিলে হোক্, আর বাংলায় হোক্, মহৎ লোকে যা জীব-কল্যাণের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরানুপ্রাণিত হ'য়ে লিখে গেছেন, সবই শাস্ত্র-পদ-বাচ্য। কিন্তু যে শাস্ত্র পড়্‌লে তোমার সাধন-রুচি ক'মে যায়,

ঈশ্বর-নিষ্ঠা হ্রাস পায়, তাকে অসৎ শাস্ত্র জ্ঞান ক'রে বর্জ্জন কত্তে হবে। একই শাস্ত্র মনের অবস্থাভেদে আজ তোমার সাধন-রুচিকারক হ'তে পারে, কাল রুচিহারক হ'তে পারে। এমতাবস্থায় আজ যে গ্রন্থ তোমার শাস্ত্র এবং পাঠ্য, কাল তা তোমার অশাস্ত্র এবং অপাঠ্য হবে। শাস্ত্রপাঠ কর, আর তোমার সাধন-রুচির দর্পণের দিকে তাকিয়ে দেখ, কেমন প্রতিবিম্ব পড়ে। প্রতিবিম্ব যদি পড়ে অনুকূল, সে শাস্ত্র পড় ; যদি পড়ে প্রতিকূল, তবে তা বর্জ্জন কর।

"অখণ্ড"দের শাস্ত্রগ্রন্থ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমি গিয়েছিলাম ফেণী। ঐ কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক জিজ্ঞাসা কল্লে'ন, আপনাদের শাস্ত্র কি ? আমি বল্লাম,—ভগবানের পরমপবিত্র নামই আমার শাস্ত্র। নাম কত্তে কত্তে যখন যে অনুভূতির আস্বাদন পাই, তাই আমার দর্শন বা philosophy. অমৃতময় নামের সেবায় যখন যে শাস্ত্র রুচি বাড়ায়, তখন আমি সেই শাস্ত্রই পড়ি। ভগবান্ আছেন, এইটী হ'ল আমার প্রথম স্বতঃসিদ্ধ। তাঁর নাম সত্য, এইটী আমার দ্বিতীয় স্বতঃসিদ্ধ। নামের সেবাই পরম পুরুষার্থ, একটী আমার তৃতীয় স্বতঃসিদ্ধ। এই তিনটীর অনুকূলে জগতে যেখানে যাঁর দ্বারা যে গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সবই আমার শাস্ত্র।

জাহাঁপুর

১লা শ্রাবণ, ১৩৩৮

রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা

আজ রথযাত্রা। জাহাঁপুরের জমিদার-বাড়ীর রথ এতদ্দেশে খুব বিখ্যাত। প্রায় সহস্রাধিক নৌকায় যাত্রী আসিয়া থাকেন। জাহাঁপুর হাইস্কুলের হিন্দু ছেলেরা ত সকলেই স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিতেছেন, উপরন্তু মুরাদনগর, রহিমপুর প্রভৃতি স্থান হইতেও বহু স্বেচ্ছাসেবক আসিয়া যাত্রীর ভিড় নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন।

বড়ইয়াকুড়ির শ্রীযুক্ত গৌরনিতাই চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীবাবাকে প্রশ্ন করিলেন,— "রথেচ বামনং দৃষ্ট্বা, পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" কথাটার মানে কি ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বামন কে? ত্রিপাদেই যিনি ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করেন, পূর্ণ অস্তিত্বের ত কথাই নাই। ত্রিপাদ মানে ত্রিগুণ,—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। যিনি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ দিয়ে ত্রিভুবন আচ্ছন্ন করেন, কিন্তু নিজে থাকেন ভাবাতীত ও ত্রিগুণরহিত। অর্থাৎ পরব্রহ্মই বামন। বামনকে দেখার মানে পরব্রহ্মকে দেখা, পরাৎপরকে দেখা, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ সর্ব্বভূতান্তর্য্যামীকে দেখা। রথ মানে তোমার দেহ। রথে বামনাবতারকে দেখার মানে নিজ দেহের ভিতরে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মকে দেখা। এই দেহ ক্ষয়শীল, ভঙ্গুর, আজ আছে কাল নেই। এই অনিত্য, দেহের ভিতরে নিত্য পরমাত্মাকে দেখা। রজ্জু-ধ'রে টান্‌লে যেমন রথ চলে, শ্বাস-প্রশ্বাসে তেমন তোমার দেহ চলে। শ্বাস-প্রশ্বাস তোমার দেহ-রথের রজ্জু। শ্বাস-প্রশ্বাস থাম্‌ল, কি রথও থাম্‌ল। কলা, নারিকেল, আনারস প্রভৃতি হচ্ছে সব যোগ-বিভূতি। রথ দেখ্‌তে এসে এসব যোগবিভূতি নিয়ে মজ্‌গুল হ'য়ে থেকোনা। মূর্খলোকে কলা নারিকেল নিয়ে তৃপ্ত হয়, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি রথের দেবতা পরমাত্মাকে দর্শন ক'রে কৃতকৃত্য হয়।

জাহাঁপুর

২রা শ্রাবণ, ১৩৩৮

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য

মাঝিয়ারা নিবাসী শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন রায় রথ দেখিতে জাহাঁপুর আসিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার রায়ের বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছেন। ভবিষ্যতে যে শ্রীশ্রীবাবার চরণেই তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, ইহা তিনি ঘৃণাক্ষরেও কল্পনা করেন নাই। তিনি শ্রীশ্রীবাবার উপদেশের প্রতি নিজেকে অত্যন্ত আকৃষ্ট অনুভব করিলেন।

তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—স্বামী ও স্ত্রীর সাধন সমান-ভাবে না চল্‌লে গার্হস্থ্য জীবনে সংযম প্রতিষ্ঠা সুকঠিন। তারই জন্য প্রত্যেক স্বামীর কর্ত্তব্য, নিজ নিজ স্ত্রীকে সাধন-পথের সঙ্গিনী ক'রে নেওয়া। স্ত্রীকে সন্তানের জননীতে পরিণত ক'রেই অধিকাংশ পুরুষ নিজ কর্ত্তব্য উদাসিত হ'ন

ব'লে মনে কচ্ছে। তাদের এই ভ্রম দূর হওয়া উচিত। নিজেকে জান্‌তে হবে ব্রহ্মবিগ্রহ, স্ত্রীকে জান্‌তে হবে ব্রহ্মপ্রতিমা এবং সেই বোধকে স্ত্রীর ভিতরেও জাগিয়ে দিতে হবে। তাতেই জগৎ মধুময় হবে, পৃথিবীর দুঃখরাশি দূর হবে।

জাহাঁপুরের বক্তৃতা

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবা জাহাঁপুর হাইস্কুলে বক্তৃতা দিবার জন্য গমন করিলেন। রহিমপুরের শ্রীযুক্ত সূর্য্যমোহন রায় সঙ্গে ছিলেন। এই দিনের বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন,—স্বামীজী যে জীবনে কখনো বক্তৃতা দিয়াছেন, তাঁহার প্রারম্ভিক কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহা কাহারও মনে হয় নাই, কিন্তু একটীর পর একটী বাক্য নির্গত হইতে লাগিল আর যেন কণ্ঠ ধীরে ধীরে উচ্চতর গ্রাম আরোহণ করিতে লাগিল। সমগ্র বিদ্যালয় গৃহটী লোক-সমাগমে কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া গেল এবং সেই বজ্রগম্ভীর বাগ্মিতা যেন সবগুলি লোককে মিলাইয়া একটী মাত্র ব্যক্তিতে পরিণত করিয়া দিল। প্রায় তিন ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতায় একটী প্রাণীর একটী নিঃশ্বাসের শব্দও শোনা গেল না।

প্রলোভনকে দমন কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—হীন বাসনার প্রত্তপ্ত শিখা তোমার অন্তরকে দগ্ধ কচ্ছে হে যুবকগণ, ঈশ্বর-প্রেমের শান্তি-সলিল সিঞ্চনে সে অগ্নি নির্ব্বাপিত কর, ঈশ্বর-প্রেমের সুরভি-চন্দন-প্রলেপে সে দাহ নিবারণ কর। প্রলোভন মায়াজালে আবদ্ধ ক'রে তোমাদিগকে নিশ্চিত ধ্বংশের দিকে টেনে নিচ্ছে হে যুবকগণ, ঈশ্বরপ্রেমের খড়্গাঘাতে তোমরা সে মায়াজাল ছিন্ন কর, প্রলোভনের করাল গ্রাস হ'তে আত্মোদ্ধার সাধন কর। যত তুমি বড় হবে, যত তুমি মহৎ হবে, তত বড় প্রলোভন তোমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াবে। পদাঘাতে চূর্ণ কর তাকে। অমৃতের পুত্রগণ—বিষপান ক'রো না।

ছাত্রজীবনের সদাচার

প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের অনুরোধে রাত্রি আট ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা হাইস্কুলের ছাত্রাবাস পরিদর্শন করিলেন।

একটী ছেলে মেরুদণ্ড বক্র করিয়া অধ্যয়ন করিতেছিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—Be straight like a soldier, for, you are preparing for many a fight (সৈনিকের মত সোজা হয়ে ব'স, কারণ, তুমি জীবনের বহু সংগ্রামের জন্য আজ আত্মপ্রস্তুতি কচ্ছ)।

অপর একটী ছেলেকে, বলিলেন,—অধ্যয়ন তপস্যা। মানে, অধ্যয়নকারী বিলাসিতা ত্যাগ কর্‌বে, ভোগ-বুদ্ধি সংযত রাখ্‌বে, মিতভাষী হবে, সদাচারী হবে। বুঝ্‌লে ছেলে ?

বলিয়াই শ্রীশ্রীবাবা ছেলেটীর পৃষ্ঠদেশে একটী মৃদু কিল মারিলেন।

জাহাঁপুর

৩রা শ্রাবণ, ১৩৩৮

দীক্ষার মন্ত্র

মাঝিয়ারা-নিবাসী শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন রায় শ্রীশ্রীবাবাকে বহু প্রশ্ন করিতেছেন। তদুত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে খাদ্য পরিবেশিত হবে, তার নিজের এমন ক্ষমতা থাকা চাই যেন, খেতে লোভ হয়। দীক্ষার মন্ত্র সম্পর্কেও সে কথা। কাণে পড়লেই যা জপ কত্তে রুচি হয়, তেমন মন্ত্রই দীক্ষার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র।

লোকাচারের দীক্ষা

স্থানীয় হাইস্কুলের কেরাণী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যেমন demand (চাহিদা) তেমন supply (সরবরাহ)। জগতের এই হচ্ছে রীতি। জনসাধারণ চায় লোকাচারের দীক্ষা, তাই লোকাচারের দীক্ষাদাতারা আছেন। সত্য দীক্ষা যারা চায়, তাদের জন্য সত্য দীক্ষাদাতারাও আছেন। সর্ব্বসাধারণের চাহিদার অনুপাতেই প্রয়োজনমত গুরুদের আবির্ভাব ঘট্‌বে। একদল লোক চাচ্ছে, ধর্ম্মও কর্‌ব ব্যভিচারও কর্ব্ব, তাই ব্যভিচারী ধর্ম্মের গুরুরা প্রাদুর্ভূত হচ্ছেন।

স্বাধ্যায়ের প্রয়োজন

জাহাঁপুর হইতে রহিমপুর ফিরিবার পথে অদ্য অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা মুরাদ-

নগরেই নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং রহিমপুর যাইবার মাইল খানিক পথ পদব্রজেই চলিলেন। নবীনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র সাহা শ্রীশ্রীবাবার পাদপদ্মদর্শনার্থে জাহাঁপুর গিয়াছিলেন, তিনি শ্রীশ্রীবাবার সঙ্গেই ফিরিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রের সহিত শ্রীশ্রীবাবার স্বাধ্যায় সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধর্ম্মসঙ্ঘে স্বাধ্যায়ের প্রয়োজন খুব বড়। শাস্ত্র-পাঠবর্জ্জিত ধর্ম্মসঙ্ঘ সহজেই পঙ্কিল হ'য়ে যায়, দ্রুত তাতে মালিন্য এসে পড়ে। ভজনের উপরেই জোর দেবে খুব বেশী, কিন্তু স্বাধ্যায় বা শাস্ত্রপাঠকে তার সঙ্গে যুক্ত রেখে। শাস্ত্রগুলি কি জানো? অতীত কালের সিদ্ধ তাপসদের আত্মদর্শনের অভিজ্ঞতা।

রহিমপুর আশ্রম
৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৩৮

বারংবার গুরু-পরিবর্ত্তন

নবীপুরের বর্ষীয়ান সজ্জন শ্রীযুক্ত গুরুচরণ পণ্ডিত মহাশয় আশ্রমে আসিয়াছেন। একদল লোক আছে, যারা আজ একজনকে গুরু করে, কাল আর একজনকে গুরু করে, এইভাবে সারাজন্ম কেবল গুরু-বদল করিয়াই চলে। তাহাদের প্রসঙ্গ উঠিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—জীবের প্রয়োজন ঈশ্বর-দর্শন বা পরমা শান্তি লাভ। এক গুরুর দ্বারা যদি তা সম্ভব না হয়, তবে অন্য গুরুর সাহায্য নেওয়া বিন্দুমাত্রও দোষের নয়। মধুলুব্ধ ভ্রমর এক ফুলে মধু না পেলে বা এক ফুলের মধুতে পেট না ভরলে অন্য ফুলে যাবেই। কিন্তু নদী পার হবার জন্য এক নৌকায় চ'ড়ে পরে সেই নৌকায় ছেঁদা আছে সন্দেহ ক'রে নৌকান্তরে যাবার পূর্ব্বে শতবার চিন্তা করা উচিত যে, নূতন নৌকায় আবার আরো বড় বড় ছিদ্র বেরুবে কিনা। ঈশ্বর-সাধনে নিষ্ঠার দাম সবার চেয়ে বেশী। ভাঙ্গা নৌকায় জল সিঁচতে সিঁচতেও কত লোক নদী পার হ'য়ে যায়। কিন্তু জল সিঁচতে যারা রাজি নয়, ভাঙ্গা নৌকা পরিত্যাগের অধিকার তাদের থাকা উচিত এবং শাস্ত্রকারগণ সেই অধিকার সাধকমাত্রকেই দিয়ে রেখেছেন।

রহিমপুর আশ্রম
৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৮

আজি হতে কর দৃঢ়পণ

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা দ্বারভাঙ্গা রাজ-হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর জনৈক ছাত্রকে নিম্নরূপ পত্র লিখিলেন,—

কল্যাণীয়েষু :—

বিন্দু বিন্দু করি' যদি করহ সঞ্চয়
সিন্ধুতে সে হবে পরিণত,
অল্প অল্প করি' যদি হও অগ্রসর
বিন্ধ্যগিরি হবে পদানত।
স্ফীতবক্ষ, উর্দ্ধচিত্ত, আশাদীপ্ত প্রাণ
বিশ্ববিঘ্ন করিবে লঙ্ঘন,
ব্রহ্মাণ্ডের অসম্ভব সাধিতে জীবনে
আজি হতে কর দৃঢ় পণ।

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ
৬ই শ্রাবণ, ১৩৩৮

চিন্তার শক্তি

অদ্য ভোরেই শ্রীশ্রীবাবা মালিসাইর আসিয়াছেন। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাই মোহন সাহার গৃহে তিনি উঠিলেন।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র সাহার প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—চিন্তা এক আশ্চর্য্য জিনিষ। চিন্তার শক্তিতে তুমি নিজের মঙ্গল কত্তে পার, আবার অমঙ্গলও কত্তে পার। চিন্তার শক্তিতে তুমি জগতের কল্যাণ সাধ্‌তে পার, আবার অকল্যাণও ঘটাতে পার। Inarticulate thoughts are in most cases the origin of great activities (শব্দহীন চিন্তাই অধিকাংশ সময়ে সুবিশাল কর্ম্মসমূহের মূল)। তোমার মনের সাথে অপরের

মনের যেখানে চিন্তাগত মিল রয়েছে, সেখানে তুমি ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই লোকচক্ষুর অন্তরালে কত অসম্ভব ও অভাবনীয় কার্য্য সম্পাদন কত্তে পার।

অরতি জনসংসদি

শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্র সাহা প্রশ্ন করিলেন,—সাধুদের মুখে নির্জ্জনতার প্রশংসা শুনি। তার মানে কি?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—নির্জ্জনতার প্রশংসা চোরের মুখেও শুন্‌তে পাবে। কারণ, নির্জ্জন না হ'লে চুরি কত্তে স্ববিধা হয় না।

একথা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিতে লাগিলেন,—জনতায় আত্মগঠন কঠিন। দশজনের দশ কথা মনকে টলিয়ে দেয়, ভাব নষ্ট করে, একাগ্রতা কমায়। চারাগাছের চারিদিকে বেড়া না দিলে যেমন দশটা ছাগল-গরু জুটে তার প্রাণান্ত করে। তারই জন্য আত্মগঠনকারীর পক্ষে জন-সংসদ বর্জ্জনীয়। অনেক লোকের সঙ্গে যারা মিশে, প্রায়ই তারা নিজেদের চরিত্রকে গ'ড়ে তুল্‌তে পারে না, বচনে তাদের খুব বাহাদুরী থাকে কিন্তু ভাবের ঘরে বেশী সম্পদ জমে না। নিজের ধ্যানের ভাণ্ডার কোটি কোহিনূরে পূর্ণ করা যার লক্ষ্য, তাকে লোকসংসর্গ ত্যাগ কত্তেই হবে।

পাত্র-ভেদে দান-ভেদ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভগবান্ দান-কল্পতরু। অবিরাম তিনি দান কচ্ছেন, অকাতরে তিনি সকলের ভাণ্ডার পূর্ণ কচ্ছেন। কিন্তু যে যেমন পাত্র নিয়ে যাচ্ছে, তিনি তাকে ততটাই দান কচ্ছেন। তুমি যাচ্ছ ছোট একটী পাত্র নিয়ে। তিনি তোমাকে বেশী দিলেও তুমি রাখ্‌তে পাচ্ছ কোথায়? বড় পাত্র নিয়ে তুমি যাচ্ছ, পরম দাতা সেই পাত্রটাই পূর্ণ ক'রে দিচ্ছেন। পরিষ্কৃত অমলিন পাত্র নিয়ে যাচ্ছ, তাঁর দান অবিকৃত থেকে যাচ্ছে। বিকৃত মলযুক্ত ভাণ্ড নিয়ে যাচ্ছ, তাঁর দান ভাণ্ডের পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনাহেতু বিকৃত হ'য়ে যাচ্ছে। এজন্যই নিজের ভাণ্ডটীকে নির্ম্মল করা চাই। যারা বহুজনের সংসর্গ

পরিহার করে এবং শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে আত্মমালিন্য দূরের সাধনা করে, ভগবানের দানের সহজে তারা অধিকারী হয়।

সন্ন্যাসীরা কি দেশের সেবা করেন ?

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা নৌকাযোগে নয়ানপুর রেল-ষ্টেশনে রওনা হইলেন এবং রাত্রি প্রায় নয়টার সময়ে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিলেন। মোচাগড়া-নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবের সহিত আলাপ হইল। ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন,—সন্ন্যাসীরা কি দেশের কোনও হিতসাধন করেন ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেউ কেউ করেন না, কেউ কেউ করেন। ডাক্তারেরা কি সবাই দেশের হিত করেন ? ব্যবসায়ীরা কি সবাই দেশের হিত করেন ? কেউ কেউ করেন না, কেউ কেউ করেন। যে সন্ন্যাসী দেশের হিতসাধন করেন, প্রথমতঃ তিনি তা' করেন, তাঁর তপঃশুদ্ধ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা ; দ্বিতীয়তঃ তিনি তা' করেন, তাঁর ভোগলালসাহীন ঈশ্বরপরায়ণ জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা ; তৃতীয়তঃ তিনি তা' করেন, জীবহিতমূলক সর্ব্বশুভবর্দ্ধক হিতোপদেশের দ্বারা ; চতুর্থতঃ তিনি তা' করেন জীবহিতমূলক কর্ম্মে অপরকে নিয়োজন দ্বারা। চতুর্থটীর দৃষ্টান্ত তুমি বিশেষভাবে পাবে শিবাজীর গুরু স্বামী রামদাসের ভিতরে।

কুমিল্লা

৭ শ্রাবণ, ১৩৩৮

গুরুমূর্ত্তি ধ্যান

রহিমপুরের পার্শ্ববর্ত্তী কোনও গ্রামের একজন যুবক সম্প্রতি উকিল হইয়াছেন। তিনি অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবাকে কতকগুলি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করিলেন। তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ নিম্নে লিখিত হইল।

প্রশ্ন।—একজন সাধু আমাকে মন্ত্র দিয়েছেন ঈশ্বরের, কিন্তু ধ্যান করা হচ্ছে মন্ত্রদাতার মূর্ত্তি। এটা কি ঠিক হচ্ছে ?

শ্রীশ্রীবাবা।—এটা ঠিকও নয়, বেঠিকও নয়। ঈশ্বর-চেতনা নিয়ে তুমি যে-কোনও মূর্ত্তি ধ্যান কত্তে পার। ঈশ্বর-চেতনা-বর্জ্জিত হ'য়ে তুমি কোনও

মূর্ত্তিরই ধ্যানে অধিকারী নও। গুরুদত্ত মন্ত্র যদি এমন কোনও রূপের remembrancer (স্মারক) হয়, যাতে ঈশ্বরকেই মনে পড়ে, তবে সেই রূপ ধ্যান কর। গুরুর মূর্ত্তি যদি ঈশ্বরের ঐ নামটীর remembrancer হয়, তবেই সেই মূর্ত্তি ধ্যান কর। ঈশ্বরীয় ভাবহীন নামজপ নিষ্ফল। ঈশ্বরীয় ভাবহীন রূপ-ধ্যান নিষ্ফল।

অদীক্ষিতের মন্ত্র-জপ

অপর একজন যুবক উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন,—দীক্ষা না নিয়ে নামজপ করলে কি তার কোনও ফল হয় না?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেন হবে না, নিশ্চয় হয়। মন্ত্র প'ড়ে যাদের বিয়ে হয়নি, তাদের কি সন্তান হয় না? তবে সন্তান জন্মাতে যতদিন লাগে, ততদিন স্ত্রীপুরুষ একত্র থাকতে হয়, নইলে সন্তান হবে না। ভগবদ্দর্শন কত্তে যতদিন লাগে, ততদিন ঐ একটী নাম নিয়েই লেগে থাকতে হয়।

শ্রীশ্রীবাবা আরও বলিলেন,—মন্ত্র প'ড়ে যাদের বিয়ে হয় নি, তাদের সন্তান হ'লে তার social status (সামাজিক পদমর্য্যাদা) থাকে না। এইটুকুই যা অসুবিধা। দীক্ষা না নিয়ে বা প্রদত্ত দীক্ষা অগ্রাহ্য ক'রে নিজের মনের মত নাম জপ ক'রে যাঁরা সিদ্ধত্ব অর্জ্জন করেন, তাঁরা নিজেদের সাম্প্রদায়িক কোনও পরিচয় দিতে পারেন না। এই যা অসুবিধা। জগতে সত্যের চাইতে সম্প্রদায়ের মান বেশী হয়েছে কি না!

কিসের শিক্ষা-গুরু?

রাত্রে শ্রীশ্রীবাবা শ্রীযুক্ত হরিমোহন পোদ্দারের ভবনে আহার ও রাত্রিযাপন করিলেন। হরিমোহন বাবুর পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রেরা যথা,—অবিনাশ, সতীশ, সুরেশ, বিধু, যোগেশ প্রভৃতি গভীর যত্নের সহিত শ্রীশ্রীবাবার সর্ব্বপ্রকার পরিচর্য্যা করিলেন।

কথায় কথায় শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দু'ঘণ্টা ধ'রে শুন্‌লি ত গুরুবাদের কচ্‌কচি। দীক্ষাগুরু আর শিক্ষাগুরু! মারো ঝাটা! নামই তোদের গুরু। অবিরাম নাম ক'রে যা। নামই তোদের শিক্ষা দেবে, যখন যা' শিখ্‌বার

দরকার। আবার শিক্ষাগুরু কিসের? I do not recognise the so-called শিক্ষাগুরু (আমি তথাকথিত শিক্ষাগুরু মানি না।) গুরুগিরির হট্টগোলে শিষ্যদের প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে।

কুমিল্লা
৮ই শ্রাবণ, ১৩৩৮

ছোটদের ঠাকুর

দিগম্বরীতলায় অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ-সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসায় গমন করিলে এই পল্লীর অনেকগুলি ভদ্রমহিলা শ্রীশ্রীবাবার উপদেশ শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। মায়েদের মধ্যে অধিকাংশই কুমারী। শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আমি হচ্ছি ছোটদের ঠাকুর, বুড়োদের নয়। সুতরাং ছোটদেরই উপদেশ দিব, বড়দের দিব না।

যজ্ঞেশ্বর বাবুর ভক্তিমতী সহধর্ম্মিনী বলিলেন,—কেন বাবা, আমরা কি দোষ কর্ল্লাম?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—দোষ কিছু কর নাই মা। কিন্তু আমি মনে-প্রাণে, ছেলেমানুষটাই রয়ে গেছি। তারই জন্য আমার ভাল লাগে ছেলেমানুষদের, যাদের বিয়ে হয়নি, যারা সংসারে ঢোকে নি। তোমরা ত' মা সংসারকে দেখে সংসারে ঠকে অনেক শিখেছ, ভালমন্দ জ্ঞান তোমাদের হয়েছে। এদের তা হয়নি, তাই এদের জন্য কর্‌বার কাজ ঢের রয়েছে যে মা।

কুমারীর উচ্চ লক্ষ্য

তারপরে শ্রীশ্রীবাবা কুমারী মেয়েদের দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন,—লক্ষ্য রাখ্‌বি উচ্চ, আকাঙ্ক্ষা রাখ্‌বি বিশাল। বড় হবি, মহৎ হবি, জগৎপূজ্যা হবি, এই রাখ্‌বি কামনা। ছোটভাবে যারা জীবন যাপন কচ্ছে, তাদের দিকে তাকাবি না, তাদের জীবনের অবস্থার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি দিবি না। বড় হ'য়ে যারা জগতের পূজা পাবার যোগ্যা হয়েছে, তাদের জীবনের দিকে তাকাবি, তাদের মত হতে চাইবি। তাঁদের প্রেম, তাঁদের ভক্তি, তাঁদের গুণ, তাঁদের মহত্ত্ব, তাঁদের নিষ্কামতা, তাঁদের নিষ্কলুষ জীবন-প্রণালী, এসবের অনুসরণ কর্ব্বি।

কুমারীর ব্যক্তিত্ব-গঠন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু মা, বড় যারা হয়, তারা একটা অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব গঠন করে। ব্যক্তিত্ব মানে আত্মগর্ব্ব নয়, অহমিকা নয়, নিজের চরিত্রের ভিতরে বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ করার নামই ব্যক্তিত্ব-গঠন। এমন সম্মান-বোধ, এমন আত্ম-মর্যাদা-বোধ, এমন নৈতিক দৃঢ়তা তোমার চরিত্রের মধ্যে সমাবিষ্ট কত্তে হবে যেন, স্ত্রী হোক্ পুরুষ হোক্, যে-কেউ তোমাকে দেখে বা তোমার সংস্পর্শে আসে, সেই যেন ভাব্তে বাধ্য হয় যে তুমি সামান্যা নও, সহজলভ্যা নও, প্রলোভনে আটক পড়ার মেয়ে নও। প্রলোভন যেন তোমাকে দে'খে প্রাণ নিয়ে পালায়।

কুমারীর পুরুষ-সঙ্গ বর্জ্জন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিজের এই বৈশিষ্ট্যকে জাগিয়ে তুল্তে হ'লে পুরুষদের সঙ্গে ঘেঁষাঘেষি কমিয়ে দিতে হয়। পুরুষ-ঘেঁষা মেয়েগুলি নিজের ব্যক্তিত্বকে গ'ড়ে তুল্তে পারে না। ঘেঁষাঘেষি কর্ব্বে উচ্চ চিন্তার সঙ্গে। জীবন গঠনোপযোগী যেখানে যে মহৎ চিন্তা আছে, সকলের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন কর এবং কি ক'রে একটী একটী ক'রে সচ্চিন্তাকে নিজ জীবনের কর্ম্মে রূপান্তরিত কত্তে পার, তার ধ্যান কর। শরীরকে কর—বলশালী, মনকে কর সতেজ, আর প্রাণকে কর ভগবৎ-প্রেমোন্মুখ।

ভগবৎপ্রেম ও ব্রহ্মচর্য্য

অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা দানবীর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত "রাম-মালা ছাত্রাবাসে" নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিলেন। সবাই মিলিয়া ধরিল, একটী বক্তৃতা দিতে হইবে।

শ্রীশ্রীবাবা উপদেশ দিতে লাগিলেন,—ভগবৎপ্রেম ছাড়া ব্রহ্মচর্য্য হয় না, ব্রহ্মচর্য্য ছাড়া ভগবৎপ্রেম হয় না। একটার সঙ্গে আর একটার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। একটা বাড়্লে আপনি অপরটা বাড়ে, একটা কম্লে আপনি অপরটা কমে। যেমন, শিকড় কেটে দিলে শুধু ডালের জোরে গাছ বাঁচে না, এবং সব ডাল কেটে দিলেও শুধু শিকড়ের জোরে গাছ বাঁচে না। অবশ্য, এর ব্যতি-

ক্রমও আছে। যেমন, জিওল গাছ আর কুল গাছ। জিওলগাছের শিকড় কেটে ডাল পুত্‌লেও বাঁচে, কুলগাছের শিকড় রেখে সব ডাল কেটে ফেল্‌লেও বাঁচে। একনিষ্ঠ ব্রহ্মচর্য্য থাক্‌লে একদিন ভগবৎপ্রেম আসেই। একনিষ্ঠ ভগবৎ-প্রেম থাক্‌লে ব্রহ্মচর্য্যও আসেই।

৯ শ্রাবণ, ১৩৩৮

গুরুর প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

বিগত পরশ্ব যে যুবক উকিলটীর সহিত শ্রীশ্রীবাবার কথা হইয়াছিল, আজ তিনি পুনরায় কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হঁা, গুরুর দরকার, যেহেতু অনেকের আত্মপ্রত্যয় থাকে না ব'লে নিজের নির্ব্বাচিত নামে পূর্ণ নিষ্ঠা রাখা সম্ভব হয় না। এরূপ স্থলে কেউ এসে একটী নামে দীক্ষা দিয়ে দিলে সেই নামটীতে দীর্ঘকালব্যাপী নিষ্ঠা রাখা সহজতর হয়। দ্বিতীয়তঃ অপরের অভিজ্ঞতা নিয়ে কাজ করায় সুবিধা আছে। যেমন, মক্কেলের পক্ষে নিজে আইন প'ড়ে তারপরে মামলা চালান কষ্টকর, তাই আইনজ্ঞের সাহায্য নিতে হয়। যেমন গৃহস্থের পক্ষে নিজে গৃহনির্ম্মাণ শিক্ষা ক'রে তারপরে ঘর তৈরী ক'রে বাস কত্তে গেলে অনেক দেরী হয়ে যায় ব'লে ঘরামির সাহায্য নিতে হয়। যেমন রোগীর পক্ষে নিজে ডাক্তারি শিখে রোগ সারাতে হ'লে বিপদ ঘটে, তাই সুবিজ্ঞ প্রবীণ চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হয়। ঠিক্ এই ভাবেই গুরুর দরকার।

প্রথার দাসত্ব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু বাবা "গুরু চাই" "গুরু চাই" ব'লে হট্টগোলটাই দেশে বেশী হচ্ছে "সাধন কর্ব্ব" "সাধন কর্ব্ব" ব'লে হট্টগোল হচ্ছে কোথায়? "ভগবানকে চাই" ব'লে মানুষ আকুল ক্রন্দন কোথায় কচ্ছে? দাসত্ব, বাবা, দাসত্ব, শুধু প্রথারই দাসত্ব কচ্ছ তোমরা। বিয়ে করার উদ্দেশ্য না জেনে কচ্ছ বিয়ে, গুরু করার উদ্দেশ্য না জেনে নিচ্ছ মন্ত্র; চল্‌তি ফ্যাসানের তোমরা সবাই ক্রীড়নক মাত্র। আত্ম-শ্রদ্ধাও নেই, লক্ষ্যেও দৃষ্টি নেই। শঙ্খ ফুঁকে একজন গুরুপূজা কচ্ছে, তুমি কর্ল্লে ব্যাণ্ড বাজিয়ে, ঘটার পরে ঘটা

বাড়াচ্ছ, কিন্তু কেউ তলিয়ে দেখ্‌ছ না, ভগবানের দিকে কদ্দূর এগুলে, কতটুকু পবিত্র হ'লে।

আধার-শুদ্ধি

প্রাতে নয়টা ত্রিশ মিনিটের ট্রেণে শ্রীশ্রীবাবা লাকসাম রওনা হইলেন। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশ্রীবাবাকে লাকসাম ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীবাবার ব্রহ্মচর্য্য-প্রচার ব্রতের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার মানে আধার-শুদ্ধি। দেহমনের শুদ্ধি সম্পাদন হ'লে তবে ত মহাভাব মহাকর্ম্মের উপযুক্ত তারা হবে। ভারত-বর্ষের বিরাট ভবিষ্যৎ ভারত-সন্তানদের শুদ্ধ দেহ ও শুদ্ধ মনের মধ্য দিয়েই আত্ম-প্রকাশ কর্ব্বে। অশুদ্ধ আধারে উচ্চভাব স্ফূরিত হয় না, হ'লেও দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

কৈশোরে স্বরূপানন্দ

শ্রীশ্রীবাবার খুল্লমাতা মহাশয়া রথ দেখিবার জন্য চাঁদপুর হইতে লাকসাম আসিয়াছিলেন, এখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। শ্রীশ্রীবাবা তাঁহার পাদবন্দনা করিতেই তিনি আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে শ্রীশ্রীবাবার বাল্য-জীবনের কাহিনী সব বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ভক্তপ্রবর কৃষ্ণবন্ধু তখন লাকসাম স্কুলের ছাত্র। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবন্ধু প্রভৃতি যুবকেরা শুনিতে লাগিলেন। সেই সকল কাহিনীর কয়েকটী নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

বাল্যকাল হইতেই শ্রীশ্রীবাবার স্বভাবে একটা অন্যমনস্কতা পরিলক্ষিত হইত। তিনি কোন্ একভাবে হয়ত ডুবিয়া থাকিতেন, বাহিরের শত কোলাহলেও মন টলিত না। শ্রীশ্রীবাবা যে অবিরাম নাম জপিতেন, এই কথা তখন কেহ জানিতেন না, তাই এই উন্মনস্কতাকে দোষের বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এই উন্মনস্কতা যে একাগ্রতা মাত্র, তাহার প্রমাণ এই ছিল যে, বিদ্যালয়ের পাঠ অভ্যাস করিতে বসিলেও অনুরূপ কোলাহলে তিনি আকৃষ্ট হই-তেন না এবং অপরাপরের সিকি সময়ের মধ্যে পাঠ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিতেন।

একদিন শ্রীশ্রীবাবার পড়িবার সময়ে একটী সহপাঠী শ্রীশ্রীবাবার পিঠে একটা আল্‌পিন দিয়া খোঁচা দিল। শ্রীশ্রীবাবা টেরও পাইলেন না, পরন্তু নিজের পড়াই পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। পরে দেখা গেল আল্‌পিনে আহত স্থান হইতে রক্ত-নির্গম হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবা তেল-নূন দিয়া মুড়ি খাইতে ভালবাসিতেন। একদিন তিনি মুড়ি খাইতে খাইতে নিজের ধ্যানে নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছেন। নিকটেই ছিল একটা পাত্রে অনেকগুলি ঝাল লঙ্কা। খাইতে খাইতে মুড়ি যখন শেষ হইয়া গিয়াছে, তখন লঙ্কার পর লঙ্কা তুলিয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। লঙ্কার ঝাল বিন্দুমাত্রও উপলব্ধ হইল না। খুল্লমাতার দৃষ্টি পড়িতে তিনি বলিতে লাগিলেন,—হতভাগা, করিস্ কি? তখন চমক ভাঙ্গিল। এতক্ষণ পরে টের পাওয়া গেল যে লঙ্কা ঝাল।

ভাত পরিবেশন-কালে পরিবেশনকারিণী বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ভাত দিব? ভাত দিব?" কিন্তু কে কার কথা শোনে? ভাত দেওয়া হইয়া গেল, অর্দ্ধেক ভাত উদরেও চলিয়া গেল, পরে হঠাৎ খেয়াল হইল যে এত ভাত পাতে আসিল কি করিয়া?

নদীতে স্নান করিতে গিয়া স্রোতে কাপড় ধরিয়াই শ্রীশ্রীবাবা চিন্তামগ্ন হইলেন। চিন্তায় নিবিষ্টতা হেতু হস্তমুষ্টি শিথিল হইল, স্রোতে কাপড় টানিয়া লইয়া গেল। খালি হাতে বাড়ী ফিরিয়া শ্রীশ্রীবাবা ব্রহ্মাণ্ডময় কাপড় খুঁজিয়া বেড়াইলেন।

ভাতের থালায় চারি পাঁচটা ব্যঞ্জন দেওয়া হইয়াছে। হয় ত নিবিষ্ট মনে চিন্তা চলিল। ফলে একটা পদ দিয়াই সব ভাত খাইয়া শ্রীশ্রীবাবা পাত্রত্যাগ করিলেন, অপর পদগুলি পাতেই পড়িয়া রহিল।

আহার করিয়া শ্রীশ্রীবাবা উঠিয়াছেন, অমনি কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন,— "*কি কি দিয়া খাইয়াছ?*" শ্রীশ্রীবাবা কখনো সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই।

বেলা হইয়াছে, স্কুলে যাইতে হইবে, আহারের কথা মনে হইল। অমনি

রান্নাঘরে গিয়া হয়ত এক বাটী ডাল উদরস্থ করিয়াই শ্রীশ্রীবাবা ধারণা করিলেন যে, খাওয়া হইয়া গিয়াছে এবং বিনা বিলম্বে স্কুলে চলিয়া গেলেন।

পশ্চিমের ঘরের একটা মশারির দড়ি বাহিয়া কি প্রকারে ঘরের টুয়ায় আগুন ধরিয়াছে। মধ্যে একটা বেড়া দিয়া ঐ ঘর দুই অংশে বিভক্ত করা ছিল। ছোট খণ্ডটীতে বসিয়া শ্রীশ্রীবাবা ধ্যান করিতেছিলেন। পাশের অংশেই আগুন নিভাইবার জন্য সকল লোক আসিয়া জল-ঢালাঢালি ও কত হৈ-চৈ করিলেন। শ্রীশ্রীবাবা টেরও পাইলেন না। আগুন নিভিবার অনেক পরে শ্রীশ্রীবাবা যখন বাহির হইয়া আসিলেন, তখন শুনিলেন যে ঘরে আগুন লাগিয়াছিল।

বাল্যকালেই শ্রীশ্রীবাবার পরদুঃখে সহানুভূতি ছিল অতি গভীর। অনেকদিন জ্বরে ভুগিবার পরে আজ অন্ন পথ্য করিতেছেন, এমন সময়ে এক ক্ষুধার্ত্ত পাগল আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। শ্রীশ্রীবাবা তাহাকে নিজের খাবার থালা দিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "আজও আমি বার্লি-ই খাব।" শ্রীশ্রীবাবার মাতৃ-দেবী পুনরায় আসিয়া অন্ন পথ্য রাঁধিলেন, তবে শ্রীশ্রীবাবা ভাত খাইলেন।

জুবিলী স্কুল ছিল রেলষ্টেশনের পাশে। ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে যাত্রীদের উঠা-নামা দেখা যায়। একদিন গাড়ী আসিতেছে, একজন বৃদ্ধ মুসলমান গাড়ী থামিবার আগেই গাড়ী ধরিয়া উঠিবার জন্য অতি অসঙ্গত ও বিপজ্জনক ভাবে দৌড়িতে লাগিল। শ্রীশ্রীবাবা ভুলিয়া গেলেন যে, তিনি ক্লাসে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছেন। তিনি জানালার মধ্য দিয়া অর্দ্ধেক শরীর বাহির করিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"ঐ মিয়া, গাড়ী ধরিও না।" ক্লাসে শিক্ষক পড়াইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "বেঞ্চের উপর দাঁড়াও।" যিনি পড়াশুনার জন্য কখনও তিরস্কৃত হন না, তিনি শিক্ষকের এই ব্যবহারের মর্ম্ম বুঝিলেন না, তবু বলিলেন,—"না স্যার, লোকটা গাড়ীচাপা পড়ে নাই।"

লাকসাম
১০ শ্রাবণ, ১৩৩৮

ধর্ম্মসাধন ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা

অদ্য অপরাহ্নে নশরথপুর আখড়াতে লাকসামের প্রায় অধিকাংশ বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা এবং লাকসাম হাইস্কুলের বহু ছাত্র সমবেত হইয়াছেন। আখড়ার নাট-মণ্ডপে শ্রীশ্রীবাবা দুই ঘণ্টা ব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মানুষের শ্রীবৃদ্ধিকে ধ'রে রাখ্‌বার জন্যই ধর্ম্ম, তাকে ধ্বংশের অতলে ডুবিয়ে দেবার জন্য নয়। ধর্ম্মই মানুষের অভ্যুদয়কে সহজ করে, সুগম করে, সুপ্রাপ্য করে। ধর্ম্মই মানবে মানবে হিংসা-বিদ্বেষের প্রশমন করে, অতীতের মঙ্গলকে বর্ত্তমানের উপর প্রতিষ্ঠিত করে, বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতের ঋদ্ধি সম্পাদনে নিয়োজিত করে। এইজন্যই ধর্ম্মের সাথে ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার কখনো আপোষ নেই। ইন্দ্রিয়-সেবাকে যে জীবনের লক্ষ্য করেছে, চিরকাল সে ধর্ম্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। ইন্দ্রিয়-সংযমকে যে অবলম্বন করেছে, তার জীবনে ধর্ম্ম তাঁর পূর্ণ প্রভায় বিকশিত হ'য়ে উঠেছেন। ধর্ম্মসাধক, ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতাকে তোমার মঙ্গল-পাদপের কুঠার ব'লে জানো এবং পরিহার কর। ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র রিপুর দাস, ধর্ম্ম তোমার কাছ থেকে শত যোজন দূরে অবস্থান করেন ব'লে বিশ্বাস কর এবং প্রাণপণ শক্তিতে ইন্দ্রিয়ের চপলতাকে প্রশমিত কর।

লাকসাম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ, বি, টি, মহাশয় বলিলেন,—আপনার অমৃতময়ী উপদেপ-বাণী থেকে আমার ছাত্রদিগকে বঞ্চিত করা চল্‌বে না। আমার স্কুলেও আপনাকে পদধূলি দিতে হবে।

শ্রীশ্রীবাবা সানন্দে সম্মত হইলেন এবং পরদিবস লাকসাম হাইস্কুলে বক্তৃতার ব্যবস্থা হইল।

লাকসাম
১১ শ্রাবণ, ১৩৩৮

স্থরেশ বাবুর ছাত্র-হিতৈষণা

প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুরেশবাবুর অনুরোধক্রমে বেলা দশ ঘটিকার

সময়েই শ্রীশ্রীবাবা লাকসাম হাইস্কুলে আসিয়াছেন। সংলগ্ন জগন্নাথ-বাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবার আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হাইস্কুলের মাঠের মধ্যেই একপ্রান্তে একটী মন্দির আছে, তাহাতে কোনও বিগ্রহ নাই। উহার ভিতরেই শ্রীশ্রীবাবাকে বিশ্রামের স্থান দেওয়া হইল। কিন্তু শ্রীশ্রীবাবা বিশ্রাম করিলেন না। সুরেশ বাবু শ্রীশ্রীবাবার নিকটে একটী একটী করিয়া যুবক প্রেরণ করিতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্রীবাবা তাহাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের সাহায্য-কর উপদেশ সমূহ দিতে লাগিলেন। এই প্রসঙ্গে এইখানে বলিয়া রাখা সঙ্গত যে, বাংলাদেশে যেখানেই শ্রীশ্রীবাবা কোনও বিদ্যালয়ের যুবকদিগকে সদুপদেশ দিতে গিয়াছেন, সেখানেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকেরা ছাত্রদিগকে শ্রীশ্রীবাবার সহিত নিগূঢ়ভাবে দেখা করিবার ও ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন করিবার প্রকৃষ্ট সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু লাকসাম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুরেশ বাবুর মত এত উদারতা, দূরদৃষ্টি ও ছাত্র-হিতৈষণার পরিচয় আর কেহ দিতে পারেন নাই। স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের হৃদয়িক সহযোগ এবং উৎসাহ-উদ্দীপনাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। ফলে, স্থানীয় ছাত্র-সমাজ যেভাবে উপকৃত হইয়াছে, তাহার স্মৃতি ইহারা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখিতে বাধ্য হইবে।

স্ত্রীপুরুষের পার্থক্য-বিচারে উদাসীন থাক

নিভৃতে উপদেশ-প্রার্থী একটী যুবকের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কারো কোলে কোনো শিশু দেখ্‌লে, সেইটী পুত্র কি কন্যা, সেই চিন্তা তুমি কখনো কর্‌বে না। ছেলে না মেয়ে, সে কৌতূহলকেই মনের কাছে আস্‌তে দেবে না। মনে যদি এই প্রশ্ন জাগে, তবে মনকে ঘুরিয়ে অন্য কোনও প্রসঙ্গে ধাবিত কর। শিশুকে শিশু জেনেই তুমি খালাস থাক। মাঠে যদি একপাল পশু থাকে, তবে তার মধ্যে কোন্‌টা স্ত্রী আর কোনটা পুরুষ, তা আবিষ্কারের চেষ্টা তোমার নিষ্প্রয়োজন। রেল-ষ্টেশনে, নৌকাঘাটে স্ত্রী-পুরুষ অহরহই তোমার চ'খে পড়্‌তে পারে। বেশভূষায় যাকে নারী ব'লে মনে হয়, তাকে

নারী জেনেই খালাস দাও। বেশভূষায় যাকে পুরুষ ব'লে মনে হয়, তাকে পুরুষ জেনেই খালাস দাও। তুমি সি-আই-ডির চাকুরী কর না যে, কে সত্যি পুরুষ, কে সত্যি নারী, তা তোমাকে আবিষ্কার কত্তেই হবে। কাউকে দেখে তোমার স্ত্রীলোক ব'লে মনে হ'ল। ব্যস্, ফুরিয়ে গেল। কাউকে দেখে তোমার পুরুষ ব'লে মনে হ'ল। ব্যস্, ফুরিয়ে গেল। স্ত্রীপুরুষের পার্থক্য-নির্ণায়ক যে চিহ্ন, সে চিহ্নগুলির উপরে মনকে বস্‌তে দিও না। এই ভাবে উদাসীন মন নিয়ে চল, তাহ'লেই সব উদ্বেগ কেটে যাবে।

চক্ষে যাহাই দেখ, চিত্তকে কলুষিত হইতে দিবে না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—স্ত্রীলোক দেখ্‌লে তার পানে তাকিয়ে থাক্‌বার দরকার কি? আবার স্ত্রীলোক তোমার চ'খে প'ড়ে গেছে ব'লেই নিজেকে অপরাধী মনে কর্‌বারই বা কি আছে? কি ছেলেদের, কি মেয়েদের, সকলেরই পরস্পরের সম্পর্কে কতকগুলি বিধি মানা উচিত। ছেলেরা যদি মেয়েদের দেখে, তবে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকা উচিত নয়। মেয়েরা যদি ছেলেদের দেখে, তাহ'লেও তাদের দিকে তাকিয়ে থাকা উচিত নয়। চ'খে পড়েছে, তাতে দোষ কি? চ'খকে তার গায়ে লাগিয়ে রেখ না। রূপ তার প্রচুর, তাতেই বা দোষ কি? সেই রূপটার গায়ে মনকে লাগিয়ে রেখ না। রাস্তা দিয়ে চল্‌বার সময়ে পথের ধূলা গায়ে লাগে, তাই ব'লে কি সেই ধূলোকে চিরকালই কেউ সর্ব্বাঙ্গে সযত্নে লগ্ন ক'রে রাখে? বাড়ী ফিরেই ঝেড়ে ফেলে দেয়। পথে দেখেছ সুরূপ সুকান্ত মূর্ত্তি, তোমার তাতে দোষ কি? পথ রয়েছে মানুষের চল্‌বার জন্য, পুরুষও চল্‌বে, নারীও চল্‌বে, মানবও চল্‌বে, জীবজন্তুও চল্‌বে, হাতীও চল্‌বে, কুকুরও চল্‌বে, সুরূপও চল্‌বে, কুরূপও চল্‌বে। আর, পথ চলার সময়ে কেউ চ'খ বেঁধে চল্‌তে পারে না। অতএব, চ'খে কত সুরূপ কুরূপই পড়্‌বে, তার নির্দ্দেশ করা চলে না। মনকে রাখ সাচ্চা, দিল্‌কে কর খাঁটি, জিদ্ কর যে যাই যখন দেখ্‌বে, চিত্তকে কলুষিত হ'তে দেবে না।

লালসার বস্তুতে ঈশ্বর-চিন্তন

যুবক বলিল যে, কখনও কখনও এমন দুই একটী মূর্ত্তি চক্ষে পড়ে, ইচ্ছা করিয়াও যাহা ভোলা যায় না, তাহাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি চিন্তা না করিয়াই থাকা যায় না।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তাতেও ভয় পাবার কিছুই নেই। প্রথমে চেষ্টা কর যাতে ভুলে যেতে পার। সে চেষ্টা যদি সফল না হয়, তবে অন্য পথ ধর্‌বে। অনেক সময় এমনও হয়, যাকে তুমি ভুলে যেতে চাও, সে আরো জোর ক'রে মনের ভিতরে বাসা বেঁধে থাকে। এরূপ অবস্থায়ও তুমি উপায়হীন নও। যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কিছুতেই ভুল্‌তে পাচ্ছ না, ইচ্ছা ক'রেই তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি চিন্তা কত্তে থাক, আর ঐ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরাৎপর পরমেশ্বর বাস কচ্ছেন, ভগবানের ওরা অধিষ্ঠানভূমি, এইরূপ ধ্যান জমাতে চেষ্টা কর। বিম্বাধরে ভগবতী করেন নিবাস, চক্ষে জ্যোতির্ম্ময়ী জগজ্জননী, বক্ষে স্তন্যরস-বিধায়িনী জগন্মাতা,—এই ভাবে ধ্যান জমাও। দু'চার দিন যেতেই দেখ্‌বে, মনের পঙ্কিলতা আত্মহত্যা করেছে, তুমি লালসা-পাশ মুক্ত হ'য়ে গেছ।

মানসিক ঘনিষ্ঠতা বর্জ্জন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ছেলেদেরও উচিত নয়, মেয়েদের কথা ভাবা, মেয়েদেরও উচিত নয়, ছেলেদের কথা ভাবা। অগঠিত অবস্থায় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে দৈহিক নৈকট্য যাতে কম হয়, তার ব্যবস্থা সমাজে করা রয়েছে। তার সদুদ্দেশ্যের পানে তাকিয়ে যথাসাধ্য সামাজিক বিধি-নিষেধ পালন করা উচিত। কিন্তু দৈহিক দূরত্ব রাখার যে সামাজিক ব্যবস্থা, তার ত প্রকৃত উদ্দেশ্য মানসিক ঘনিষ্ঠতা বর্জ্জন। তোমার উচিত নয়, মন দিয়েও মেয়েদের সঙ্গ করা। মেয়েদের উচিত নয়, মন দিয়েও ছেলেদের সঙ্গ করা। মানসিক ঘনিষ্ঠতাই মানসিক উদ্বেগকে বর্দ্ধিত করে। উৎকণ্ঠিত চিত্ত নিয়ে কে কবে শান্তি লাভ করে?

সঙ্গ কর ভগবানের

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সঙ্গ কর ভগবানের। দেহে হও তাঁর, মনে হও তাঁর। দেহকে লাগাও সেই কাজে, যে কাজে তাঁর কাছে পৌছা যায়। মনকে লাগাও সেই কাজে, যে কাজে তিনি অন্তরের অন্তরতম হন। ঘনিষ্ঠতা কর তাঁর সঙ্গে, প্রেম জমাও তাঁর সাথে, চিন্তা কর তাঁর রূপের, তাঁর গুণের, তাঁর মহিমার। শান্তি পাবারও পথ এই, সার্থক হবারও পথ এই।

সাক্ষাৎ ডাইনি

অপর একটী যুবক তাহার বক্তব্য নিবেদন করিলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ছেলে, বোন্‌-পো, ভাই এ সব সম্বোধনের মধ্য দিয়ে খাতির পাতিয়ে নিয়ে যে সব মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'রে দেয়, দৈহিক ঘনিষ্ঠতা সুরু ক'রে দেয়, স্তন্য পান করানো, চুমো দেওয়া বা চুমো নেওয়া, জড়িয়ে ধরা বা জড়িয়ে ধরানো, গায়ের উপরে হাত-পা ছড়িয়ে দেওয়া বা ছড়িয়ে দেওয়ানো প্রভৃতিতে কুণ্ঠা বোধ না ক'রে বরং প্ররোচনা দিতে থাকে, জান্‌বে তারা মা'ও নয়, মাসীও নয়, বোনও নয়, তারা নর-রক্তপায়িনী সাক্ষাৎ ডাইনি। স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার অভিনয় ক'রে তারা নিজের কদর্য্য অভিলাষকে লুকিয়ে রাখে এবং চ'খে-দেখ্‌তে-ভাল এমন আবরণের নীচে নিজের গোপন কাম-প্রবৃত্তিকেই মাত্র চরিতার্থ ক'রে নেয়। এদের কাছ থেকে তোমরা সাবধান থেকো। কোন্ ছলে যে ডাইনি এসে তোমার ঘাড় মট্‌কাবে, তা বলা কঠিন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একটী ঘটনা শুন্‌বে? এই রকম এক ডাইনি পাড়ার তের-চৌদ্দজন যুবকের মাথা খেয়ে শেষে এল তোমার মত বয়সের একটী চরিত্রবান্ যুবকের কাছে, প্রভু জগদ্বন্ধুর ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ যার জীবনের উপরে কাজ কচ্ছে। ডাইনি দেখতে খুবই সুন্দরী, বয়স হলেও পূর্ণ যুবতীর ন্যায় তার শরীরের বাঁধুনি, মিষ্টি কথায় অসম্ভব পটু। যুবকটী ঢাকাতে পড়ে, ছুটীতে বাড়ী এসেছে, নিজেদের অনেকগুলি ভাড়াটে বাসা আছে, তারই একটা খালি বাসা দখল ক'রে সে দুপুরে পড়াশুনা করে এবং রাত্রে ঘুমোয়।

ডাইনি এসে রোজ দুপুরে এখানে আলাপ জমাতে লাগ্‌ল। আজ কালীর কথা, কাল কৃষ্ণের কথা, পরশু শ্রীগৌরাঙ্গের কথা,—পড়ার ঘর যেন হরি-সভায় পরিণত হ'য়ে গেল। কিন্তু রোজ পড়ার ক্ষতি হচ্ছে। সুতরাং যুবকটী ধর্ম্মকথা উঠ্‌লেই নিজের পড়ায় মন দিতে লাগ্‌ল। ডাইনি দেখ্‌লে, সুবিধে হচ্ছে না। এখন থেকে ডাইনি রোজ এসে দুপুর বেলা তুলসী পাতা চাইতে লাগ্‌ল। ডাক-সম্পর্কে সে খুড়ীমা সেজেছে। অতএব ভাসুর-পো'র আর সাধ্য রইল না পূজার জন্য তুলসীপাতা না এনে দিয়ে। একদিন ডাইনি আস্‌তেই যুবক জিজ্ঞাসা কল্ল,—"আপনি আহার করেছেন"? ডাইনি বল্লে,—"এই মাত্র আহার ক'রে এলাম। দেখ্‌ছ না, মুখে পান চিবুচ্ছি?" যুবক বল্লে,—"আমি রোজই আপনার মুখে পান দেখি, অথচ পূজার জন্য তুলসীপাতা চাইতে আসেন। খেয়ে দেয়ে আবার পূজা কিসের? আমি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আপনি অন্য উদ্দেশ্যে আসেন। আপনাকে আমি দৃঢ়রূপে জানিয়ে দিচ্ছি যে, আপনি আমার কাছে আর আস্‌বেন না। যদি আসেন, তাহ'লে আপনাকে অসম্মান পেতে হবে।"—সেইদিন থেকে ডাইনি আসা বন্ধ কল্ল। স্কুলের ছুটী ফুরিয়ে গেল, যুবকটি চলে গেল ঢাকা, সেখানে গিয়ে কোনও বন্ধুর পত্রে সে অবগত হ'ল যে, সুন্দরী সেই ডাইনি পাড়ার আর একটি যুবকের খুড়ীমা সেজে এমন জঘন্য কাণ্ড ক'রে ধরা পড়েছে যে, ভাড়াটে বাসার মালিক তাকে তার স্বামী ও পরিজনবর্গসহ উঠে যাবার নোটিশ দিয়েছেন। রাক্ষসী-রমণীগুলি এইভাবে অহরহ নানা মধুর সম্পর্কের ভাণ ক'রে যুবকদের চরিত্রনাশ করে এবং মস্তিষ্ক-চর্ব্বণ করে। একথা জেনে, সাবধান হয়ে চ'লো। অবশ্য, কেউ তোমাকে স্নেহ কল্লে'ই মনে করো না সে অসতী। কিন্তু স্নেহটা যত ভাল ভঙ্গিমার মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হোক্‌, আতিশয্য দেখ্‌লে স'রে পড়্‌বে, গোপনতার প্রশ্রয় দেবে না প্রাণ গেলেও, অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতাকে বর্জ্জন কর্ব্বে।

মায়াবী নর-রাক্ষস

যুববটির জীবনের ইতিহাসই এমন যে, শ্রীশ্রীবাবার কথাগুলি শুনিয়া সে

মর্ম্মে মর্ম্মে তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল এবং উৎসাহবশে নারী-চরিত্রের নিন্দাসূচক কয়েকটী মন্তব্য করিল।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—না বাবা, স্ত্রীলোকদের নিন্দা করারও তোমার অধিকার নেই। পুরুষগুলিও বড় কম যায় না। মা, মাসী, দিদি, বোন্, প্রভৃতি নানা নির্দ্দোষ সম্পর্কের মুখোস প'রে মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে, স্নেহ-শ্রদ্ধা প্রদর্শন ক'রে তাদের মন গলিয়ে, তাদের প্রীতিকর দেশহিত, জগদ্ধিত, ধর্ম্মচর্য্যা প্রভৃতির কথা ক'য়ে ক'য়ে তাদের হৃদয়কে অভিভূত ক'রে, তারপরে আদর-সোহাগ দেখাবার নাম ক'রে গলাগলি ঢলাঢলি সুরু ক'রে দেয়,—এরূপ চরিত্রহীন পুরুষের সংখ্যা জগতে কম নয়। এরা সাক্ষাৎ রাক্ষস, দেখ্‌তে মাত্র মানুষের মত এদের চেহারা। এসব মায়াবী নররাক্ষসেরা কোন্ ছল ক'রে যে কোন্ মেয়েটীকে বশে আন্‌বে এবং তারপরে মেয়েদের উপরে নিজেদের জঘন্য কাম-বৃত্তিকে চরিতার্থ ক'রে নেবে, তার কোনো হিসাব নেই। পাতান সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে এমন কাজ এরা মেয়েদের সঙ্গে কর্ব্বে, যা নিজের মা, মাসী বা বোনের সঙ্গে কখনো করেনি বা কত্তে পারে না। এরা চুম্ খাবে, জড়িয়ে ধর্‌বে,—মাই চুষ্‌বে, শরীরের যে সব স্থানে হাত দেওয়া উচিত নয়, সেই সব স্থানে হস্ত-সঞ্চালন কর্ব্বে, কিন্তু নিজের মনকেও প্রবোধ দেবে, মেয়েটীকেও দিব্যি বুঝিয়ে দেবে যে, এরা নষ্ট-চরিত্র হয় নি। বাইরে লোকের কাছে নিজেদের সাধুত্ব ফলিয়ে বেড়াবে, আর ভিতরে ভিতরে অবোধ মেয়েগুলিকে বিপথে চালিয়ে নিয়ে যাবে। মেয়েগুলি জানে না যে এরূপ ছোটলোক ছেলেদের ভিতরে কত শত শত রয়েছে। তাই তারা বিভ্রান্ত হয় এবং জীবনব্যাপী হাহাকার সঞ্চয় করে।

শাস্ত্রে নারীনিন্দার কারণ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীজাতির অশেষ নিন্দা করেছেন। বুদ্ধদেব ত তাঁর ভিক্ষুসঙ্ঘের কাছে অসংখ্য বার বলেছেন যে, স্ত্রীরা জন্মমাত্র অসতী, অকৃতজ্ঞা ও পাপপরায়ণা। তার কারণ এই নয় যে, পুরুষেরা সব দেবতা। তাঁরা উপদেশ দিয়েছেন পুরুষ শিষ্যকে, তাই নারী-চরিত্রের জঘন্য

দিকটা আলোচনা ক'রে শিষ্যদের মনকে নারী-লালসা-বর্জ্জিত কত্তে চেয়েছেন। তাঁরা যদি নারী-শিষ্যকে উপদেশ দিতেন, তা হ'লে আবার বল্‌তে হত,—"পুরুষগুলি পিশাচ, এদের ছায়া মাড়িও না।"

কেমন ছেলেরা মেয়েদের পক্ষে বিপজ্জনক

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু পরশু আমি কুমিল্লাতে একটী মেয়েকে কি উপদেশ দিয়ে এসেছি, জানিস্? আমি বলেছি,—"তোকে যদি কেউ বোন্ ব'লে ডাকে, আর, সে যদি নিজের বোনের চেয়ে বেশী দরদ তোকে দেখায়, যে রকম গলাগলি ভাব নিজের বোনের প্রতি দেখায় না, তোর প্রতি যদি সে সেই ভাব দেখায়, তবে জান্‌বি সে ভাল ছেলে নয়। নিজের মাকে যে পূজা করে না, নিজের মায়ের সুখদুঃখকে যে দেখে না, সে যদি তোকে মা ডেকে খাতির পাতায় আর স্নেহ-আবদারের আতিশয্য করে, তবে জান্‌বি, সে ভাল ছেলে নয়। নিজের বিধবা মাসীমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ত ক'রে দিতে যার অরুচি, সে যদি তোকে মাসী-মা ব'লে ডাকাডাকি সুরু করে, আর তোকে পড়ান শুনান, বিদ্যাদান করা, পণ্ডিতানী করাকে জীবনের পরমব্রত ব'লে ভাণ করে, তবে জান্‌বি, সে ভাল ছেলে নয়। নিজের রুগ্না কাকীমাকে শুশ্রূষা কত্তে যার অনিচ্ছা, কিন্তু তোকে নিয়ে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘর বেড়িয়ে এলে পরে কলেজের পড়ার ক্ষতি হয় না, জান্‌বি, সে ভাল ছেলে নয়। এসব ছেলে আমমাংসভোজী নরখাদক জন্তু-বিশেষ। এদের সম্পর্কে সাবধান।" —এই উপদেশ আমি একটী মেয়েকে দিয়ে এসেছি। বুদ্ধ বা ব্যাস যদি মেয়েদের উপদেশ দিতেন, তবে তারা বল্‌তেন যে,—পুরুষ পিশাচের অবতার, নরকের দূত, অধঃপতনের সিঁড়ি।

শিশুদের মধ্যে "স্বামি-স্ত্রী" বা "বিয়ে-করা" খেলা

অপর একটী যুবক তাহার বক্তব্য নিবেদন করিলে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—নিজের জীবনে যা ঘটেছে, ঘটেছে। তার জন্য অনুশোচনা ক'রে আর কি হবে? আজ থেকে প্রতিজ্ঞা কর যে, এরূপ ঘটনা যা'তে আর কারো জীবনে না ঘট্‌তে পারে, তার জন্য একটু সেবা সমাজকে দেবে। কোথাও কোনও

ছেলে-মেয়েদের "স্বামী স্ত্রী"-খেলা খেল্‌তে দেখ্‌লে তাদের প্রতিনিবৃত্ত করবে। শাসন ক'রে প্রতিনিবৃত্ত করার ফল অনেক সময় খারাপ হয়, এজন্য কৌশল ক'রে প্রতিনিবৃত্ত কত্তে হবে। ছোট থাকতে "বিয়ে-করা" খেলা খেল্‌তে নেই, বড় হ'লে এ খেলা খেল্‌তে হয়, এরূপ উপদেশ দিয়ে প্রতিনিবৃত্ত করবে। তোমাকে কেউ প্রতিনিবৃত্ত করেন নি, তার ফল তুমি ভুগেছ। এরকম ফলভোগ আর কাউকে না কত্তে হয়, সেজন্য তোমার একটু চেষ্টা থাকলেই তোমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের সঙ্গত প্রায়শ্চিত্ত হবে।

"স্বামি-স্ত্রী" খেলার উৎপত্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মেয়েদের সঙ্গে "স্বামী-স্ত্রী" খেলা খেলে নিজের তুমি ক্ষতি করেছ, কয়েকটা মেয়েরও ক্ষতি করেছ, এজন্য নিজেকে আর দায়ী ব'লে মনে ক'রো না। দায়ী তোমার পিতামাতা, দায়ী তোমার অভিভাবক-অভিভাবিকা, দায়ী তোমার সমাজ। দেড় বছর বয়সের শিশুই যে প্রবীণের মত সূক্ষ্ম পরিদর্শক, একথা তারা জানে না। তোমাদের শিশু-কালেই তোমাদের চ'খের সাম্‌নে তারা স্ত্রীপুরুষে এমন সব ব্যবহার করেছেন, যা অতি গুপ্তভাবে অলোপনীয় সংস্কাররূপে তোমাদের মনের সাথে লগ্ন হ'য়ে রয়েছে। সেই সব সংস্কারের প্রভাবেই শিশুকালেই ছেলেমেয়েরা মিলে স্বামি-স্ত্রী খেলা খেল্‌তে প্রলুব্ধ হয়েছ এবং দুঃখজনক চরম ফল আহরণ করেছ। তোমরা যখন পিতামাতা হবে, সমাজের অভিভাবক হবে, তখন দেড় বছর বয়সের শিশুকেই ত্রিশ বৎসরের যুবকের মত জ্ঞান ক'রে তার চ'খের সাম্‌না থেকে সকল ইন্দ্রিয়-প্ররোচক দাম্পত্য-ব্যবহারকে দূরে রাখ্‌বে, এইটী সঙ্কল্প কর। শিশুকে ঘুমন্ত মনে ক'রে বাপ-মা নিশ্চিন্তে দাম্পত্য-ব্যবহারে রত হয়েছে, আর তাদের অজ্ঞাতে শিশু সেই দৃশ্য দেখেছে, তার মনে সেই দৃশ্যের ছাপ পড়েছে এবং তারই ফল শিশুর সমগ্র জীবনকে অনুসরণ করেছে। এই দুর্নিমিত্তের জন্য দায়ী পিতামাতা ও অভিভাবক, তুমি নও বা তোমার দ্বারা যে সব মেয়ের অনিষ্ট হয়েছে, তারা নয়। সুতরাং অনুতাপ পরিহার কর এবং আর যাতে জীবনে নীচতা প্রবেশ না কত্তে পারে, তার জন্য ব্রতপরায়ণ হও।

বারংবার ভ্রম করিও না

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যুগই এমন নয় যে, আশা কত্তে পারব, সব ছেলেরা সব মেয়েরা বিয়ের আগ পর্য্যন্ত পবিত্র থাকবেই। ভুল যদি কেউ ক'রেই ফেলে, একবার করেছে ব'লে দু'বার করবে কেন? যে সব মেয়েদের সঙ্গে অসুচিত ব্যবহার করেছ, এখন থেকে জেনে রাখ, তাদের প্রতি তোমাকে ঘৃণাশীল না হ'য়েই শ্রদ্ধাশীল হ'তে চেষ্টা কত্তে হবে। তারাই তোমাকে নষ্ট করেছে কি তুমিই তাদের নষ্ট করেছ, একথা হলফ ক'রে বল্‌তে পার না। হয় ত তোমার ব্যবহার বা তোমারই মত অপর কোনও যুবকের ব্যবহার তাদের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দায়ী। এ ক্ষেত্রে তার প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ পোষণ করা তোমার অন্যায়। বরং সে যদি এখন থেকে একনিষ্ঠ প্রযত্নে ভাল হতে চেষ্টা করে, তা হ'লে এখনও যে তার জগতে বড় হবার অধিকার আছে, এই কথা মনে ক'রে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মহিমার দিকে তাকিয়ে তুমি তোমার বিদ্বেষ ও ঘৃণাকে দমন কর। তোমারও যে এখনো নিজেকে সংশোধন ক'রে বড় হবার অধিকার আছে, মানুষ হবার শক্তি আছে, এই কথা বিশ্বাস ক'রে প্রচণ্ড বিক্রমে আত্মগঠনে তৎপর হওয়া উচিত। যার সঙ্গে মিশে মন্দ কাজ করেছ, তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলেও অতীত মন্দ কাজগুলির চিন্তা ক'রে মনকে বিমর্ষ করা ভুল। যাদের সংসর্গে কুকাজ করেছ, আত্মগঠনের প্রয়োজনে তাদের সংসর্গ সম্পূর্ণ বর্জ্জন করাই এখন অত্যন্ত সঙ্গত। কিন্তু দেখা-সাক্ষাৎ যদি কখনো ঘ'টে যায়, তবে অপ্রীতি না দেখিয়ে ঘনিষ্ঠতাও না ক'রে, নিজের শ্রেষ্ঠ ভবিষ্যৎকে সাম্‌নে রেখে নির্ভয়ে কর্ত্তব্য কাজ ক'রে যাও। অতীতের পচা-গলা গোমাংসপিণ্ডকে আঁকড়ে ধ'রে কি লাভ হবে?

অদ্য প্রায় দশ এগারটী যুবক এইভাবে শ্রীশ্রীবাবার শ্রীমুখ হইতে নিভৃত উপদেশ লাভ করিল।

লাকসামের বক্তৃতা: স্নানের ঘাটের পাগল

অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় বক্তৃতার আয়োজন হইল। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্, এ, বি, টি, হেডমাষ্টার মহাশয় উদ্বোধন-প্রসঙ্গে বলিলেন,—

"প্রিয় ছাত্রগণ, তোমাদের হয়ত মনে আছে, গত বছর শীতকালে তোমাদের স্কুলের ঘাটলায় একজন পাগলের মত লোক বসেছিলেন, কারো সঙ্গে কথা বলেন নি, কিন্তু স্নানের ঘাটের জঙ্গল আর ঘাসের চাপড়া পরিষ্কার করেছিলেন। তিনি তখন মৌনী ছিলেন। তোমরা তাঁর কার্য্য-কলাপ দেখে আকৃষ্ট হ'য়ে তাঁকে তোমাদের ছাত্রাবাসে নিয়ে এসেছিলে। তিনি আসামাত্র তোমাদের ছাত্রাবাসের সেই সিঁড়িগুলি থেকে ঘাসের চাপড়া টেনে টেনে তুল্‌তে লাগ্‌লেন, তোমাদের আলস্যের ফলে যাদের জন্ম ও বিস্তার সম্ভব হয়েছিল। মহাপুরুষের নির্ব্বাক প্রেরণায় তখন তোমরাও সেই সিঁড়ি পরিষ্কারের কাজে লেগে গেলে। তোমাদের ঘর্ম্মাক্ত ও ক্লান্ত দেখে তিনি তখন তোমাদের জলযোগের জন্য পকেট থেকে একটী আধুলি বে'র ক'রে দিলেন। তোমরা তাঁর মহত্ত্বে লজ্জিত হ'য়ে তাঁর আধুলি তাঁকে ফেরৎ দিয়ে দিলে। তখন তিনি তোমাদের প্রত্যেকের খাতায় একটী একটী ক'রে কবিতা যখন তখন রচনা ক'রে লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন। তোমাদের যার যা চরিত্র, তোমাদের যার যেরূপ উপদেশের প্রয়োজন, সেই পাগল তোমাদের খাতাতে ঠিক্ তার অনুরূপ উপদেশ সব লিখে দিয়েছিলেন। দেখে তোমরা অবাক্ হয়েছিলে এবং সেই পাগলকে একজন প্রকৃত মহাপুরুষ ব'লে মনে করেছিলে। আজ সেই পাগল একবৎসর ব্যাপী মৌনব্রত উদ্‌যাপনের পরে তোমাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর অমৃতময়ী বাণী তোমাদের শুনাবার জন্য। আজ তিনি তোমাদের অনেককে সঙ্গ দিয়েও কৃতার্থ ক'রেছেন। তোমরা এ মহাপুরুষের উপদেশ পালন ক'রে কৃতার্থ হও। একদিন তিনি তোমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, স্নানের ঘাটের জঙ্গল, ঘরের সিড়ির ঘাস কি ক'রে দূর কত্তে হয়। আজ তিনি তোমাদের দেখাবেন, মনের জঙ্গল কি ক'রে পরিষ্কার কত্তে হয়। তোমরা তোমাদের মনের জঙ্গল পরিষ্কার কর্ব্বার এ উপদেশ জীবনে কখনো বিস্মৃত হয়ো না, এই আমার প্রার্থনা।"

বাল্য জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা

অতঃপর শ্রীশ্রীবাবা প্রায় তিন ঘণ্টা ব্যাপী এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া

ব্রহ্মচর্য্য ও ইন্দ্রিয়-সংযমের আদর্শ, উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, উপায় ও কৌশল-সমূহ ব্যাখা করিলেন। পরিশেষে বলিলেন,—হে ছাত্রগণ, তোমরা এখনও বালক মাত্র। কুসঙ্গে মিশে কুপরামর্শে প'ড়ে কেউ যদি কিছু ভুল-ভ্রান্তি জীবনে ক'রে থাক, আত্ম-সংশোধনের শক্তি তোমাদের আছে। অভ্যাসের ক্ষণিক দাসত্বকে চিরদাসত্বে পরিণত হ'তে দিও না। চারা-গাছের ডাল ধ'রে বাঁকিয়ে দিলে সে চিরকাল বাঁকা হয়েই বাড়ে, কিন্তু সোজা ক'রে বেঁধে দিলে সে চিরকাল সোজা হয়েই বাড়ে। তোমরা চারাগাছ। যেদিকে ইচ্ছা সেই দিকে তোমাদের জীবনকে প্রবর্দ্ধিত কত্তে পার। মানুষ হ'তে চাইলে মহামানব হ'তে পার, পশু হতে চাইলে একেবারে জানোয়ারের অধম হ'তে পার। এই বয়সে যা হ'তে তুমি চাইবে, ভাবী কালে তাই তুমি হবে। বাল্যের আকাঙ্ক্ষা, অল্প হোক্ বেশী হোক্, ভবিষ্যৎ জীবনে পূর্ণ হয়ই হয়। তবে কেন তোমরা নীচ হ'বার আকাঙ্ক্ষা করবে, তবে কেন তোমরা সমাজের নিষ্প্রয়োজনীয় আবর্জ্জনা হ'য়ে থাকতে চাইবে? আকাঙ্ক্ষাকে কর উচ্চ, প্রার্থনাকে কর মহৎ, লক্ষ্যকে কর অভ্রভেদী, দৃষ্টিকে কর প্রসারিত।

ইন্দ্রিয়-সংযমের উপায়

১২ শ্রাবণ, ১৩৩৮

অদ্য শ্রীশ্রীবাবা লাকসাম হইতে ভোরা-জগৎপুর আখড়ার গোস্বামী মহাশয়ের ভবনে নৌকাযোগে যাইতেছেন। সঙ্গে মহেশ নামক লাকসাম স্কুলের একটী ছাত্র যাইতেছে।

মহেশ জিজ্ঞাসা করিল,—ইন্দ্রিয়-সংযমের উপায় কি?

বর্ষার বারিধারায় ডাকাতিয়া নদীর জলধারা প্রবল বেগে ছুটিতেছে। নৌকা উজানে চলিতেছে। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এই ডাকাতিয়া নদীর স্রোত বন্ধ করার উপায় কি?

মহেশ।—বাঁধ দেওয়া।

শ্রীশ্রীবাবা।—এ' প্রবল স্রোতে বাঁধ রাখা কঠিন হবে। বাঁধ উপচে জল চলবে। তার কি করা?

মহেশ।—যেখানে বাঁধ দেওয়া, তার উপরে অন্য দিকে একটা খাল কেটে স্রোতকে ভিন্ন দিকে চালিয়ে দিতে হবে।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ইন্দ্রিয়-সংযমও এমন ক'রেই কত্তে হয়। প্রবল উদ্দাম চিত্তবৃত্তিকে ভোগের দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে জীব-কল্যাণ, জগৎ-কল্যাণ, দেশ-সেবা, ভগবৎ-সাধনা এই সব দিকে পরিচালিত কত্তে হয়। তাতেই ইন্দ্রিয়-সংযম সহজ হয়।

তারপরে শ্রীশ্রীবাবা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—অগস্ত্য ঋষির মতন যদি কেউ হন, তবে এক গণ্ডুষে সমগ্র ডাকাতিয়ার জল নিঃশেষও ক'রে দিতে পারেন।

দর্শনে ভাব-প্রসারণ

মহেশ আর একটী-প্রশ্ন করিতেই শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্, আর খুঁজে দেখ্, এই মুখচ্ছবিতেই তোর প্রশ্নের জবাব রয়েছে। যে দৃঢ়, তার মুখপানে তাকালে দ্রষ্টার মনে দৃঢ়তা আসে। যে ক্রুদ্ধ তার মুখপানে তাকালে মনে ক্রোধ জন্মে। যে কামুক, তার দিকে তাকালে কামের উত্তেজনা হয়। আমি যা, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে সব ভাবের সাথে তোর পরিচয় হবে।

সদুপায়ে অর্থার্জ্জন

১৩ শ্রাবণ, ১৩৩৮

ভোরা জগৎপুরে গোস্বামি-গৃহে অদ্য প্রাতে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় নানা বিষয়ে সদালাপ করিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একটা দেশ বা জাতিকে উন্নত কত্তে হ'লে জাতির প্রত্যেকটী লোকের ভিতরে এই ধারণাটাই খুব গভীরভাবে স্পষ্ট ক'রে দেওয়া দরকার যে, অসদুপায়ে অর্থ অর্জ্জন কত্তে চেষ্টা করা পাপ। একটা হাটে যদি একটী দোকানদার থাকে, যে মিথ্যা কথা বলে না এবং খরিদ্দারকে ঠকাবার চেষ্টা করে না, তাহ'লে বিনা উপদেশে সে বৎসরে এক হাজার লোকের চরিত্র-সংশোধন কত্তে পারে।

চুম্বন-বর্জ্জন

বেলা প্রায় দশ ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীবাবা ভোরা-জগৎপুর হইতে নৌকা-যোগে নশরৎপুর ফিরিয়া আসিলেন। একটী ছেলে একটী শিশুকে চুম্বন করিতেছিল।

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—বিবাহিত দম্পতীর ভিতরে ব্যতীত অপর সকল স্থল থেকে চুম্বনকে বহিষ্কৃত করা সঙ্গত। শিশুদিগকে আদর করার জন্য যে চুমো খাওয়া হয়, আমি তারও ঘোর বিরোধী। চুম্বনের মধ্য দিয়ে একজনের রোগ আর একজনের শরীরে ত যায়ই, পরন্তু চুম্বনের মধ্য দিয়ে দেহমনের মধ্যে এমন সব ভাবান্তরের সঞ্চার হয়, যাতে এই বস্তুটীকে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে আবদ্ধ রাখাই উচিত।

ধর্ম্মপ্রচারকের পক্ষে চুম্বন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আমি কোনো কোনো ধর্ম্মপ্রচারককেও দেখেছি, যাঁরা শিষ্য-শিষ্যাদের চুম্বন ক'রে আদর করেন। তাঁদের দেখে আমি প্রথমে বুঝ্‌তে পারিনি যে, এর সুফল বা কুফল কি। কিন্তু কালক্রমে সেই সব ধর্ম্মপ্রচারকদের এই একটুখানি অসতর্ক আচরণের অবশ্যম্ভাবী কুফলকে সমাজের উপর ব্যাপকভাবে পড়্‌তে লক্ষ্য ক'রে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, চুম্বন সকল অবস্থাতেই বর্জ্জনীয়, বাদে স্বামি-স্ত্রীর ভিতরে। স্থূলভাবে দেখ্‌তে গেলে চুমো খেয়ে আদর দেখান, আর গা-চাটা একই কথা। স্নেহ দেখাবার আরো অনেক সুন্দর পন্থা রয়েছে। সুতরাং সমাজের প্রকাশ্য জীবন থেকে চুম্বনকে তুলে দিলে সমাজের কোনো ক্ষতি হয় না।

মাতা-পিতা বা বয়স্ক ভাইবোন কর্ত্তৃক শিশু-চুম্বন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মাতা বা পিতা শিশুকে চুম্বন করেন, বয়স্ক ভাই-বোন্‌রা শিশু-ভাইবোন্‌কে চুম্বন করে, এর ভিতরে ব্যবহারতঃ কোনও দোষ আবিষ্কার করা যায় না। মনোভাবের দিক্ থেকেও এ চুম্বন সর্ব্বপ্রকার দোষ-বর্জ্জিত। ফ্রয়েড-পন্থী যদি না হই, তা হ'লে এ চুম্বনের ভিতরে দোষ দর্শন করা অসঙ্গত। কিন্তু যে চুম্বনগুলি শিশুটীর গালে পড়্‌ছে, তা কি তার মনের

উপরে ছাপ ফেল্‌ছে না? শিশুকে শিশু ব'লে মনে করা ভুল। ঐ ক্ষুদ্র শিশুটীর মনটী একটী বয়স্ক ব্যক্তির মনের চাইতে কম চতুর নয়। এই বয়সে সে যা দেখ্‌ছে, যা বুঝ্‌ছে, সব তার চিরকালের পুঁজি হয়ে মনের অন্তরালে গোপন হ'য়ে থাক্‌ছে এবং এই পুঁজির প্রেরণাই অজ্ঞাতসারে তার সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনকে ঠেলে নিয়ে যাবে। মনস্তাত্ত্বিকেরা প্রমাণ করেছেন যে, যদিও চার বৎসর বয়সের পূর্ব্বের ঘটনা মানুষের স্মরণে থাকে না, তবু দেড় বছর বয়সের সময়ের ঘটনার প্রভাব আমৃত্যু তার অবচেতন মনের উপরে থেকে যায়।

ভারতীয় সমাজে চুম্বনের ক্রম-বিবৃদ্ধি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—পনের বিশ বছর আগে শিশুদের নিয়ে বাড়াবাড়ি ক'রে চুমো খাওয়ার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিনি, আমাদের বাল্যকালে আমরা আমাদের ছোট ভাইবোন্‌কে কোলে নিয়ে বেড়িয়েছি, আদর করেছি, কিন্তু খুব বেশী চুমো খেয়েছি ব'লে মনেই পড়ে না। কিন্তু আজকালকার ব্যাপারে গুরুতর পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্ছে। আজকাল মা, মাসী, পিসী, খুড়ী, জ্যেঠী, ভাই, বোন, প্রতিবেশিনী, পরিচিতা, অপরিচিতা সবাই মিলে এক একটা শিশুকে যে ভাবে চুম্বনের পর চুম্বনে বিরক্ত কচ্ছে, তাতে এরূপ মনে করা সঙ্গত যে, সমাজের সর্ব্বস্তরে কামভাব অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এরূপ সন্দেহ করার কারণ হয়েছে যে, অনেক সময়ে, শিশুকে চুম্বন করাটা হচ্ছে, transferred epithet অর্থাৎ উদোর পিণ্ডি, বুধোর ঘাড়ে। চুম্বনের লক্ষ্যবস্তু অন্যত্র, শিশুটী মাত্র উপলক্ষ্য।

যুবক-যুবতীর উপরে শিশু-চুম্বনের প্রভাব

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—শিশুদের গালে চুমো খেতে খেতে অনূঢ়া যুবক-যুবতী-গুলি নিজেদের মধ্যে অবাধ চুম্বন-বিনিময়কে একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত ক'রে ফেল্‌ছে। কামভাব-বর্জ্জিত এক প্রকারের চুম্বন তারা আবিষ্কার করেছে ব'লে মনে কচ্ছে এবং "বন্ধুত্বের চুম্বন" এই ট্রেড মার্ক দিয়ে অবাধে তা' তারা চালাচ্ছে।

নিষ্কাম চুম্বন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু হায়, বয়স্ক দুইটী ছেলে-মেয়ের মধ্যে কামভাব-বর্জ্জিত কোনও চুম্বন কখনো হ'তেই পারে না। স্বামী ও স্ত্রী তাদের প্রেমের গভীরতম অবস্থায় পৌঁছুবার পরে, দৈহিক আনন্দকে ব্রহ্মানন্দে নিয়ে পৌঁছাবার পরে, যদি চুম্বন-বিনিময় করেন, তবে একমাত্র তাই হ'তে পারে কামলেশহীন। এ ছাড়া যত চুম্বন, প্রত্যেকটীর ভিতরে অল্প হউক, বেশী হউক, কাম থাক্‌বেই। চুম্বনে যে ব্যাপারের মাত্র সূচনা, সম্পূর্ণ দৈহিক মিলনে সেই ব্যাপারেরই হয় পূর্ণতা। কামের ক্ষুধা আর কামের চরিতার্থতা, এই দুইটী ব্যাপারের মধ্যবর্ত্তী অবস্থার নামই চুম্বন।

আজিকার চুম্বিত শিশু কালিকার চুম্বয়িতা যুবক-যুবতী

পরিশেষে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আজিকার চুম্বিত শিশুই বড় হ'য়ে কাল্‌কে চুম্বয়িতা যুবক বা চুম্বয়িত্রী যুবতীতে পরিণত হবে। এই শিশু আজ শত শত চুম্বনের সাথে যে মনঃ-সংস্কার গঠন কচ্ছে, কাল বড় হ'য়ে সেই সংস্কার তার আচরণে মূর্ত্তিমান হ'য়ে তাকে চুম্বন-লোভ-তাড়িত ক'রে সমাজের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করাবে। তখন এই শিশুর দৌরাত্ম্যে হয়ত সমাজে বাস করা যাবে না।

যুবক-বন্ধু স্বরূপানন্দ

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবা লাকসাম হাইস্কুলে গমন করিলেন। পূর্ব্বদিনের ন্যায় খেলার-মাঠের মন্দিরটীকেই শ্রীশ্রীবাবার অবস্থানের ব্যবস্থা ছিল। শ্রীশ্রীবাবা শুভাগমন করিতেই পরমশ্রদ্ধেয় সুরেশবাবু বিভিন্ন শ্রেণী হইতে একটী একটী করিয়া ছাত্রকে শ্রীশ্রীবাবার নিকট ব্যক্তিগতভাবে যার যার প্রয়োজনীয় বিষয় জানিয়া লইবার জন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অন্য বোধ হয় চল্লিশটীর উপর ছাত্র একান্তে শ্রীশ্রীবাবার চরণদর্শন করিবার সুযোগ পাইল। স্কুলে বক্তৃতা দিবার দিন শ্রীশ্রীবাবা বর্ত্তমানকালীন যুবকদের নৈতিক অধঃপতনের কারণ ও তাহার প্রতীকার সম্বন্ধে এমন মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন যে, ছাত্র-সমাজের ভিতরে যেন একটা অভাবনীয় সরলতা ও বিশ্বাস-পরায়ণতার

সৃষ্টি হইয়াছে। যে আসিয়া শ্রীশ্রীবাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছে, সেই তার জীবনের ঘটনাবলি নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে নিজের গরজে যেন প্রাণপ্রিয় বন্ধুর নিকট বর্ণনা করিয়া যাইতেছে। কুণ্ঠা নাই, দ্বিধা নাই, লজ্জা নাই। বলাই বাহুল্য, বাঙ্গলার যেখানে শ্রীশ্রীবাবা গিয়াছেন এবং অন্ততঃ একটী বক্তৃতা দিয়াছেন, জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সেখানকার যুবকদের হৃদয়ের কবাট খুলিয়া গিয়াছে। কত যে নিগূঢ় সমস্যার সমাধান তাহারা সংগ্রহ করিয়াছে, সে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার আমাদের ক্ষমতা থাকিলে বা সে উপাদান সমূহ সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে পারিলে এই গ্রন্থ হয়ত লক্ষাধিক পৃষ্ঠাকে অতিক্রম করিত।

সন্ন্যাসীর যৌন-তত্ত্বালোচনা

সম্ভ্রান্ত ঘরের একটী মুসলমান যুবক নিজের ব্যক্তিগত জীবনের আংশিক পরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্বামীজী, আপনি ত্যাগী সন্ন্যাসী, আপনি কি আমার জটিল সমস্যাগুলি বুঝিতে পারিবেন?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—হাঁ বাবা পারব, তুমি নির্ভয়ে ব'লে যাও। সত্য বটে আমি সন্ন্যাসী, বিবাহও করি নাই, স্ত্রীসঙ্গও করি নাই, কিন্তু বাবা আমাকে জীবন ভ'রে অসংখ্য স্ত্রীসঙ্গীর জীবন-কথা শুন্‌তে হয়েছে। সন্ন্যাসীর পক্ষে যৌন-তত্ত্বালোচনা দোষের। কিন্তু দেশ ও জগতের সেবার যে ধারা আমাকে বেছে নিতে হয়েছে, তাতে আলোচনা না ক'রে উপায় ছিল না। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আমাকে অসংখ্য অনাচারীর কদাচার-কাহিনী শুন্‌তে হয়েছে এবং বাধ্য হ'য়ে আমাকে যৌন-তত্ত্বের ভূরিভূরি পুস্তক পাঠ কর্ত্তে হয়েছে। মেডিকেল স্কুলের শব-ব্যবচ্ছাদাগারে গিয়ে মৃতদেহ দেখ্‌তে হয়েছে। তারপরে বাকীটা ঈশ্বর-ধ্যানের মধ্য দিয়ে ভগবদনুগ্রহে বুঝ্‌তে হয়েছে। শঙ্করাচার্য্যের কথা শুনেছ ত? আচার্য্য শঙ্করকে এক সময়ে এক মৃত রাজার দেহে প্রবেশ ক'রে রাজ-মহিষীদের কাছ থেকে কামশাস্ত্র শিক্ষা ক'রে আস্‌তে হয়েছিল ব'লে একটা গল্প আছে। আমাকেও অপরের অভিজ্ঞতার ভিতরে প্রবেশ ক'রে সব জান্‌তে হয়েছে। জীব-কল্যাণের দায়ে আমাকে ঘৃণাজনক

বিষয়ও আলোচনা কত্তে হয়েছে, শুশ্রূষাকারী যেমন ক'রে কলেরা রোগীর মলমূত্র ঘাঁটেন।

অতীতের উপদেশকে মনে রাখ

অতঃপর যুবকটি তার জীবনের অতি গোপনীয় এবং লোমহর্ষজনক ঘটনাবলী অনুতপ্ত চিত্তে কিন্তু সরলভাবে বর্ণনা করিলেন।

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অতীত ঘটনাকে সব সময়েই বাবা মনে ক'রে ব'সে থাকৃতে নেই। অনেক অতীতকে ভুলে গেলেই বরং লাভ, অতীত বিষয়কে মাত্র ততটুকুই স্মরণ রাখ, যতটুকু স্মরণ রাখ্‌লে তোমার বর্ত্তমান জীবন গঠনের পক্ষে সাহায্য হবে, সতর্কতা বাড়্‌বে। কি কারণে তুমি পাপ-পথে পদার্পণ কত্তে বাধ্য হয়েছিলে, সেইটিই স্মরণ রাখ এবং এরূপ কারণ-নিচয়ের অধীন তোমাকে আর কখনও না হ'তে হয়, তার দিকে লক্ষ্য রাখ। কিন্তু কি কি কদর্য্য কাজ তুমি করেছ, কার সঙ্গে মিশে করেছ, কতবার করেছ, কোথায় করেছ, কখন কখন করেছ, কিভাবে করেছ, সে সব স্মৃতিকে মনের গায়ে জড়িয়ে রেখে মনকে ভারগ্রস্ত ও দুর্ব্বল করার কোনও প্রয়োজন নেই। মনে কর একজনের কলেরা হয়েছে, দারুণ ভেদবমি চলেছে, কত লোক শুশ্রূষা কল্ল, কত ডাক্তার এসে দেখ্‌ল, কত মাত্রা ঔষধ খাওয়াল, কত পাত্র বমিত বস্তু বা মল ফেল্‌তে হল, এ সব কি আর মনে ক'রে রাখ্‌বার দরকার আছে? এইটুকুই মাত্র মনে রাখা দরকার যে, হাত না ধুয়ে, মুখ না ধুয়ে, যা' তা' জিনিষ খেলে, যেখানে সেখানে রোগীর মলমূত্রযুক্ত কাপড়-চোপড় ধু'লে, রোগীর কাছে অসাবধানে থাকৃলে কলেরা হয়। যুবকদের পক্ষে যেরূপ সাবধান থাকা দরকার, স্ত্রীলোক সম্পর্কে তা তুমি থাকনি। এর ফলে তোমাকে ঘোরতর নৈতিক দুর্গতিতে পতিত হ'তে হয়েছে। ব্যস্, মনে রাখ যে, এর পর থেকে সাবধান তোমাকে হতে হবে বাবা।

ব্যর্থ অতীতের ভিত্তিতে সার্থক ভবিষ্যৎ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অতীতে তুমি অনেক ব্যর্থতা আহরণ করেছ, ভুল-ভ্রান্তিতে জীবনের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করেছ, কিন্তু তাতেও কিছু যায়

আসে না, যদি তুমি অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে পথ চল। ব্যর্থ অতীতের ভিত্তিতে সার্থক ভবিষ্যৎ গড়া যায়। ভ্রান্তি থেকে যে শিক্ষা আহরণ করেছ, তা ভুলো না। হতাশও হয়ো না। দেখ্‌বে, গত জীবনের দু'-দশবারের ভুল তোমার ভবিষ্যৎ জীবনকে সহস্র সহস্র ভুল থেকে রক্ষা ক'রে দিয়েছে। অপব্যয়িত অতীতের মৃত কঙ্কালের উপরে তুমি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সদ্‌ব্যয়িত ভবিষ্যৎকে প্রতিষ্ঠিত কর।

অতীতের অনুসরণ-প্রবৃত্তি

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—অতীতের পাপ অতীতের পুণ্য বর্ত্তমানকে ও ভবিষ্যৎকে অনুসরণ কর্ত্তে চেষ্টা করে। একথা সত্য। কিন্তু অতীত কার্য্যাবলি যতই তোমার উন্নতির বিরুদ্ধ হউক, তার অভিজ্ঞতাগুলিকে কাজে লাগানো তোমারই ইচ্ছাধীন। লাগালেই সেগুলি কাজে লাগ্‌তে পারে। ভুল-ভ্রান্তি ক'রে এখন ত তুমি স্পষ্ট বুঝ্‌তে পাচ্ছ, পতনের পথ প্রশস্ত হয় কি ভাবে, পিচ্ছিল হয় কি ভাবে, প্রলোভন এসে সাম্‌নে দাঁড়ায় কি ভাবে, জঘন্য পাপ স্নেহ, মায়া, সেবা, প্রীতি, প্রশংসা, সমাদর প্রভৃতির ছদ্মবেশ প'রে হাসিমুখে কি ভাবে ছলনা ক'রে বুকে শাণিত ছুরিকা বিদ্ধ করে। অতীতের শত ভ্রান্তির ক্ষতিপূরণ হ'য়ে যাবে, যদি তার শিক্ষাকে না বিস্মৃত হও।

ভ্রমহীন কে ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ভ্রম কে না করে ? তুমি যে ভুলগুলি করেছ, ঠিক্ এই ভুলই হয় ত না কর্ত্তে পারে, কিন্তু দুটী-চারটী মারাত্মক ভুল জগতের প্রায় সকলকেই কর্ত্তে হয়েছে। কবর দিয়ে রাখা হয়েছে যাকে, ভুল কর্‌বে না সে। কলকাতার যাদুঘরে একজন মিশরীর চার হাজার বছরের পুরোনো মৃত দেহটা প'ড়ে আছে, 'ভুল করবে না সে। ভুল কর্‌বে না ইট, কাঠ, পাথরে, আর ভুল কর্‌বেন না ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষে। সুতরাং তোমার জীবনে ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে ব'লে একেবারে হাত-পা গুটিয়ে বসার কোনো আবশ্যকতা নেই। ভুল মানুষে কর্ত্তে পারে, কিন্তু মূর্খ ছাড়া আর কোন্ ব্যক্তি ভুলকে দেখেও আত্ম-সংশোধনের চেষ্টা কর্ব্বে না ? তুমি মূর্খ নও !

প্রকৃত অনুতাপ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কাল্‌কে আমার বক্তৃতা শুনে তোমার যে অনুতাপ এসেছে, এতে আমি আহ্লাদিত। আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। কিন্তু আমি চাই, তুমি আরো অনুতপ্ত হও। এত অনুতাপ তোমার হোক্, যেন তার তাপে তোমার হৃদয়গত আরও শত শত অন্যায় লালসা ডালে-মূলে দগ্ধ হ'য়ে যায়। এত অনুতপ্ত হও, যেন বিপথে আর চল্‌বার তোমার রুচি না হয়, শক্তি না থাকে। দুদিন থে'মে থে'কে যদি আবার তুমি এই পথেই চল, তবে আমি বল্‌ব না যে তোমার প্রকৃতই অনুতাপ এসেছে। এই পাপ-পথে আর ফিরে না যাওয়াই হবে সত্যিকারের অনুতাপের পরিচয়। তোমার বর্ত্তমান অন্তর্দ্দাহ যদি প্রবল কর্ম্মে রূপান্তরিত হয় এবং তোমার জীবনকে পূর্ব্ব পথের বিপরীত দিকে উল্কাবেগে পরিচালিত ক'রে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়, তবেই আমি বল্‌ব যে, তুমি যথার্থই অনুতপ্ত হয়েছ। নিজেকে সম্পূর্ণ সংশোধন ক'রে তুল্‌তে হয়ত তোমার দীর্ঘকাল লাগ্‌বে, কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী আত্মগঠনের প্রযত্ন দিয়েই তোমাকে প্রমাণিত কত্তে হবে যে, প্রকৃতই তুমি অনুতপ্ত হয়েছিলে।

চরিত্র-রক্ষায় আত্ম-সম্মান-জ্ঞান

উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যে সকল পরিবারে আশ্রিতা ও নিঃসম্পর্কীয়া স্ত্রীলোকদের সংখ্যা অধিক, সেই সকল পরিবারের যুবকদের একটু অতিরিক্ত মাত্রায় আত্ম-সম্মান-জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আত্ম-সম্মান-জ্ঞানই হচ্ছে সকল পাপের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধ। একটী স্ত্রীলোক তোমার পক্ষে সুলভা, তার জন্যেই তুমি তার পাপ-প্রস্তাবে রাজি হবে? এতে তোমার আত্ম-সম্মান-জ্ঞানের পরিচয় হবে না। একটী স্ত্রীলোক তোমার সঙ্গে খুব মিশ্‌ছে। এতেই তুমি মনে ক'রে বস্‌বে যে, তোমার প্রতি তার পাপাভিলাষ আছে? না, এতেও তোমার আত্ম-সম্মান-জ্ঞানের পরিচয় হবে না। যার আত্ম-সম্মান-জ্ঞান আছে, সে কখনো অপরকে সহজে কুচরিত্র বা পাপাভিলাষী ব'লে মনে করে না। একটী স্ত্রীলোককে সহজেই তুমি বাধ্য কত্তে পার। সে সুযোগ-

সুবিধাগুলি তোমার হাতে রয়েছে। তারই জন্যে তুমি তার নিকটে অসদভিপ্রায় ব্যক্ত কর্ব্বে ? না, তা তুমি কত্তে পার না, কারণ এতে আত্ম-সম্মান-জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করা হবে না। আত্ম-সম্মান-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি নিজের চরিত্রের দুর্ব্বলতার বিষয় নিতান্ত লালসায় প'ড়েও কাউকে জ্ঞাপন করে না, প্রাণপণে আত্ম-দমনই করে। আত্ম-সম্মান-জ্ঞান যার আছে, সে কোনো স্ত্রীলোক নিকটে আছে জেনেও না-জানার ভাণ দেখিয়ে বসন-ভূষণ অসম্বৃত ভাবে রাখ্‌তে পারে না বা কোনও অভদ্র ইঙ্গিত কত্তে পারে না। এই জিনিষটী তোমার ভিতরে ছিল না ব'লেই তুমি এত দুর্ভোগ ভুগেছে। কিন্তু আত্ম-সম্মান-বোধ যার আছে, সে একবার দু'বার ভ্রান্ত পথে ঝোঁকের বশে চ'লে গেলেও অতিক্রুত নিজেকে সাম্‌লে নেয় এবং জীবনে আর ফিরে ঐ অন্যায় কাজ করে না।

যুবকটী শ্রীশ্রীবাবার সহানুভূতিপূর্ণ অপূর্ব্ব উপদেশাবলি শ্রবণে কৃতজ্ঞতায় ভুলুণ্ঠিত হইল।

স্ত্রীসঙ্গের বৈধতা ও অবৈধতা

অপর একটী যুবক নিজ অবস্থা জ্ঞাপন করিলে পরে শ্রীশ্রীবাবা তাহাকে বলিলেন,—এমন ভয় তুমি ক'রো না যে, আমি ব'লে বস্‌ব,—স্ত্রীসঙ্গ মাত্রেই পাপ। স্থল-বিশেষে ও ব্যক্তি-বিশেষে উহা পাপ ও অধর্ম্ম, স্থল-বিশেষে ও ব্যক্তি-বিশেষে উহা অনুচিত ও অসঙ্গত, স্থল-বিশেষে ও ব্যক্তি-বিশেষে উহা বৈধ ও সঙ্গত। সন্ন্যাসব্রতী সাধকের পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ মাত্রেই পাপ। অবিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ মাত্রেই পাপ। বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে পর-স্ত্রীতে অর্থাৎ নিজ পত্নী ব্যতীত অপর স্ত্রীতে অভিগমন মাত্রেই পাপ। নিজ-স্ত্রীর সংসর্গও বিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে তখন করা অনুচিত, যখন স্ত্রী রুগ্না, গর্ভবতী, অনিচ্ছুকা বা অপরিণত-বয়স্কা। পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীন প্রীতি, সহযোগিতা ও অঙ্গাঙ্গিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কিম্বা জগৎ-কল্যাণকারী পুত্র-কন্যার জননের জন্য স্ত্রীসঙ্গ পাপ ত নয়ই, অনুচিত ত নয়ই, বরঞ্চ পুণ্যজনক এবং ধর্ম্মপ্রদ। স্থল-বিশেষে স্ত্রীসঙ্গ পুণ্য-কার্য্য ব'লেই কপিল, কণাদ, অগস্ত্য, রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, নানক, চৈতন্য প্রভৃতির আবির্ভাব জগতে সম্ভব হয়েছে। সুতরাং তোমার ভয় করার

কোনো কারণ নেই যে, আমি স্ত্রীসঙ্গ মাত্রকেই মহাপাপ ব'লে বর্ণনা ক'রে বস্‌ব।

অবৈধ স্ত্রীসঙ্গেচ্ছার উদ্দীপ্তিতে কর্ত্তব্য আত্ম-শাসন

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—স্ত্রীসঙ্গ করায় সুখ আছে, অল্প হোক্ বেশী হোক্, সুখ স্ত্রীসঙ্গে আছে ব'লেই জগতের লোক স্ত্রীসঙ্গের জন্য এত লালায়িত। তাই স্ত্রীসঙ্গের সুখটাকে একটা লাভ ব'লে গণনা কর্‌লেও করা যেতে পারে। কিন্তু বিবাহ না ক'রে কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা পাপ। কিন্তু তেমন পাপাকাঙ্ক্ষাই যদি তোমার মনে কখনো জাগে, তবে তখন তোমার পক্ষে অবলম্বনীয় পন্থা হবে, প্রাণপণে আত্ম-শাসন। প্রাণপণে আত্ম-শাসন ছাড়া আর দ্বিতীয় পন্থা নেই। সংযমের বল বৃদ্ধির জন্য অবিরাম ভগবানের নিকট প্রার্থনা, অবিরাম তাঁর পবিত্র নাম স্মরণ, অবিরাম জিতেন্দ্রিয় প্রলোভন-জয়ী মহাপুরুষদের চরিত্রালোচনা, অবিরাম সৎসঙ্গ, অবিরাম নিজ জীবনের উন্নত ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি-সঞ্চালন, এ সবের সাহায্যে প্রাণপণে আত্ম-শাসন কত্তে হবে। স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সা মনে এলে জগতের সকলেরই পক্ষে এই হবে শ্রেষ্ঠ সদুপায়।

অবিবাহিতের স্ত্রীসঙ্গে দ্বিবিধ পাপ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—তুমি অবিবাহিত, তোমার পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ হবে পাপ। কারণ তা দ্বারা তুমি নিজেকে কলুষিত কর্ব্বে। কিন্তু স্ত্রীসঙ্গ করা তোমার পক্ষে আর এক কারণেও পাপ হবে, পাপ নয় শুধু, মহাপাপ হবে, কারণ এ দ্বারা তুমি আর এক জনকে কলুষিত কচ্ছ। তুমি যখন অবিবাহিত, তখন স্ত্রীসঙ্গ কত্তে হলেই তোমাকে হয় কুমারী, নয় অন্য কারো পত্নীকে কলুষিত কত্তে হবে।

উপযাচিকার আকাঙ্ক্ষা পূরণেও পাপ হয়

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সেই স্ত্রীলোকটী যদি স্বেচ্ছায়ও তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ কত্তে রাজি হয়, তবু তুমি পাপ থেকে মুক্তি পাচ্ছ না, কারণ, তুমি যে তাকে কলুষিত হবার সাহায্য কচ্ছ। কেউ কলুষিত হতে চাইলেই তাকে

তুমি কলুষিত কত্তে অধিকারী হও না। একজন কেউ তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে বল্লেই কি তুমি তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে পার? পার না। একজন কেউ তার গাভীগুলিকে হত্যা কত্তে বল্লেই কি তুমি তা পার? পার না। একজন কেউ তার দেবালয়ে মলমূত্র ত্যাগ কত্তে বল্লেই কি তুমি তা কত্তে, পার? নিশ্চয়ই পার না। সে নিজেও যদি এসব কাজ কত্তে যায়, তুমি তাকে কোনো প্রকারে সহযোগিতা দিতে পার না. সে অধিকার তোমার নেই। বরং তুমি যদি তার নিজ দেবমন্দির অপবিত্রী-করণে, নিজের গোহত্যায় বা নিজগৃহে অগ্নি-সংযোগে বিরত কর, তবেই মানুষ হিসাবে তোমার কর্ত্তব করা হবে।

কুমারীদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি রাখার আবশ্যকতা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—এ যুক্তি আজকাল ছেলেরা দিতে লজ্জা বোধ করে না যে, সে যার সঙ্গে প্রণয় কচ্ছে, সে সধবাও নয়, বিধবাও নয়, অর্থাৎ পরস্ত্রী নয়, সে কুমারী। অতএব তার সঙ্গে প্রণয়ে দোষ কি? ভবিষ্যতে তাকে ত' বিবাহই করা যেতে পারে! এর মত একটা অন্তঃসারশূন্য যুক্তিই কিছু হ'তে পারে না। তোমার কাছে যে গোপনে সতীত্ব দিয়ে দিতে পার্‌ল, কার্য্যকালে মন্ত্র প'ড়ে তাকে বিয়ে কত্তে তুমিই কুণ্ঠিত হবে, তুমিই অস্বীকৃত হবে। লক্ষ লক্ষ স্থলে ছেলেরা এই রকম হয়। এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। পাতিত্যের পথে টেনে আন্‌বার কালে ছেলেগুলি যে মেয়েটীকে প্রাণের প্রাণ ব'লে স্বীকার করে, পাতিত্যটা সম্পূর্ণরূপে পাকা হ'য়ে গেলে, অন্তর দিয়ে তাকে ঘৃণাই করে, বাইরে আদর যতই প্রদর্শন করুক। তখন ছেলেরা মনে মনে ভাবে,—"আমার কাছে যে অত সহজে নিজেকে বিকিয়ে দিল, সে যে গোপনে আরও দুই একজনের কাছে নিজেকে ছেড়ে দেয়নি বা ভবিষ্যতে সে যে গোপনে আর কারো সাথে প্রণয় কর্ব্বে না, তার স্থিরতা কি?" আর এই যে ছেলেরা কুমারী মেয়েদের নিয়ে প্রণয়-খেলা কচ্ছে, তারা যখন বিবাহ করে, তখন ভাগ্যক্রমে পূতচরিত্রা প্রকৃত-কৌমার্য্য-সম্পন্না মেয়েরাও যদি তাদের স্ত্রী হ'য়ে আসে, তবু তারা অনাঘ্রাত কুসুমটীকে

কীটদষ্ট ব'লে সন্দেহ করে, সাধ্বী পত্নীকে গুপ্তপাপা বা পূর্ব্বপ্রণষ্টা ব'লে কল্পনা ক'রে পারিবারিক জীবনের আনন্দকে ধ্বংস করে। যে সমাজে স্বামি-স্ত্রীর পারিবারিক জীবনের সহজ বিশ্বস্ততার আনন্দ নষ্ট হয়েছে, সে সমাজ ত' পচা, গলা, পশু-মাংসের মত দুর্গন্ধের আর বিষাক্ত বাষ্পেরই আধার হয়। তাই তোমাদের ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবনের শান্তি বজায় রাখ্‌বার জন্যও প্রত্যেক কুমারীর প্রতি এমন শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, যেন কুমারী কন্যাকে বিবাহ ক'রে তাকে প্রকৃত কুমারী ব'লে মনে কত্তেই তোমার রুচি জন্মে এবং এজন্য তাকে পূর্ণ স্নেহ প্রদান কত্তে পার।

কুমারীদিগকে রক্ষা কর

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একটী কুমারীর উপরে তুমি হাত দিয়েছ, ব্যস্, আর কারো উপরে লোলুপ-দৃষ্টি নিয়ে চেও না। একটী কুমারীর উপরে হাত দিয়েছ, এখন সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, সেই মেয়েটীর প্রতি তোমার সকল পাপ-ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ক'রে। প্রায়শ্চিত্ত কর, তাকে চরিত্র-সংশোধনের সুযোগ দিয়ে। অন্যভাবে তাকে সুযোগ দিতে না পার, অন্ততঃ তুমি যদি বাক্যে, ব্যবহারে ও অবস্থিতিতে তার কাছ থেকে দূরে স'রে যেতে পার, তাতেও তোমার সম্পর্কে তার পাতিত্যের সকল সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। একটীর উপরে অনুষ্ঠিত পাপের তৃতীয় প্রায়শ্চিত্ত হবে, দশটী কুমারীকে এরূপ অনাচার থেকে রক্ষা ক'রে। নিজে গিয়ে তুমি তাদের সঙ্গে মিশ্‌তে পার না। দু'মাস পরেই পূজোর ছুটী। ছুটীতে বাড়ী যাও, বাড়ী গিয়ে তোমার সহোদরা ভগ্নীকে আগে শিক্ষা দাও, কৌমার্য্য কি, কৌমার্য্যের মহিমা কি, কৌমার্য্য-রক্ষার লক্ষ্য কি, কৌমার্য্য-রক্ষার উপায় কি। শিক্ষা দাও, কেমন ক'রে কুমারীরা লুব্ধ-ব্যাধের হাতে পড়ে, কোন্ কোন্ কৌশলের মধ্য দিয়ে ব্যাধের জালে জড়ায়, কি ভাবে তা' থেকে আত্মরক্ষা কত্তে পারে, জগতে কোন্ কোন্ নারী নিজের সতীত্ব-মর্য্যাদা রাখ্‌বার জন্য কি ক'রেছিলেন। শিক্ষা দাও, প্রলোভন থেকে কি ক'রে দূরে স'রে থাক্‌তে হয়, কি ক'রে প্রলোভনকারীকে শাসন কত্তে হয়, উপেক্ষা কত্তে হয়, সন্ত্রস্ত কত্তে হয়, প্রলোভন-জয়ে আনন্দ কি,

তৃপ্তি কি, আত্ম-প্রসাদ কি। তুমি যেমন অপর একজনের কুমারী ভগ্নীকে বিপথে নিয়ে তার সর্ব্বনাশ করেছ, আর একজন হয়ত ঠিক সেই কাজটী তোমার অগোচরে অতি গোপনে ঠিক্ তোমার ভগ্নী সম্বন্ধে কচ্ছে। কাল-বিলম্ব না ক'রে আগে তোমার নিজের ভগ্নীকে সেই বিপদ-সম্ভাবনা থেকে বাঁচাও। তার পরে তাকে উৎসাহ দাও, অপরাপর কুমারীদের রক্ষা কর্‌বার জন্য।

লাকসাম

১৪ শ্রাবণ, ১৩৩৮

ধর্ম্মের জন্য পত্নী ত্যাগ

এখানকার একটি উৎসাহী যুবক, যিনি পরবর্ত্তীকালে শ্রীশ্রীবাবার ধর্ম্মসঙ্ঘ-মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন,—ধর্ম্মের জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করা যায় কি না।

শ্রীশ্রীবাবা জানিতেন না যে, প্রশ্নকর্ত্তা নিজে বিবাহিত এবং বাল্য বয়সেই তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীবাবা উত্তর করিলেন,—যায়, যদি স্ত্রী ধর্ম্ম-দ্রোহিণী হয় এবং শত চেষ্টাতেও তাহাকে ধর্ম্মপথে না আনা যায়। কিন্তু স্বামীর চেষ্টার মধ্যে কোনও ক্রটী থাক্‌লে চল্‌বে না। শতবার ব্যর্থকাম হ'য়েও তাকে সেই চেষ্টায় সফলতা অর্জ্জনের জন্য প্রাণপাত কত্তে হবে। *

মন্ত্র ও মন্ত্রণা

মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা ফেণী রওনা হইলেন এবং ট্রেণে একজন "শিক্ষার গোঁসাই"র সহিত দেখা হইল। তিনি কোনও শিষ্যগৃহে চলিয়াছেন।

গোঁসাইজী জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি দীক্ষামন্ত্র দেন না শিক্ষামন্ত্র দেন?

শ্রীশ্রীবাবা হাসিয়া বলিলেন,—আমি মন্ত্রণা দেই।

গোঁসাইজী।—মানে?

শ্রীশ্রীবাবা।—মানে এই যে, আমি সবাইকে বলি, তোমার ভিতরেই ব্রহ্মের স্বরূপ লুক্কায়িত রয়েছে, বাইরে খুঁজ্‌তে হবে না, কারো সাহায্যের

* পরবর্ত্তীকালে এই উদ্যমশীল ধাম্মিক যুবক তাঁর পত্নীকে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মপথের সঙ্গিনী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দরকার নেই, কাতর-প্রাণে ব্যাকুল চিত্তে তোমার প্রিয় নাম ধ'রে তাঁকে অবিরাম ডাকো, ভক্ত-বৎসল ভগবান আপনি প্রকাশিত হবেন, দীক্ষা-মন্ত্রের দরকার নেই, শিক্ষা-মন্ত্রের দরকার নেই, কারো দাসত্ব স্বীকারের দরকার নেই, অনুক্ষণ নিজেকে ভগবানের দাস ব'লে জানো, আর কাতরভাবে তাঁর একটী মাত্র নাম ধ'রে ডাকো, দশটী নয়, বিশটী নয়, পঞ্চাশটী নয়।

গোঁসাই মহাশয় বড় প্রীত হইলেন না।

সকল মত ও পথের ভিত্তি হউক ব্রহ্মচর্য্য

গোঁসাই মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা কোন্ মতের প্রচার করেন?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—সব মতেরই প্রচার করি। কৃষ্ণও ভাল, কালীও ভাল, দুর্গাও ভাল, শিবও ভাল, আল্লাও ভাল, ব্রহ্মও ভাল। কিন্তু যে-ই যাকে উপাসনা কর, ইন্দ্রিয়কে সংযত ক'রে, বৃথা বীর্য্যক্ষয়কে দমিত ক'রে, স্ত্রীজাতির প্রতি মাতৃভাব নিয়ে।

ফেণী

১৫ শ্রাবণ, ১৩৩৮

কিরূপ প্রশংসাকারী বন্ধু নহে

গতকল্য অপরাহ্নে শ্রীশ্রীবাবা ফেণী আসিয়াছেন। একটী সুশ্রী বালক আসিয়া দেখা করিল। শ্রীশ্রীবাবা তাহার সহিত আলাপ-প্রসঙ্গে বলিলেন,—তুমি সুরূপ, তোমার সৌন্দর্য্য মনোহর, এসব ব'লে যদি কেউ তোমার প্রশংসা করে, জান্‌বে সে তোমার বন্ধু নয়। তুমি সত্যবাদী, তুমি জিতেন্দ্রিয়, তুমি সৎসাহসী ব'লে যদি কেউ তোমার প্রশংসা করে, জান্‌বে, সে তোমার বন্ধু।

ফেণী

১৬ শ্রাবণ, ১৩৩৮

সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে ঈশ্বর-নির্ভরই কর্ত্তব্য

ফেণী কলেজের কতিপয় ছাত্র শ্রীশ্রীবাবার চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। "সত্য ও মিথ্যা" সম্বন্ধে কথা উঠিল। শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মানুষের চিন্তায়

ও আচরণে সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব যেখানে উপস্থিত হয়, সেখানে নিজ বুদ্ধি-বৃত্তির বা নির্দ্ধারণা-শক্তির উপরেই পূর্ণ নির্ভর না ক'রে, সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্ম-সমর্পণ ক'রে তাঁর দেওয়া নির্দ্দেশ নিয়ে চলাই উচিত। কারণ, সত্য-মিথ্যার প্রকৃত নির্ণয় অতি কঠিন কাজ, "কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।"

সত্য-মিথ্যার নির্ণয়-কাঠিন্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—আজ তুমি যাকে সত্য ব'লে মনে কচ্ছ, কাল হয়ত তাই তোমার কাছে মিথ্যা ব'লে প্রতিপন্ন হচ্ছে। প্রতিপদে তুমি এর দৃষ্টান্ত পাচ্ছ। এ অবস্থায় তুমি কি কর্‌বে? যখন যাকে সত্য ব'লে মনে কচ্ছ, তখন তাই তোমার ক'রে যাওয়া সঙ্গত। কিন্তু সত্য-মিথ্যার সকল চরম নির্ণয় হয় যাঁর কাছে, সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের আদেশ জে'নে তবে তুমি তোমার বুদ্ধি অনুযায়ী সত্যকে অনুসরণ কর্ব্বে। দু'দিন পরে যদি দেখ্‌তে পাও যে, তুমি সত্য জেনে মিথ্যাকেই প্রশ্রয় দিয়েছিলে, তখন আর তোমার অনুতাপ করার কারণ থাকবে না, কারণ, সত্যকেই অনুসরণ করা তোমার অভিপ্রায় ছিল কিন্তু ভগবদ্দত্ত বুদ্ধি তোমার অপরিপক্ক ব'লেই তুমি তখন প্রকৃত সত্যকে ধর্‌তে পারনি,—সে জন্য দোষী তুমি নও।

সত্যই ধর্ম্মজীবনের প্রধানতম আদর্শ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—ধর্ম্ম জীবনের উচ্চতম আদর্শই হ'ল সত্য-রক্ষা। সত্যকে ক্ষুণ্ণ ক'রে যেখানেই যা করা হোক্, পূর্ণাঙ্গ হবে না, হীনাঙ্গ হবে।

সত্য বলা কোন্ স্থলে দোষ?

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু এমন সত্য তুমি বল্‌তে পার না, যাতে পরপীড়া হয়। যেমন, কারো প্রাণে ব্যথা দিবার উদ্দেশ্যে তার যথার্থ দোষ কীর্ত্তন করা। সত্য কথাই বলা হ'ল, কিন্তু তাতে পরপীড়া হ'ল ব'লে এ সত্য পুণ্যজনক নয়, পাপবর্দ্ধক। যেখানে তোমার সত্যকথা বলার ফলে নিরপরাধ ব্যক্তি আততায়ী দস্যুর হস্তে নিহত হ'তে পারে, লম্পটের হস্তে সতী-সাধ্বী ললনার সতীত্ব হানি ঘট্‌তে পারে, সেখানেও যদি তুমি সত্য কথা বল, তাতে তোমার সত্যবাদিতার অভিমানকে বেশ পুষ্ট করা হবে বটে, কিন্তু সত্যের প্রকৃত লক্ষ্য

যে ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হবেন। এরূপ স্থলে আপদ্ধর্ম্ম হিসাবে অসত্য তুমি বল্‌তে পার, এতে পরানিষ্ট-নিবারণের পুণ্য তোমার হবে, কিন্তু মিথ্যা বলার অপরাধে তুমি অপরাধী হবে।

মিথ্যার প্রকার-ভেদ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—মিথ্যা মাত্রেই নিন্দনীয়। কিন্তু তারও প্রকার-ভেদ আছে। যে মিথ্যা তোমার কোনও উপকার কর্ল্লে না, কিন্তু অপরের অপকার কর্ল্লে, সে মিথ্যা অতি জঘন্য, অতি কদর্য্য প্রথম শ্রেণীর মিথ্যা। যে মিথ্যা তোমার অল্প উপকার কর্ল্লে, কিন্তু অপরের গুরুতর অপকারের বিনিময়ে, সে মিথ্যা দ্বিতীয় শ্রেণীর। যে মিথ্যা তোমার প্রভূত উপকার কর্ল্লে, কিন্তু অপরের সামান্য অপকার কর্ল্লে, সে মিথ্যা তৃতীয় শ্রেণীর। যে মিথ্যা তোমার প্রভূত উপকার কর্ল্লে, অপরেরও প্রভূত উপকার কর্ল্লে, তা চতুর্থ শ্রেণীর। এই শ্রেণীর মিথ্যা প্রায় সত্যেরই সামিল। অবশ্য, "অপরের" বল্‌তে বুঝ্‌বে, "সর্ব্ব-সাধারণের"। কিন্তু সত্য হ'তে অনেক দূরেরই হউক বা সত্যের খুব কাছা-কাছিই হউক, মিথ্যামাত্রেই অধর্ম্ম. মিথ্যামাত্রেই গর্হিত।

বিপজ্জনক সত্য

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কিন্তু এমন সত্য আছে, যে সত্য দ্বারা পুণ্যের চেয়ে পাপ বেশী হয়। যে সত্যে পরপীড়া হয় না, কারো অনুচিত অনিষ্ট হয় না, কারো ধর্ম্মনাশ হয় না, সেই সত্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে সত্যে পরপীড়া হয় বা যে সত্যের দরুণ নিজের ধর্ম্মবুদ্ধির নিকটেই নিজেকে অনুতপ্ত হ'তে হয়, সে সত্য সকল সময়ে রক্ষণীয় হ'তে পারে না। অথচ মানুষ আগে থেকেই কখনো গণনা ক'রে রেখে দিতে পারে না যে, ভবিষ্যতে কখন কি অবস্থায় এই দ্বিধা উপস্থিত হবে। অতীতকালে সদ্‌বুদ্ধিতে নিঃস্বার্থ প্রেরণায় যে সকল সৎকাজ ক'রে এসেছ, তারই ফলে হয়ত তোমাকে আজ এমন অবস্থায় উপনীত হ'তে হয়েছে যে, মিথ্যা না বল্‌লে এতকালের তপস্যা এক মুহূর্ত্তে নষ্ট হ'য়ে যাবে। বিচার-বিবেচনার অবসর নেই, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে এখনি একটা উপায় ক'রে ফেল্‌তে হবে। ঠিক্ এমনি সময়ে জগতের অনেক বিখ্যাত

ধর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিকে মিথ্যা বল্‌তে হয়েছে। তোমরা যাকে উপস্থিত-বুদ্ধি ব'লে প্রশংসা কর, অনেক সময়ে তা এই জাতীয় মিথ্যা।

মিথ্যা সর্ব্বাবস্থায়ই প্রায়শ্চিত্ত-সাপেক্ষ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—কেউ যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য, কেউ আত্মরক্ষার জন্য, কেউ সতীত্ব বাঁচাবার জন্য এরূপ স্থলে মিথ্যা কথা বলেন। যুধিষ্ঠির দ্রোণকে অশ্বত্থামার মৃত্যু-সংবাদ দিয়ে একটু চালাকী কর্ল্লেন "নরো বা কুঞ্জরো বা" ব'লে, কিন্তু এর দরুণ তার রথের চাকা, যা মাটির চার আঙ্গুল উপর দিয়ে সব সময়ে যেত, তা তৎক্ষণাৎ মাটিকে স্পর্শ কর্ল্ল এবং পরিণামে তাকে নরক দর্শন পর্য্যন্ত কত্তে হল। যুধিষ্ঠির "ইতি গজ" বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের আদেশে, তবু মিথ্যার পাপ তাকে ছাড়ে নি। মহাভারতের "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" ঘটনাটি তোমাদের প্রয়োজনে মিথ্যা বলার অধিকার-প্রদায়ক নজির নয়, বরঞ্চ এরূপ বিপদে পড়েও কেউ মিথ্যা বল্‌লে যে সেই মিথ্যার প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হয়, তারই নজির। এই দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের শিক্ষা করা উচিত যে, এরূপ বিপদে প'ড়ে যদি কখনো মিথ্যা কথা আমরা বলি, তবে সেই মিথ্যার জন্য উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ কত্তে হবে।

নিজ চরিত্র রক্ষার জন্য মিথ্যা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—একটা ঘটনা শুন্‌বে? একটী যুবক একবার নিজ চরিত্র রক্ষার জন্য নিরুপায় হ'য়ে মিথ্যা কথা বলেছিল। ঘটনাটা শুন্‌লে তোমাদের মনে হবে, এরূপ মিথ্যায় দোষ নেই। আমি বল্‌ব, দোষ আছে, তবে অন্য মিথ্যার চেয়ে এতে দোষ কম। সব সত্যেরই যেমন গুণ সমান নয়, সব মিথ্যারও তেমন দোষ সমান নয়। যুধিষ্ঠির যুদ্ধ জয়ের জন্য মিথ্যা বলেছিলেন, আর আমার কাহিনীর নায়ক, হিতলাল, চরিত্র-রক্ষার জন্য মিথ্যা বলেছিল। এস্থলে যুধিষ্ঠিরের চেয়েও হিতলালের পাপ কম হয়েছে। কিন্তু অল্প হ'লেও হয়েছে ত? সেই অল্প পাপটুকুর জন্য হিতলালকে নিশ্চয়ই প্রায়শ্চিত্ত কত্তে হবে। সাধারণ মিথ্যায় লোকের নরক-বাস হয়, যুধিষ্ঠিরের একটী মাত্র মিথ্যা শুধু নরক-দর্শনেই পর্য্যবসিত হ'ল, হিতলাল যদি জীবনে আর মিথ্যা

না ব'লে থাকে, তবে হয়ত মাত্র দূর থেকে নরকের কলরব শুনেই রেহাই পাবে। তবু মিথ্যা মিথ্যাই, মিথ্যা কখনো সত্যের সম্মান পাবে না। হিতলাল বয়সে তরুণ, একজন সমপাঠীর বাড়ীতে পড়া জান্‌তে গিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকেই দেখ্‌লে ঐ গৃহের গৃহিণী-স্থানীয়া একমাত্র রমণীটী একজন পরপুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্তা। হিতলাল ফিরে এল এবং এই ঘটনা বল্‌বার অযোগ্য ব'লে কাউকে আর বল্‌লেও না। কিন্তু সেই দুষ্টা রমণী মনে মনে ভাব্‌তে লাগল যে, হিতলাল ত' স্বচক্ষে এই কাণ্ডটা দেখে গেল, এখন যদি হিতলালের চরিত্র নষ্ট না করা যায়, তাহ'লে হয়ত হিতলালের মুখে এ পাপ-কাহিনী চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়্‌বে, ফলে পাপাচরণ আর চল্‌বে না, পল্লী ছেড়ে অন্যত্র যেতে হবে। সুতরাং সেই মায়াবিনী সুযোগ খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল। অনেক কাল পর হঠাৎ একদিন হিতলালকে তার সেই সমপাঠীর বাড়ীতে বাধ্য হয়ে যেতে হ'ল,— না গিয়ে উপায় ছিল না। যেমনি হিতলাল সমপাঠীর অন্বেষণে গৃহের ভিতরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মায়াবিনী গৃহান্তর হ'তে ছুটে এসে ঘরের খিল দিল বন্ধ ক'রে। বাড়ীটার ভিতরে আর কোন মানুষ তখন ছিল না। মায়াবিনী হিতলালকে জোর ক'রে ধ'রে নিজের পাপ-বাসনা ব্যক্ত কত্তে লাগ্‌ল। হিতলাল বয়সে তরুণ, মেয়েটা পূর্ণ যুবতী, শারীরিক শক্তিতে তার সঙ্গে পারা কঠিন। তবু হিতলাল বল্লে যে সে এরূপ পাপ-কাজে যোগ দিতে পার্ব্বে না। রমণী বল্লে,— "তা হ'লে এখনি আমি চীৎকার ক'রে পাড়ার লোক জড় কর্ব্ব, আর সবাইকে বল্‌ব যে তুমি আমার সতীত্ব নাশ কত্তে এসেছিলে।" হিতলাল হতভম্ব হ'য়ে পড়্‌ল। হিতলাল বল্লে,—"কি ক'রে এসব কাজ কত্তে হয়, আমি জানি নে।" রমণী বল্লে,—"তোমাকে কিছুই জান্‌তে হবে না, আমিই তোমাকে সব শিখিয়ে দেব, তখনই সব বুঝ্‌তে পার্‌বে,—এস আর দেরী ক'রো না।" হিত-লাল প্রাণপণে রমণীর হাত ছাড়াবার চেষ্টা ক'রেও যখন আর কিছুতেই পেরে উঠ্‌ল না, তখন সে বল্লে,—"বেশ, তুমি যা বল্‌ছ, তাই হোক্। কিন্তু আগে আমাকে একটা সিগারেট খেতে দাও।" মায়াবিনী বল্লে,—"কৈ না, তুমি ত' কখনো সিগারেট খাও না।" হিতলাল বল্লে,—"আগে খেতাম না, এখন

শিখে নিয়েছি।” মেয়েটী তার হাতে একটী সিগারেট ও দিয়াশলাই দিতেই বিছানার এক প্রান্তে ব'সে এদিক ওদিক তাকিয়ে হিতলাল বল্লে,—“মশারিটা খাটিয়ে নাও, নইলে বাইরে থেকে কেউ দেখ্‌বে।” রমণী বল্লে,—“না, বাইরে থেকে দেখা যায় না, আমি জানি, তুমি ভয় পেয়ো না, এস শীগ্‌গির, আর দেরী করো না।” হিতলাল বল্লে,—“দেখা যাক্ আর না যাক্, তুমি মশারি খাটাও, নইলে আমার বড্ড লজ্জা কর্ব্বে।” এবার আর রমণীটী দ্বিরুক্তি না ক'রে মশারি খাটাতে মন দিল। ইতিমধ্যে হিতলাল দেশালাই জ্বালিয়ে মশারিতে আগুন ধরিয়ে দিল। “কল্লে কি, কল্লে কি, সর্ব্বনাশ হ'ল,—” বল্‌তে বল্‌তে মায়াবিনী রাক্ষসী রমণী ছুট্‌ল আগুন নিভাতে, আর এই সুযোগে এক লাফ দিয়ে হিতলাল দুয়ারের খিল খু'লে সোজা দৌড় দিল মাঠের দিকে।—এইরূপ যে মিথ্যা, তা বড় চমৎকার মিথ্যা, এই মিথ্যার পানে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু তবু মিথ্যা মিথ্যাই। হিতলাল ধর্ম্ম বাঁচাবার জন্য মিথ্যা বলেছে সত্য, কিন্তু মিথ্যা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য আবার তপস্যা কত্তে হবে।

নারীর সতীত্ব-রক্ষার জন্য মিথ্যা

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—হিতলালেরই জীবনের আর একটা ঘটনা তোমাদের বলি। সেটা তার আরো তরুণ বয়সের কাহিনী। সেটা নিজ চরিত্র রক্ষার জন্য নয়, একটী মেয়ের সতীত্ব রক্ষার জন্য। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে জয়ী হবার জন্যে মিথ্যাকথা বলার চাইতে স্ত্রীলোকের সতীত্ব-রক্ষার জন্যে মিথ্যাকথা বলায় পাপ কম। তবু পাপ কিছু না কিছু আছেই। যুধিষ্ঠিরের মত পরিপক্ক-বুদ্ধি বর্ষীয়ান্ ব্যক্তির কথিত মিথ্যার চাইতে হিতলালের মতন একটী অপরিণতবুদ্ধি বালকের মিথ্যার গুরুত্ব অনেক কম। তথাপি মিথ্যা মিথ্যাই। একদিন হিতলাল দুপুর বেলা একটা সুপারী বাগানের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখ্‌তে পেল, তার কয়েকজন সমবয়স্ক বন্ধু একটা গোলাপ-জাম গাছে চ'ড়ে গোলাপজাম পাড়ছে। দেখে হিতলালও পেছনে পেছনে গাছে চ'ড়ে বস্‌ল। জাম খেতে খেতে হিতলাল শুন্‌তে পেল যে, বন্ধুরা বলাবলি কচ্ছে, কি

ক'রে জামের লোভ দেখিয়ে ষোড়শী নামে একটী মেয়েকে বাঁশঝাড়ের ভিতরে নিয়ে যাবে এবং একে একে প্রত্যেকে তার সঙ্গে ভাব জমাবে। কথাটা শুনেই হিতলালের মাথায় খুন্ চাপ্‌ল। কিন্তু মনের ভাব গোপন রেখে সে বন্ধুদের বল্লে,—"ওরে, তোরা ওকে ভুলাতে পার্ব্বি না,—ষোড়শী আমাদের ভাড়াটেদের মেয়ে কিনা, আমি বল্লে আমার কথা শুন্‌বে। তোরা সবগুলি জাম আমাকে দে, আর বাঁশঝাড়ে গিয়ে ব'সে থাক্। আমি এদিকে ষোড়শীকে নিয়ে যাচ্ছি।" একথা শুনে সবাই সমস্বরে আনন্দধ্বনি ক'রে উঠ্‌ল এবং বল্ল,—"হঁ্যারে, এই-ই ঠিক ফন্দী হয়েছে।" সকলের কোচড়ের গোলাপ-জাম হিতলালের কোচড়ে গিয়ে জম্‌ল এবং হিতলাল উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে প্রস্থান কর্‌ল। সব ছেলেরা বাঁশঝাড়ে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধর্‌ণা দিতে লাগ্‌ল। কিন্তু কোথায় বা হিতলাল আর কোথায় বা ষোড়শী। কারো টিকিটীর সঙ্গে দেখা নেই। শেষটায় ছেলেরা সব হিতলালের খোঁজে বেরুল এবং গিয়ে দেখ্‌ল, হিতলাল সব গোলাপ-জাম লোককে বিলিয়ে দিয়ে খেলার মাঠে গিয়ে রণ-তাণ্ডবে খেলা কচ্ছে। এই ভাবে লম্পট ছেলেদের লাম্পট্য থেকে একটী মেয়েকে সে রক্ষা কর্‌ল। হিতলালের তৎকালীন বয়স ও বুদ্ধির বিষয় বিবেচনা কত্তে গেলে সে চমৎকার কাজ করেছে। কিন্ত, তথাপি মিথ্যা মিথ্যাই। কোনও মহারাজার রোগ সারবার জন্যে যদি একটা বিষ্ঠার বড়ার দরকার হয়, তাহ'লে তা' ঠেক্‌লে বাঘের ধান খাওয়ার মতন প্রয়োগ কত্তেই হবে, কিন্তু তাই ব'লে বিষ্ঠা কখনও চন্দন হবে না, মল মলই থাক্‌বে।

ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণের দ্বারা সত্যের স্বাভাবিক আত্ম-প্রকাশ

শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—যাঁরা সম্যক্ ঈশ্বরে সমর্পিত, নিজেদের নিজত্ব, বৈশিষ্ট, ব্যক্তিত্বাভিমান যাঁদের ভগবানের পায়ের তলায় উৎসর্গ করা হয়েছে, তাঁদের পক্ষে ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্যমিথ্যা প্রভৃতির বিচার নেই। যা' তাঁরা করেন, তাই ধর্ম্ম হয়, যা তাঁরা বলেন, তাই সত্য হয়। সাধারণ লোকে সত্যকথা বলে, কোন্‌টা সত্য আর কোনটা মিথ্যা সেই বিচার ক'রে তার পরে। আর তাঁরা সত্য কথা বলেন, নিজেদের ঈশ্বরানুপ্রাণিত স্বভাবের ধর্ম্মে। দৈবাৎ

তাঁরা মিছে কথা ব'লে ফেল্লে, পরে দেখা যায় তাঁরাই বলেছেন সত্য, আর লোকে বুঝেছে মিথ্যে। সুতরাং, নিজের ঘাড়ের উপর বিচারের বন্দুক না রে'খে ভগবানের ঘাড়ে ভারার্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত মনে, নিরুদ্বেগ চিত্তে কাজ ক'রে যাওয়াই সঙ্গত। ধর্ম্মাধর্ম্মের নির্ণয় বড় কঠিন। হাইকোর্টের জজ্‌রাও ধর্ম্মকে অধর্ম্ম থেকে পৃথক্ ক'রে দেখ্‌তে জানেন না। অথচ, কত মরার ফাঁসীর দড়ি কেটে দিচ্ছেন তাঁরা; এবং কত জীবিত নিরপরাধের গলায় দড়ি পড়িয়ে দিচ্ছেন। সুতরাং, বুদ্ধিমান যদি হও, তা'হলে ভগবানের নামে ডুবে যাও। তাঁর নামের গুণে নির্দ্দোষ প্রজ্ঞার আবির্ভাব হবে,—যে প্রজ্ঞা বিনা আড়ম্বরে সত্য সিদ্ধান্তকে নিজের কাছে টেনে আনে, এদিক্ ওদিক্ হাতড়ে টেনে আন্‌তে হয় না। যেমন ধর, শিকল বেঁধে জাহাজ থেকে জেঠিতে লোহা-লক্কর নাবানো এক কথা আর চুম্বকের আকর্ষণে জাহাজ থেকে মাল নাবানো আর এক কথা, একটায় দরকার প্রচণ্ড হাঙ্গামা, আর অপরটা একেবারে নির্ব্বিবাদ। কিন্তু লোহা যেন সুলভ,—তাকে চুম্বকে পরিণত কত্তে সাধন চাই।

নাম-জপের গূঢ় উদ্দেশ্য

অপরাহ্ন ছয় ঘটিকার সময়ে ফেণী কালীবাড়ীতে স্থানীয় রাজ-কাছারীর কর্ম্মচারিগণের, চেষ্টায় একটী বক্তৃতার ব্যবস্থা হইল। শ্রীশ্রীবাবা বসিয়া বসিয়াই তাঁর বক্তব্য বিষয় বলিতে লাগিলেন। বক্তব্য বিষয় এতই চিত্তাকর্ষক হইল যে, শেষের দিক্ দিয়া প্রাঙ্গন জনাকীর্ণ হইয়া গেল। প্রায় দুই ঘণ্টার উপরে বক্তৃতা হইল।

উপসংহারের দিক দিয়া শ্রীশ্রীবাবা বলিলেন,—চঞ্চল মন সহস্র জায়গায় ঘুড়ে বেড়াচ্ছে, বেড়াক। তার জন্য চিন্তিত হয়ো না। মন যেখানেই যাক, যত কদর্য্য স্থানেই যাক্, ভগবান্ সব স্থানেই আছেন। মনকে শাসনে আন্‌তে পাচ্ছ না, তাতে হতাশার কি আছে? মন যেখানেই যাক, সেইখানেই ভগবানকে খুঁজে বের কর এবং সেখানেই ভগবানের সঙ্গ কর। মন শুঁড়ির ঘরে গিয়েছে, ফিরাতে পাচ্ছ না, ঐ শুঁড়ির ঘরেই একবার ভগবানকে দেখ্‌তে

চেষ্টা কর, ঐ মদের বোতলেই একবার ভগবানকে দেখ্‌তে চেষ্টা কর, তোমার প্রমত্ত আচরণের ভিতরেই একবার ভগবানের উপস্থিতি লক্ষ্য কর। এইভাবে সর্ব্ব বস্তুতে, সর্ব্ব অবস্থার অভ্যন্তরে যাতে ভগবানকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়, তারই জন্য নাম-জপের প্রবর্ত্তন হয়েছে। অবিরাম তাঁর নাম কর, আর নির্ভয়ে তাঁর চিন্তা কর। যার মন ভালমন্দ কোনো খানেই নিমেষের জন্য বসে না, নাম জপের অভ্যাসে তার মন, ভালতেই হোক্ আর মন্দতেই হোক্, কিছুক্ষণ বসার শক্তি পাবে। তারপরে মন যেখানেই বসুক, নাম জপের বলে ঈশ্বর-স্মরণকে জাগিয়ে ক্রমে সচ্চিদানন্দরসে ডুবান সম্ভব হবে।

[**পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত**]

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র